

banglabooks.in
বুদ্ধদেব গুহ
কোয়েলের কাছে

যে-পালামৌকে সাহিত্যে চিরজীবী করেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সেই পালামৌকেই 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসে নতুন রূপে সাহিত্যপাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন এ-যুগের শক্তিশালী কথাকার বুদ্ধদেব গুহ। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শুধু যে পালামৌ-এর চেহারা বদলই ঘটেছে তা নয়, অন্যতর দৃষ্টিও এই সৃষ্টিকে দিয়েছে নবতর মহিমা। বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, পুরনো পালামৌ-এর এই প্রবাদ-পরিণত বাক্যটিকে মনে রেখেই আরেকটু এগিয়ে বলা যায়, অন্যরা অন্যত্র সুন্দর, বুদ্ধদেব গুহ জঙ্গলমহলে।
সত্যিই অরণ্যে অনন্য বুদ্ধদেব গুহ। তিনি নিজেও একদা লিখেছিলেন, প্রকৃতিই আমার প্রথম প্রেম এবং সবচেয়ে বড় কথা, স্থায়ী প্রেম। তাঁর প্রকৃতি-প্রধান রচনা শুধু রূপের বর্ণনা নয় শব্দ আর গন্ধকেও তিনি অক্ষরে বন্দি করেন এক আশ্চর্য জাদুতে। এই শেষোক্ত জাদুর জন্যই তাঁর লেখার নিজস্ব এক আবেদন, আলাদা এক আকর্ষণ।
'কোয়েলের কাছে' বুদ্ধদেব গুহ-র বহুবন্দিত উপন্যাস। প্রকৃতিই এখানে প্রধান চরিত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সূত্রে আর যে-কটি মানুষের উল্লেখ, তারাও কম কৌতূহলকর নয়। মারিয়ানার প্রেম, সুমিতা বৌদির কামনা, লালতির সোহাগ, জগদীশ পাণ্ডের হিংস্রতা, ঘোষদার কৃত্রিমতা আর যশোয়ন্তের আদিমতা—কেবল নদীর মতোই প্রাণবান এক-প্রবাহ। সৌন্দর্যে, রোমাঞ্চে, উৎকণ্ঠায়, আবেগে উজ্জ্বল উপন্যাস 'কোয়েলের কাছে'।



এই সময়ের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম বুদ্ধদেব গুহ। পেশাগত দিক থেকে তিনি একজন নামী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। দিল্লির কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের আয়কর বিভাগের উপদেষ্টা বোর্ড-এর সদস্য নিযুক্ত করেছিলেন। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের অডিশান-বোর্ড এর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম সেন্সর বোর্ড-এর সদস্যও ছিলেন তিনি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগের বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড, পর্যটন বিভাগের উপদেষ্টা বোর্ড এবং 'নন্দন' উপদেষ্টা বোর্ড-এরও সদস্য। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের পরিচালন সমিতির সদস্যও নিযুক্ত হয়েছেন। বুদ্ধদেব ছবিও আঁকেন। নিজের একাধিক বই-এর প্রচ্ছদ তিনি নিজেই এঁকেছেন। গায়ক হিসেবেও তিনি বহুজনের প্রিয়।
ব্যতিক্রমী লেখক বুদ্ধদেব বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের একাধিক প্রজন্মকে যে ভারতের বন-জঙ্গল, বাদা-নদী, পশু-পাখি এবং অরণ্যে লালিত-পালিত সাধারণ গরিব-গুরবো মানুষদের ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করেছেন তা সর্বজনস্বীকৃত। নারী-পুরুষের প্রেম-বিরহ সম্পর্কেও তাঁর কলম অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
বুদ্ধদেবের সহধর্মিণী সম্ভ্রান্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা শ্রীমতী ঋতু গুহ।

ISBN 81-7066-375-X

প্রচ্ছদ ☐ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
লেখকের আলোকচিত্র ☐ অমরনাথ দত্ত

কোয়েলের কাছে

বুদ্ধদেব গুহ



আনন্দ

"I had an inheritance from my father.
It was the moon and the Sun.
I can move throughout the World now.
The spending of it is never done."

টুনটুনি,

জীবনের অনেক ঋণই শোধ করা যায় না; শুধু স্বীকার করা যায় মাত্র। সেই সব অপরিশোধনীয় ঋণের স্বীকৃতিস্বরূপ আমার এই সামান্য বই তোমাকে দিলাম।

শ্রীমতী কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা,
কল্যাণীয়াসু

বুদ্ধদেবদা—
৩০ এপ্রিল,
১৯৭০,
কলকাতা

নবীকৃত সংস্করণের ভূমিকা

উনিশশো পঁচানব্বুইতে মানে, আর দেড় মাস পরেই 'কোয়েলের কাছে'র পঁচিশ বছর পূর্ণ হবে। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে এটি অবশ্যই একটা ঘটনা। আর এই ঘটনা ঘটানোর জন্যে প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার কাছেই আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের ভালবাসাতেই আমি লেখক।

'কোয়েলের কাছে' লিখেছিলাম ষাটের দশকে, অত্যন্ত যত্ন করে এবং তিন বছর সময় নিয়ে। লেখাটি কলকাতাতেই লিখলেও প্রত্যেক ঋতুর বর্ণনা সেই ঋতুতেই বসে লিখেছিলাম এই ছেলেমানুষী বিশ্বাসে যে, তাতে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পালামৌকে পরিপূর্ণভাবে তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শসমেত উপস্থাপিত করতে পারব। পেরেছি কি পারিনি তার বিচারক আমি নই। হেমিংওয়ের একটি উক্তি আমাকে প্রভাবিত করেছিল: "Do not hold back anything. Give it all to your readers !"

নিজে হাতে পনেরো বার কপি করেছিলাম এই উপন্যাস এবং প্রতি বারেই কপি করতে করতে বদলেও গেছিল কমবেশি।

লেখা শেষ হয়ে যাবার পর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি আনন্দবাজার "রবিবাসরীয়"র সম্পাদক শ্রীরমাপদ চৌধুরীর ঘরের একটি আলমারির মাথার ওপরে রাখা ছিল একাধিক বছর। তখন রবিবাসরীয়তে ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপা হত না। আমি তখন ছোটগল্প লিখি। মজার গল্প। বন জঙ্গলের পটভূমিতে। লেখক পরিচিতিও ছিল না। আর আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অন্য কাগজ বলতে তখন শুধুমাত্র 'দেশ'। কিন্তু 'দেশ'-এ আমার লেখা ছাপাই হত না। প্রথমবার ছাপা হয় উনিশশো ছিয়াত্তরে।

যুগান্তর গোষ্ঠী ষাটের দশকের মাঝামাঝি 'অমৃত' সাপ্তাহিক প্রকাশ করতে শুরু করেন। সম্পাদনা করতেন কম্যুনিস্ট কবি শ্রীমণীন্দ্র রায় এবং প্রধান সহকারী ছিলেন শ্রীকমল চৌধুরী। সাহিত্যিক মনোজ বসুর পুত্র ময়ূখ বসু 'কোয়েলের কাছে'র কথা জানতেন। তা ছাড়া, ওঁরা তখন আমাদের পড়শি এবং মক্কেলও বটেন। ময়ূখই উপন্যাসখানি নিয়ে গিয়ে 'অমৃত'তে দেন। মণীন্দ্রবাবু অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে ছাপতে শুরু করেন ধারাবাহিকভাবে। কয়েকটি কিস্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে সাড়া পড়ে যায়। বনফুল এবং সন্তোষকুমার ঘোষ এই অখ্যাত নবীনকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সেই সময়ের লেখকেরা বড় মনের ছিলেন। প্রশংসা করতে বুক ফাটত না।

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শেষ হয়ে গেলে মনোজবাবুর প্রকাশনা সংস্থা 'গ্রন্থ-প্রকাশ' থেকে সত্তরের দশকের গোড়াতে 'কোয়েলের কাছে' বই হয়ে বেরোয়। তারও দশ বছর পরে উনিশশো আশিতে আনন্দ পাবলিশার্স প্রথম আনন্দ-সংস্করণ প্রকাশ করেন।

বইটিকে সুন্দর ও নয়নাভিরাম করতে গিয়ে দাম বেড়ে গেল। দাম যে বাড়ল, তার পিছনে আমার এই নবীকরণের ইচ্ছাও দায়ী। আশা করি, পাঠক-পাঠিকারা এই অপরাধ নিজগুণে মার্জনা করবেন।

বিনত
বুদ্ধদেব গুহ
পোস্ট বক্স নং ১০২৭৬
কলকাতা—৭০০ ০১৯
১৫। ১১। ১৯৯৪

কোয়েলের কাছে



এক

'স্যান্ডারসন' কাগজ কোম্পানির ফরেস্ট অফিসারের চাকরি নিয়ে আজই এলাম এখানে।

পাহাড়ের মাথায় খাপরার চালের পুরনো আমলের বাংলো। পাশাপাশি তিনটে ঘর। সামনে পিছনে চওড়া বারান্দা। ঘরগুলো বড় বড়। বাংলোর হাতাটাও বিরাট। চমৎকার ড্রাইভ। দু পাশে দুটো জ্যাকারান্ডা গাছ। তা ছাড়া কৃষ্ণচূড়া, ক্যাসিয়া নডুলাস, চেরি ইত্যাদি গাছে চারিদিক ভরা। বাংলোর চারপাশের সীমানায় কাঁটাতার আর কাঁটা-ঝোপ।

জায়গার নাম রুমান্ডি।

ব্রজেন ঘোষ (ঘোষদা) পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বললেন, এই হল তোমার ডেরা, এইখানেই থাকবে, এইখানে বসেই বাঁশ-কাটা কাজ তদারকি করবে, এইখানেই এখন থেকে তোমার ঘর-বাড়ি সব।

বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে যেদিকেই তাকালাম শুধু পাহাড় আর পাহাড়, বন আর বন। সত্যি কথা বলতে কী, বেশ গা-ছমছম করতে লাগল। বেশি মাইনের লোভে পড়ে এই ঘন জঙ্গলে এসে পাণ্ডব-বর্জিত পাহাড়ে বেঘোরে বাঘ-ভাল্লুক ডাকাতের হাতে প্রাণটা না যায়।

ছোটবেলা থেকে কলকাতায় মানুষ, সেখানেই পড়াশুনা শিখেছি। সেখানকার ট্রাম আর দোতলা বাসের গর্জন শুনে এবং মানুষের মেলা দেখে অভ্যস্ত আছি। কিন্তু এ এক আশ্চর্য জগতে এসে পড়লাম। এই দিনের বেলায়ও কোনও জনমানব নেই। কেবল ব্যস্ত হাওয়াটা রাশি রাশি বিচিত্র বর্ণ শুকনো পাতা তাড়িয়ে নিয়ে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। সেই পাতার নাচের শব্দ ছাড়া আছে টিয়ার ঝাঁকের কর্কশ শব্দ।

এই বিচ্ছিন্ন ও অসহনীয়ভাবে নির্জন জঙ্গলে কী করে দিন কাটবে জানি না। তার উপর এর বছরের চুক্তিতে এসেছি। কাজ করব না বললেই হল না, পালিয়ে গেলেই হল না। প্রায় কান্না পেতে লাগল।

ঘোষদা বললেন, তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। বাবুর্চি আছে ভাল। নাম—জুম্মান। পাহাড়ের নীচের হাটে গেছে বোধ হয়, তোমার খাওয়া-দাওয়ার ইন্তেজাম করতে। আর এই হচ্ছে রামধানিয়া, তোমার খিদমদগার। অত্যন্ত সাদাসিধে একটি লোক এসে লম্বা কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

ঘোষদা বললেন, আমি এবার চলি, তুমি চানটান করে বিশ্রাম করো, জুম্মান এই এল বলে। খেয়েদেয়ে বেশ ভাল করে ঘুমিয়ে নিয়ে আজকের দিনটা রেস্ট নাও। কাল থেকে

কাজ শুরু। এখানে যে রেঞ্জার আছে, যার কথা রাস্তায় বলছিলাম, সে ছেলেটি ভালই—তবে বড় সাংঘাতিক টাইপ।

চমক উঠে বললাম, মানে?

ঘোষদা হেসে বললেন, না না, তোমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না। তবে ছেলেটি বড় বেপরোয়া। ওকে একটু সামলে-সুমলে চলো বাপু, নইলে বিদেশে কী বিপদ সৃষ্টি করবে কে জানে! রেঞ্জারের নাম যশোয়ন্ত।

তারপর বারান্দা থেকে নামতে নামতে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, বাইরে চলাফেরা করার সময় একটি সাবধানে কোরো। গরমের দিন। সাপের বড় উপদ্রব।

সাপ? একেবারে কুঁকড়ে গেলাম। বাঘ, ভাল্লুকে তাও দেখা যায়, বোঝা যায়, হাতে-পায়ে হেঁটে আসে। এই ঘিনঘিনে বুকে-হাঁটা পিচ্ছিল কুৎসিত সরীসৃপকে দেখলেই একটা অস্বস্তি লাগে। সারা শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে। সভয়ে শুধোলাম কী সাপ আছে?

ঘোষদা বলেলেন, আছেন সকলেই। শঙ্খচূড়, কালকেউটে, পাহাড়ি গহুমন্ ইত্যাদি। কেউ কম যান না। এই গরমের সময়টাতেই বেশি ভয়। ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। একটু সাবধানে থাকলেই হবে। ফরসা জায়গা দেখে পা ফেলো।

এই বলে উনি গাড়িতে উঠলেন, তারপর ওঁর জিপ লাল ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

ঘরগুলো বেশ বড় বড়। বিরাট বিরাট জানালা ঘরের তিন দিকে। জানালায় শিক নেই কোনও। দু-পাশে দুটি ঘর। মধ্যে বসবার ঘর-কাম-খাবার ঘর। প্রত্যেক ঘরের পেছনেই সংলগ্ন বাথরুম। বাথরুমে বেশ উঁচু করে কাঠের পাটাতন। বড় বাথটাব। একটি ওয়াশ বেশিন। সব দেওয়ালে একটি করে বড় জানালা আছে।

দরজা খুলে পিছনের উঠোনে গিয়ে পড়তে হয়। পিছনের উঠোনের পর জুম্মান ও রামধানিয়ার কোয়ার্টার, বাবুর্চিখানা, কাঠ ও কয়লা রাখার ঘর ইত্যাদি। উঠোনের এক পাশে একটা বিরাট গাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অনেক দিনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক ঝাঁক হলদে রঙের শালিক তাতে কিচির-মিচির করছে।

জানালার যা সাইজ, তাতে হাতির বাচ্চা পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকে পড়ে আমার নেয়ারের খাটিয়াতে শুয়ে থাকতে পারে। একে তো এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে আছি, এই জানাটাই যথেষ্ট জানা; তার উপর যদি ঘরের মধ্যে হিংস্র জানোয়ার ঢুকে পড়ার ভয় থাকে, তবে তো অস্বস্তির একশেষ। এই সাইজের জানালা দিয়ে ঠিক কোন কোন জানোয়ার এবং কত সংখ্যায় প্রবেশ করতে পারে, তা ইচ্ছে করলেই রামধানিয়াকে শুধানো যেত। কিন্তু প্রথম দিনেই 'কোলকাতিয়া বাবুর' স্বরূপ উদঘাটিত যাতে না হয়, সেই চেষ্টায় আপ্রাণ সতর্ক হলাম।



দুই

জুম্মান সত্যিই রাঁধে ভাল। এরকম জায়গায় খাওয়াটাকেই হয়তো হোলটাইম অকুপেশন করতে হবে। অতএব একজন যোগ্য বাবুর্চির প্রয়োজন নিতান্তই।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমার ইমিডিয়েট বস্—ঘোষদার কথা মতো একটু গড়িয়েই নিলাম। তারপর রোদের তেজ পড়লে, পায়চারি করলাম বেশ কিছুক্ষণ।

বাংলোর হাতা থেকে দূরে পাহাড়ের নীচে একটি শঙ্খিনী নদী চোখে পড়ে। ঘন জঙ্গলের মাঝে এঁকেবেঁকে চলে গেছে শুকনো সাদা মসৃণ বালির রেখা। এতদূর থেকে জল আছে কি নেই বোঝা যায় না।

রামধানিয়া বললে, নদীর নাম 'সুহাগী', আরও এগিয়ে গিয়ে নাকি কোয়েল নদীতে মিশেছে। গ্রীষ্মের জঙ্গলের লাল, হলদে ও সবুজ চঞ্চল প্রাণ-প্রাচুর্যের মাঝে ওই ছোট নদীর শান্ত সমাহিত নিরুদ্বেগ শ্বেতসত্তাটি ভারী ভাল লেগেছিল। কিন্তু এই আসন্ন সন্ধ্যায় একা-একা ওই অতটা পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে নদীতে পৌঁছই, সে সাহস আমার ছিল না।

আলো যত পড়ে আসতে লাগল, ততই যেন সমস্ত বন পাহাড় বিচিত্র শব্দে কল-কাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠল। কতরকম পাখির ডাক। অতটুকু-টুকু পাখি যে অত জোরে জোরে ডাকতে পারে, এখানে না এলে বোধ হয় জানতে পেতাম না। সব স্বর ছাপিয়ে একটি তীক্ষ্ণ স্বর কেঁয়া কেঁয়া করে একেবারে বুকের মধ্যিখান অবধি এসে পৌঁছচ্ছে। হঠাৎ শুনলে মনে হবে, কী এক আর্তি যেন বনের বুক চিরে শেষ বিকেলের বিষণ্ণ আলোয় ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

রামধানিয়াকে শুধোলাম, ও কীসের ডাক? কোনও পাখির ডাক নিশ্চয়ই নয়। রামধানিয়া হেসে বললে, উ মোর হ্যায়, ঔর ক্যা বা। 'মোর' অথবা মেঞ্জুর, মানে ময়ূর।

রামধানিয়া বলল, মোর কাফি হ্যায় হিঁয়া সাব। 'ঝুন্ডকে ঝুন্ড' মানে দলে দলে; শিখলাম। ভাষাটাও একটা খুব কম বিপত্তির নয়। একসঙ্গে এতগুলো বাধা অতিক্রম করতে হলে মহাবীরের প্রয়োজন। আমার মতো পঙ্গুর অসাধ্য কাজ।

পৃথিবীতে যে এত পাখি আছে, আদিগন্ত এই বনে আসন্ন সন্ধ্যায় কান পেতে না শুনলে বোধ হয় জানতে পেতাম না।

অন্ধকার নেমে আসতে না আসতে ভয় ভয় করতে লাগল খুব।

বিজলি বাতি নেই। কবে হবে তারও ঠিক-ঠিকানা নেই। আগামী পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে হবে বলে মনেও হয় না। ঘরে ঘরে হ্যারিকেন জ্বলে উঠল। রামধানিয়া বাইরের

বারান্দায়ও একটি রেখে গেল। বললাম, বাইরেরটা নিয়ে যাও।

আকাশে চাঁদ ছিল। আজই বোধ হয় পূর্ণিমা। একটি হলুদ থালার মতো চাঁদ পাহাড়ের মাথা বেয়ে পত্রবিরল শাল বনের পটভূমিতে গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে আকাশ বেয়ে উঠতে লাগল। নীল, নীল, নীল আকাশে। আর সেই ঘন নীলে তার হলুদ রঙ ঝরে গিয়ে অকলঙ্ক সাদা হল। সমস্ত জঙ্গল পাহাড় হাসতে লাগল। সেই হাসিতে একটি খেয়ালি হাওয়া ঝুরু ঝুরু করে শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে নাচতে লাগল। চাঁদনী রাতে জঙ্গল পাহাড় সুহাগী নদী, প্রত্যেকে এমন এক মোহময়ী রূপ নিল যে, মনে হল এরা সেই দিনের আলোর জঙ্গল-পাহাড় কি নদী নয়। এরা নতুন কেউ।

জানি না, সকলের হয় কি না। আমার সেই প্রথম রাতে নতুন জায়গায় একটুও ঘুম এল না। যদিও পাহাড়ের উপর গরম তেমন কিছুই নেই, তবু জানালা বন্ধ করে ঘুমোনো গেল না। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন শুলাম, তখন নিজেকে সত্যিই বড় অসহায় বলে মনে হতে লাগল।

সভ্যতা থেকে কতদূরে কোন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ের চুড়োয় শুয়ে আছি। জানালা বেয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরময় লুটোপুটি করছে। একটি বোগোনভেলিয়ার লতা জানালার পাশ বেয়ে ছাদে লতিয়ে উঠছে। রাতের হাওয়ার দমকে দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে লতাটা। ছায়াটা কেঁপে যাচ্ছে আমার ঘরময়। বাইরের জঙ্গলে অনেক রকম শব্দ শুনতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই নিশাচর জানোয়ারদের। কোনটা কোন জানোয়ারের আওয়াজ জানি না। সমস্ত শব্দ মিলে সেই পূর্ণিমা রাতের রুপোলি শব্দ-সমষ্টি মাথার মধ্যে ঝুম্‌ঝুম্ করছে। ঘরে শুয়ে শুয়েই ভয়ে জড়সড় হয়ে যাচ্ছি। অথচ বাইরের সুন্দরী প্রকৃতিতে এখন কারা চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে কৌতূহলও যে কম হচ্ছে, তা নয়। এ এক অভূতপূর্ব ভয়-মিশ্রিত কৌতূহল।

সারারাত এপাশ-ওপাশ করে বোধহয় শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে থাকব।

দরজায় ধাক্কা পড়তে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম, আমার ঘর শিশু-সূর্যের কোমল আলোয় ভরে গেছে এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জানালা দিয়ে কোনও জানোয়ারই ঘরে প্রবেশ করেনি রাতে।

রামধানিয়া দরজা ধাক্কা দিচ্ছিল। দরজা খুলতেই বলল, রেঞ্জার সাহাব আয়া।

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে পায়জামার ওপর পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে বাইরে এলাম। বাইরে এসে কাউকে কোথাও দেখতে পেলাম না। দেখলাম, একটি কুচকুচে কালো ঘোড়া কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমার দিকে সপ্রতিভ চোখে তাকিয়ে আছে। ঘোড়াটার গা দিয়ে কালো সাটিনের জেল্লা বেরোচ্ছে।

এদিক-ওদিক চাইতেই দেখি, উঠোনের দিক থেকে একজন কালো, দীর্ঘদেহী, ছিপছিপে সুপুরুষ এ-দেশীয় ভদ্রলোক আসছেন। তাঁর পেছনে পেছনে রামধানিয়া একটি ভাঙা ঝুড়িতে বিস্তর সাদায়-হলুদ মেশানো টোপা টোপা ফল নিয়ে আসছে।

ভদ্রলোক কাছে আসতে নিজেই হাত তুলে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, নমস্কার। প্রতিনমস্কার জানালাম।

দেখলাম, রামধানিয়া ওই ঝুড়িভর্তি ফল ঘোড়াটার মুখের সামনে ঢেলে দিল। আর ঘোড়াটা তখনই সেগুলো পরমানন্দে চিবোতে লাগল।

আমাকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক এবার বেশ পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ওগুলো কী ফল জানেন?

নেতিবাচক ঘাড় নাড়লাম।

উনি বললেন, মহুয়া। উঠোনে যে বড় গাছটা আছে, সেটার ফল। আমি বললাম, গাছটা দেখে সেরকম অনুমান করেছিলাম বটে। আগে তো দেখিনি কোনওদিন। ফলও চিনতাম না।

ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন। বললেন, স্যান্ডারসন কোম্পানির ফরেস্ট অফিসার মহুয়া চেনেন না। অজীব বাত।

কথাটায় বেশ অপ্রতিভ হলাম।

উনি বললেন, এই মহুয়াই এখানকার লোকের ধমনী বেয়ে চলে। কেন? কাল রাতে এর বাস পাননি? সারারাত হাওয়ায় যে মিষ্টি মাতাল করা গন্ধ পেয়েছেন, তা এই মহুয়ার। সারা জঙ্গল গরমের দিনে ম' ম' করে মহুয়ার গন্ধে। এ বড়া কিম্‌তি জিনিস। গরুকে খাওয়ান, গরু বেগে দুধ দেবে। ঘোড়াকে খাওয়ান, ঘোড়া তেড়ে ছুটবে। মহুয়ার মদ তৈরি করে মানুষকে খাওয়ান, দেখবেন ঝেড়ে ঘুমোচ্ছে। আরও গুণ আছে, ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে গোড়ালি মচকে গেল, তো শুখা-মহুয়া গরম করে সেঁক দিন, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে ঠিক।

বললাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প হয় নাকি। আসুন, বসুন। উনি অবাক গলায় বললেন, একি আপনার কলকাতা নাকি মশায়, যে মিঠি-মিঠি কথা বলে চলে যাব? অনেক মাইল ঘোড়া চেপে এসেছি। সেই সূর্যোদয়ের আগে উঠেছি ঘোড়ায় এখানে দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে আবার বিকেলে রওনা হয়ে রাতে গিয়ে পৌঁছব।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, বা বা তবে তো ভালই। চমৎকার হল। ভেরি কাইন্ড অফ য়্যু।

ভেরি কাইন্ড অফ য়্যু। কথাটায় উনি আমার দিকে এমন করে কটমটিয়ে তাকালেন যে বুঝতে তিলমাত্র কষ্ট হল না যে এই জঙ্গলে ওই সব মেকি ভদ্রতা অনেক দিন আগেই তামাদি হয়ে গেছে। এখানে মানুষ মানুষকে আন্তরিকতায় আপ্যায়িত করে। তোতাপাখির মতো কতগুলো বাঁধা গৎ আউড়ে নয়।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, যাই বলুন, বাংলাটা কিন্তু আপনি চমৎকার বলেন।

যশোয়ন্তবাবু কিঞ্চিৎ ব্যথিত এবং অত্যন্ত অবাক হয়ে বললেন, আজ্ঞে? আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। তারপর বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, আমি তো বাঙালিই হচ্ছি।

বিস্ময়ের শেষ রইল না। প্রায় ঢোঁক গিলে বললাম, তা হলে আপনি বাঙালিই হচ্ছেন? কিন্তু যশোয়ন্ত নামটা তো ঠিক...

উনি হেসে বললেন, আরে তাতে কী হল? আমরা চার পুরুষ ধরে বিহারে। হাজারিবাগের বাসিন্দা। আমার নাম যশোয়ন্ত বোস। আমার বাবার নাম নরসিং বোস। আমার মার নাম ফুলকুমারী বোস। মামাবাড়ি পূর্ণিয়া জেলায়। আমার মামারাও প্রায় তিন-চার পুরুষ হল পূর্ণিয়ায়। নাম যাই হোক আমাদের, আমরা বাঙালিই হচ্ছি।

আমি বললাম, তা তো নিশ্চয়ই। বাঙালি তো হচ্ছেনই।

যশোয়ন্তবাবু বললেন, ঘোষসাহেব আমাকে জানালেন আপনার কথা। বললেন খুব বড়া খানদানের ছেলে, অবস্থা বিপাকে বহত পড়ে-লিখে হয়েও এই জঙ্গলের কাজ নিয়ে

এসেছেন, অথচ জঙ্গলের জানেন না কিছুই। তাই ভাবলাম, আপনাকে একটি তালিম দিয়ে যাই।

তারপর একটু চুপ করে থেকেই বললেন, এখানে কোনও রক্তের সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। আমরা সকলে সকলের রিস্তাদার। একজন অন্যজনের জন্যে জান কবুল করতেও কখনও হটে না। আও দোস্ত, হাত্‌সে হাত মিলাও।

যশোয়ন্ত আমার হাতটি চেপে ধরলেন আন্তরিকতার সঙ্গে। যদিও একটু ঘাবড়ে গেলাম, তবুও বললাম, ভালই হল। খুব ভাল হল। একেবারে একা-একা যে কী করে এখানে দিন কাটাতাম জানি না।

যশোয়ন্তবাবুর অদ্ভুত সহজ স্বভাবের গুণে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এলাম। অবশ্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে সদ্য-পরিচিত কাউকে 'তুমি' বলা যায়, এ একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যদি কেউ কোনওদিন যশোয়ন্তকে দেখে থাকেন, তবে একমাত্র তিনিই এ কথা অবলীলায় বিশ্বাস করবেন।

রামধানিয়া চা নিয়ে এল, চেরি গাছের তলায়। চিঁড়ে ভাজা আর চা।

ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। একজোড়া বুলবুলি পাখি এসে চেরি গাছের পাতার আড়ালে বসে শিস দিচ্ছে। উপরে তাকালে দেখা যায়, শুধু নীল আর নীল। আশ্চর্য শান্তি।

পাহাড়ের নীচের গ্রামের ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। গ্রামের নামও সুহাগী; নদীর নামে নাম। ঘন জঙ্গলের আস্তরণ ভেদ করে ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে। পেঁজা তুলোর মতো। আকাশের দিকে।

পোষা মুরগির ডাক, ছাগলের 'ব্যা' 'ব্যা' রব, মোষের গলার ঘণ্টা। কাঠ-কাটার আওয়াজ, এবং ইতস্তত নারীকণ্ঠের তর্জন ভেসে আসছে হাওয়ায়। বেশ ভাল লাগছে। আমিও একেবারে একা নই। অনেক লোকই তো আশেপাশে। বেশ সপ্রাণ, সরব জীবন্ত সকাল। বেশ ভালই লাগছে, রাতের ভয়টা কেটে গিয়ে।

যশোয়ন্ত বলল যে, আমার কাজ এমন কিছু নয়। কাগজ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার আছেন। সেই ঠিকাদারেরা লরিবোঝাই বাঁশ কেটে কেটে বিভিন্ন স্টেশনে পাঠাবেন, সেইসব বাঁশ ঠিক সাইজমতো হচ্ছে কি না, সময়মতো পাঠানো হচ্ছে কি না, এইসব কাজ তদারকি করা। যশোয়ন্ত এখানকারই ফরেস্ট রেঞ্জার, ওর কাজ, যাতে বনবিভাগের কোনও ক্ষতি না হয়, বনবিভাগের প্রাপ্য পাওনা ঠিকমতো আদায় হচ্ছে কি হচ্ছে না, ইত্যাদি দেখা। আমার কাজ কঠিনও নয়, আহামরি আরামেরও কিছু নয়। মাঝে মাঝে জিপ নিয়ে 'কুপে' 'কুপে' ঘুরে আসা। যতদিন নিজের জিপ না আসে, ততদিন একটু কষ্ট। তাও রোজ যাবার দরকার নেই।

শুধোলাম, হেঁটে হেঁটে জঙ্গলে যেতে হবে; কিন্তু জংলি জানোয়ারের ভয় নেই তো?

যশোয়ন্ত বলল, জানোয়ারের ভয় মানুষের কিছুই নেই। মানে, থাকা উচিত নয়। মানুষের ভয় মানুষেরই কাছ থেকে। তবে, প্রথম প্রথম একটু সাবধানে থাকা ভাল এবং থেকোও। তবে ভয়ের কিছু নেই। তা ছাড়া ভয় কেটে যাবে। যারা জঙ্গল, বন, পাহাড়কে জানে না, তারাই ভয় করে মরে। একবার চিনতে পারলে, ভালবাসতে পারলে, তখন আর জঙ্গল পাহাড় ছেড়ে যেতে মন চাইবে না। তা ছাড়া আমি তোমাকে শিকার করতে শিখিয়ে দেব। হাতে একটা বন্দুক নিয়ে বন-পাহাড় চষে বেড়াবে, দেখবে, দিল খুশ্‌ হয়ে যাবে। সাচ্‌ মুচ্‌, দিল্‌ বড়া খুশ্‌ হো যায়গা।

কী কথা বলব ভেবে না পেয়ে বললাম, ওই যে নীচে সুহাগী নদী দেখা যাচ্ছে ওতে জল আছে এখন?

যশোয়ন্ত বলল, জল আছে বইকী, চিরচির করে বইছে এখন, তবে যখন গরম আরও জোর পড়বে তখন উপরে জল আর যাবে না। তখন নদী অন্তঃসলিলা হবে। খুঁড়লে পাওয়া যাবে, কিন্তু বাইরে দেখে বুঝতে পারবে না, যে জল আছে।

বললাম, কালকে রাতে চাঁদ উঠেছিল যখন, তখন নদীটাকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। কত নাম না-জানা পাখি ডাকছিল রাতের জঙ্গল থেকে। একটু ভয় করছিল যদিও, কিন্তু বেশ ভাল লাগছিল।

লাগবে, ভাল লাগবে বইকী। নইলে কি আর পড়ে আছি এখানে! সময়মতো প্রমোশন হলে আমি এতদিনে ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার হয়ে যেতাম। কিন্তু আমার স্বভাব এবং আমার এই পালামৌ প্রীতি, এই দুইয়ে মিলে হয় 'গারু' নয় 'লাত্', হয় 'চাহাল চুঙরু' কিংবা 'বেত্লা', এইখানেই বেঁধে রেখেছে। এ শালি যাদু জানে। তারপর বলল, যাবে নাকি নদীটা দেখতে? চল ঘুরে আসি।

বাংলো থেকে পাকদণ্ডী রাস্তা বেয়ে নামতে নামতে ভাবছিলাম। যশোয়ন্ত ছেলেটার মধ্যে বেশ একটা 'ক্রুডনেস' আছে, যা তার চলনে-বলনে, ভাবভঙ্গিতে সব সময় ফুটে ওঠে, যা এই জঙ্গল পাহাড়ের নগ্ন পরিপ্রেক্ষিতে একটি আঙ্গিক বিশেষ বলে মনে হয়।

যশোয়ন্ত শুধাল, এটা কী গাছ, জানো? বললাম, জানি না। অর্জুন গাছ। এ জঙ্গলে 'অর্জুন' এবং 'শিশু' প্রচুর আছে। তা ছাড়া আছে শাল। সবচেয়ে বেশি। শালকে এখানকার লোকেরা বলে 'শাকুয়া'। তা ছাড়া আরও অনেক গাছ আছে। কেঁদ, পিয়ার, আসন, পন্নান, পুঁইসার, গমহার, সাগুয়ান ইত্যাদি এবং নানা রকমের বাঁশ। সকলের নাম কি আমিই জানি? ঝোপের মধ্যে পুটুস, কুল, কেলাউন্দা এবং অন্যান্য নানা কাঁটা গাছ। ফুলের মধ্যে আছে ফুলদাওয়াই, জীরহুল, মনরঙ্গোলি, পিলাবিবি, করৌঞ্জ, সফেদিয়া এবং আরও কত কী। কত যে ফুল ফোটে, তোমাকে কী বলব; আর কী যে মিষ্টি মিষ্টি রঙ। তাদের কী যে গন্ধ। এ জঙ্গলে হরবখত্ যে হাওয়া বয়, তা হামেশা খুশবুতে ভারী হয়ে থাকে। অথচ সে খুশবু একটা বিশেষ কোনও ফুলের খুশবু নয়। অনেক ফুল, অনেক লতা, অনেক পাতার ঈত্তরদানী। কিছুদিন থাকো, তখন আপনিই হাওয়া নাকে এলে বুঝতে পারবে, কোন ফুলের বা ফলের খুশবুতে ভারী হয়ে আছে হাওয়া।

আমরা বেশ খাড়া নামছি। এঁকেবেঁকে পাথরের পর পাথরের উপর দিয়ে ঘন জঙ্গলের ছায়ানিবিড় সুবাসিত পথে আমরা নেমে চলেছি। পথের দুধারে ছোট ছোট লঙ্কার মতো কী কতগুলো গাঢ় লাল ফুল ফুটেছে। এমন লাল যে মাথার মধ্যে আঘাত করে। ঝন্ঝন্ করে স্নায়ুগুলো সব বেজে ওঠে। যশোয়ন্তকে শুধোতে বললে, এইগুলোই তো ফুলদাওয়াই। আর ওই যে, ফিকে বেগনি রঙের ফুলগুলো দেখছ, ওই ডানদিকে, ওগুলোর নাম 'জীরহুল'। এই গরমেই ওদের ফোটা শুরু হল। গরম যত জোর পড়বে ওরা তত বেশি ফুটবে। ওদের রঙে তত চেক্নাই লাগবে।

ভাল করে দেখলাম বেগুনি ফুলগুলোকে। ছোট ছোট ঝোপ, ফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে, যেন গান গাইছে, যেন খুশি ভীষণ খুশি। রঙটা ঠিক বেগুনি বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না, কিশোরীর মিষ্টি স্বপ্নের মতো রং, যে স্বপ্ন আচমকা ভেঙে যায়নি।

সুহাগী নদীতে পৌঁছতে পাকদণ্ডী বেয়ে বাংলো থেকে নামতে মিনিট কুড়ি লাগে। পৌঁছেই চোখ জুড়াল।

কী সুন্দর নদী। ইউক্যালিপটাস গাছের গায়ের মতো মসৃণ, নরম, পেলব, সুন্দর বালি। মধ্যে দিয়ে পাথরে পাথরে কলকল করে কথা কইতে কইতে একটি পাঁচ বছরের শিশুর মতো ছুটে চলেছে 'সুহাগী'। কারও কথা শুনে ঘর থেকে বেরোয়নি, কারও কথায় থামবেও না ঠিক করেছে।

জলধারা যেখানে সবচেয়ে চওড়া, এখন সেখানে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ গজ হবে। একটি প্রকাণ্ড সেগুন গাছের তলায় একটি বড় কালো পাথরের স্তূপ। চমৎকার বসবার জায়গা। ছায়াশীতল, উঁচু, সেখান থেকে বসে নদীটিকে বাঁক নিতে দেখা যায়। দুপাশে গভীর জঙ্গল। নদী চলেছে তার মাঝ দিয়ে। পাথরের উপরে ইতস্তত শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে।...হাওয়ায় হাওয়ায় মচমচানি তুলে এপাশে-ওপাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

যশোয়ন্ত বললে, এই পাথরে বসে আমি অনেক জানোয়ার শিকার করেছি।

সুহাগী থেকে ফিরে এসে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর যেখানে কাজ হচ্ছে, সেখানে নিয়ে গেল যশোয়ন্ত আমাকে।

অনেকখানি বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে বাঁশ কাটা হচ্ছে। ছোট ছোট বাঁশ, সরু সরুও বটে। এক ধরনের মোটা বাঁশও আছে। তবে খুবই কম। সে বাঁশ নাকি কাগজ বানাতে প্রয়োজন হয় না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের খাকি-জামা পরা লোকজন মার্কা করার হাতুড়ি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন কন্ট্রাকটরের জঙ্গল আজ মার্কা হচ্ছে। কাঠের জঙ্গল।

যশোয়ন্ত নানারকম বাঁশের নাম শেখাচ্ছিল। ব্যাম্বুসা-রোবাস্টা, ব্যাম্বুসা-আরডেন্‌সিয়া, ড্যান্ড্রোক্যালামাস্‌-স্ট্রিকটাস্‌ ইত্যাদি। ড্যান্ড্রোক্যালামাস্‌-স্ট্রিকটাস্‌ই বেশি। মোটা বাঁশ এখানে খুব কম।

বাঁশ কাটার সময় ঠিকাদারের লোকজনই সব করে, তারাই তাদের নিজেদের গরজে তদারকি করে। সত্যি কথা বলতে কী তেমন কোনও কঠিন কাজই নেই। তবে যখন কোনও নতুন জঙ্গলে কাজ আরম্ভ হবে, সেই সময় আমার এবং যশোয়ন্তের প্রথম প্রথম কিছুদিন রোজ যেতে হবে; নইলে বাঁশের জঙ্গল ঠিকমতো কাটা হচ্ছে কি না, ঠিক মাপের বাঁশ, ঠিক বয়সের বাঁশ-ঝাড় নির্ধারিত হল কি না, এসব দেখাশোনা করা যাবে না।

এখানকার সবচেয়ে বড় ঠিকাদার মালদেও তেওয়ারী। খুব নাকি ভাল লোক। সমস্ত জঙ্গলে প্রচুর লরি এবং অনেক লোক খাটছে। গরমের সময় কাজ খুব, কারণ বর্ষাকালটা কাজ বন্ধ থাকবে, জঙ্গলে রাস্তাঘাট অগম্য হয়ে উঠবে। নদীনালা ভরে যাবে। পাহাড়ি নদীর উপর বসানো কজ্‌ওয়েগুলোর উপর দিয়ে জল বয়ে যাবে। তখন কাজ অসম্ভব।

মালদেও বাবুর ছেলে রামদেও তেওয়ারী, এখানে সেদিন কাজ দেখতে এসেছিল। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে ছেলেটিরও। পায়জামা পরা, বেশ শৌখিন। করিৎকর্মা, প্র্যাক্‌টিক্যাল মানুষ। অল্পবয়সে মনে হয় কাজটা ভাল রপ্ত করেছে। কীসে দু' পয়সা আসবে, তা জেনেছে।

জঙ্গল থেকে ফিরে সন্ধে হবার পর যশোয়ন্ত ঘোড়ায় চেপে বসল। যতবার বললাম, কী দরকার রাত করে এতটা পথ ঘোড়ায় চেপে গিয়ে? বিকেল বিকেল বেরিয়ে বেলা থাকতে পৌঁছে গেলেন না কেন? ততবারই ও বলল, মাথা খারাপ! এ গরমে কে যাবে? আর রাতেই তো মজা। চাঁদনি রাতে পাহাড় জঙ্গলে বেড়িয়ে বেড়ানোর মতো মজা আছে?

আমি বললাম, কীসের মজা! বলছেন হাতি আছে, বাইসন আছে, বাঘ আছে, জংলি মোষ আছে। যে কোনও মুহূর্তে তারা সামনে পড়তে পারে। আর আপনি বলছেন মজা আছে। এতে মজাটা কীসের?

যশোয়ন্ত বলল, মজাটা কীসের অতশত ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না, তবে এককথায় বলতে পারি, দিল খুশ হো যাতা হ্যায়।

কথা ক'টি আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সেই চাঁদের আলোয় মোহময় অপার্থিবতায় সেই রহস্যময় রাতে, আলো-ছায়ায় ভরা পাহাড়ি পথে যশোয়ন্ত টগবগ টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল ওর বাংলোয়—'নইহারে'।



তিন

সকাল দশটা বাজতে না বাজতেই দরজা জানালা বন্ধ। বাইরে লু' বইছে। ঝড়ের মতো আওয়াজ, হলুদ বনে বনে একটা অভিমানের মতো রুক্ষ, প্রচণ্ড হাওয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতি থেকে একটা ঝাঁজ বেরোচ্ছে। তীব্র, তীক্ষ্ণ ঝাঁজ। সুন্দরী যুবতীর সৌন্দর্যের গর্বের মতো। অসহ্য।

জুম্মানকে বর্ধমানের কোনও এক লোক নাকি কবে শিখিয়েছিলেন যে, গরমকালে কলাইয়ের ডাল, পোস্তর তরকারি এবং খেঁড়ো খেলে শরীর ভাল থাকে। তার সঙ্গে কাঁচা আম বাটা নয়তো পাতলা করে ঝোল। অতএব যত গরম পড়ছে, আমার শরীর ততই স্নিগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু মন যেন ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। শুধু কলাইয়ের ডাল আর খেঁড়ো খেয়ে কতদিন কাটানো যায়?

কাজ যা সব ভোরে ভোরে। দশটার মধ্যে। খুব ভোরে উঠছি। কলকাতায় কোনও দিন ভাবতেও পারিনি যে, এত ভোরে আমি নিয়মিত উঠতে পারব। অবশ্য রাতে শুতেও বেশি দেরি হয় না। ভোরে পাখি ডাকাডাকি করার আগেই উঠি। তখনও শুকতারা দেখা যায়। দিগন্তের কাছে রুমান্ডি পাহাড়ের মাথায় সবুজ সত্তায় দপদপ করে। শুক্লপক্ষ হলে, ভোরে উঠে চাঁদটাকেও দেখা যায়। সারারাত অত বড় নীল আকাশে সাঁতার কেটে চাঁদ ক্লান্ত হয়ে কখন ঘুমোবে সেই আশায় স্থির হয়ে থাকে দিগন্তরেখার উপরে।

হাত-মুখ ধুয়ে বাংলোর হাতায় পায়চারি করি। কোনও কোনও দিন বা ইজিচেয়ারে বসে চুপ করে ভাবি।

এই সময়টা বোধহয় ভাববারই সময়। নিবিষ্ট মনে কোনও বিশিষ্ট চিন্তাকে বা কোনও বিশেষ জনকে ভাববার সময়। ভাবতে ভাবতে, পায়চারি করতে করতে সূর্যটাকে পাহাড় বেয়ে উঠতে দেখি।

সমস্ত জঙ্গল পাখিদের কলকাকলিতে ভরে যায়। টিয়ার ঝাঁক ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ করতে করতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। ময়ূর ডাকে। তিতিরগুলো টিঁহা টিঁহা টিঁহা করতে থাকে চারিদিক থেকে। তা ছাড়া কত অনামা পাখি, কত অচেনা সুর।

অনেকদিন সূর্য ওঠবার আগেই চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে 'টাবড়' থাকে। আমার মুনশি; হেল্লার। কোম্পানিরই লোক। অনেকদিনের পুরনো ও অভিজ্ঞ। ওর বাস নীচের গ্রাম সুহাগীতে। টাবড়ের চেহারা কিছু লম্বা চওড়া নয়। বেঁটে-খাটোই। কিন্তু দেখলেই মনে হয় শক্তিতে ভরপুর। মাথার চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু

মুখের কি শরীরের অন্য কোনও পেশীতে একটুও টান ধরেনি। মালকোঁচা বাঁধা কাপড়, কাঁধের ওপর শুইয়ে রাখা চকচকে ধারালো টাঙ্গি।

পাকদণ্ডী পথ বেয়ে সুগন্ধি বনে বনে তিন মাইল চার মাইল হেঁটে যেতে কিছু মনেই হয় না। বুঝতেই পারি না।

যেখানে 'কুপ' কাটা হচ্ছে, সেখানে পৌঁছই।

ওঁরাও, খাঁরওয়ার, চেরো, সমস্ত কুলিই টাঙ্গি হাতে সেখানে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে ততক্ষণে। তাদের টাঙ্গি চালানোর ঠকাঠক শব্দ, কাজ করতে করতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলায়, সারা জঙ্গল গম-গম করত। তেওয়ারীবাবুদের কর্মচারি রমেনবাবু কাজ দেখাশোনা করতেন। আমরা দু'জন ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতাম। টাবড় ঘুরে ঘুরে সর্দারি করত। গরম এখন খুব বেশি, তাই কাজ যা হবার তা সকালে এবং শেষ-বিকেলে হত।

ইতিমধ্যে কয়েকবার ঘোষদা আর তাঁর স্ত্রী সুমিতা বউদি এসেছিলেন, আমি কেমন আছি সেই খোঁজখবর নিতে। ঘোষদার সঙ্গে সুমিতা বউদিকে মোটেই মানায় না। বেমানানের কোনও সঙ্গত কারণ আছে বলে জানা নেই। কিন্তু কেন যেন মনে হয়, মানায় না। দু'জনের সম্পর্কের মাঝে কেমন যেন একটা অদৃশ্য বিপরীতমুখী ভাব বর্তমান; সেটা প্রমাণ করা মুশকিল, কিন্তু বোঝা আদৌ অসুবিধা নয়।

ঘোষদা খুব কৃপণ গোছের, হিসেবী, পান-খাওয়া মানুষ। একটি ভাল চাকরি আর সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে জীবনে আরও যে কিছু চাইবার আছে বা ছিল, সে-কথা বে-মালুম ভুলে গেছেন। এবং কখনও অন্য কেউ মনে করিয়ে দিলে কিংবা অন্য কোনও প্রসঙ্গে সেই বিষয় উঠলে তিনি ব্যথা পান না; বিব্রত হন না; ক্রুদ্ধ হন না। একটু ভিতু ভিতু, আমুদে; অতি সাধারণ একজন কৃতী এবং গৃহী মানুষ।

সুমিতা বউদি একেবারে উল্টো। রীতিমতো অসাধারণ। ভাল গান গাইতে পারেন, ক্ল্যাসিকাল। ছবিও আঁকেন অদ্ভুত সুন্দর। ওঁর চেহারায় এমন একটি বুদ্ধিমত্তার প্রসাধন, এমন একটি নারীসুলভ সৌকুমার্য ও অবলা ভাব যে তা গুছিয়ে বলা যায় না। মানে ওঁর কথায়, চোখের তারায়, ওঁর ব্যবহারে, এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, যে, ওঁর চেয়ে বেশি নারীত্ব আমি এর আগে আর কোনও নারীতে দেখিনি।

আমি নিজেকে শুধিয়েছি। বারবার শুধিয়েছি। জঙ্গলে পাহাড়ে আছি এবং সে কারণে ভদ্রমহিলাদের মুখ না দেখার দরুন বাঁশবনে শেয়াল-রানির মতো সুমিতা বউদিকেও বোধহয় সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলে ভ্রম করছি। কিন্তু এ সুন্দরী-অসুন্দরীর কথা নয়। সুমিতা বউদির মতো কমনীয়ভাবে হাসতে, কথা বলতে, এমনকী ঝগড়া করতেও আমি কোনওদিন কোনও মেয়েকে দেখিনি।

ভারী ভাল লাগত। এই নিয়ে সুমিতা বৌদি আর ঘোষদা প্রায় তিনবার এলেন। রুমান্ডিতে আমার খোঁজখবর নিতে। ছুটির দিনে সকালে জিপ নিয়ে চলে আসতেন। সারাদিন কাটিয়ে যেতেন। যেদিন ওঁরা আসতেন, ভারী ভাল কাটত দিনটা আমার। আমি যে এই রুমান্ডিতে পড়ে আছি তা মনেই হত না। ভাল ভাল বাঙালি-ফর্দের রান্না হত, আনন্দ করে খাওয়া হত। তারপর প্রচুর আড্ডা। মাঝে মাঝে যশোয়ন্ত আসত। কিন্তু বুঝতাম যে, ঘোষদা যশোয়ন্তকে বিশেষ পছন্দ করেন না। ঘোষদা-বৌদি যেদিন এখানে আসেন, সেদিন যে যশোয়ন্ত এখানে আসে, উনি বিশেষ চান না।

যশোয়ন্তের নামে দিনে দিনে অবশ্য অনেক কিছু শুনছি। অনেকের কাছে। যা সব

শুনি, তার সব কথা ভাল নয়, এবং কিছু কিছু তো এত বেশি খারাপ যে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয় না।

এখানকার লোকেরা বলে যশোয়ন্ত পাঁড় মাতাল। খুনিও বটে। কত যে পুরুষ আর নারী ওর শিকার হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। অবশ্য এসব কথা যাচাই করে দেখার মতো সুযোগ আমার আসেনি। হয়তো-বা ইচ্ছেও নেই। কারণ যাদের কাছে এসব কথা শুনেছি তারা কিন্তু বলেনি যে, যশোয়ন্ত লোকটা খারাপ। ওদের মুখ দেখে যা বুঝেছি তা হচ্ছে, যশোয়ন্তবাবুর পক্ষে অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। ওর পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব।

সুমিতা বউদি যে যশোয়ন্তকে তেমন অপছন্দ করেন, তা কিন্তু মনে হয় না। তিনি ঠিক আমার সঙ্গেও যতটুকু হেসে কথা বলেন, যশোয়ন্তের সঙ্গেও তেমনই। যশোয়ন্ত যে ভয় পাবার মতো কিছু, তা ওর মুখ-চোখ দেখলে মোটেই বোঝা যায় না। বরঞ্চ উনি যশোয়ন্তের সঙ্গে যশোয়ন্তের সর্বশেষ-মারা বাঘটার দৈর্ঘ্য নিয়ে আলোচনা করেন, যশোয়ন্তের হাজারিবাগ জেলায় এবার ফসল কেমন হল না হল, এই সব নিয়ে আলোচনা করেন।

যশোয়ন্তও বউদি বলতে পাগল। বউদির জন্যে জান কবুল করতে রাজি।

ও যে কার জন্যে জান না কবুল করে জানি না।

আজকে সুমিতা বউদি আর ঘোষদা প্রায় সূর্য ওঠার আগে-আগেই এসে হাজির।

বউদি বললেন, আজকে সুহাগীর চড়ায় আমরা পিকনিক করব। যশোয়ন্তও আসবে। খুব মজা হবে।

ঘোষদা বললেন, কিন্তু যশোয়ন্ত না আসা পর্যন্ত নদীতে যাওয়া হবে না। কোনও একটা আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া এই ভাবে 'নেচার' করার আমি ঘোরতর বিপক্ষে।

তখন ঠিক হল তাই হবে। এখানেই চা খেয়ে নেব সকালের মতো। তারপর যশোয়ন্ত এলে সকলে মিলে নীচে গিয়ে সুহাগীর বালিতে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় বসে 'চড়ুইভাতি' হবে।

বাংলোয় বসে রসিয়ে-রসিয়ে চা খাওয়া হল। যখন সূর্য বেশ উপরে উঠল, তখনও যশোয়ন্তের পাত্তা নেই। তখন সাব্যস্ত হল, রামধানিয়ার কাঁধে রসদ ও বাসনপত্র দিয়ে আমরা নেমেই যাই। যশোয়ন্ত এলে পাঠিয়ে দেবে জুম্মান।

ঘোষদার জিপে করে যাওয়া হল।

সুহাগী নদী সেই পাহাড়ি পথকে পায়ে মাড়িয়ে হাসতে হাসতে নিচু কজওয়ের নীচ দিয়ে কোয়েলের দিকে চলে গেছে। জিপ থামতেই চিঁহি চিঁহি আওয়াজ কানে এল। তাজ্জব বনে দেখলাম, যশোয়ন্তের ঘোড়া বাঁধা আছে একটা পলাশ গাছের সঙ্গে।

নদীরেখা ধরে এগোতেই দেখি, নদীর বাঁকে ওর সেই প্রিয় বড় ছায়াশীতল পাথরের পাশে উবু হয়ে বসে বড় বড় নুড়ি দিয়ে যশোয়ন্ত উনুন বানাচ্ছে। আমাদের সাড়া পেয়েই তেড়ে-ফুঁড়ে বলল, বেশ লোক যা হোক। প্রায় একটা ঘণ্টা হল এসে বসে আছি—না দানা, না পানি।

সুমিতা বউদি কলকল করে উঠলেন, বাজে বোকো না, তোমাকে কে সোজা এখানে আসতে বলেছিল? যা উনুন বানিয়েছে, তাতে তো বাঁদরের পিণ্ডিও রান্না হবে না। সরো, সরো দেখি, উনুনটা ধরাতে পারি কি না।

ঘোষদা শশব্যস্তে বললেন, কই? যশোয়ন্ত, তোমার বন্দুক কই? এইভাবে জঙ্গলে মেয়েছেলে নিয়ে আন-আর্মড অবস্থায় কখনও আসা উচিত নয়। বাঘ আছে, ভাল্লুক আছে, হাতি তো আছেই, তার উপর বাগেচম্পা থেকে মাঝে মাঝেই বাইসনের দল চলে আসে, বলা যায় কিছু?

যশোয়ন্ত চুপ করে কী ভাবল একটুক্ষণ, তারপর হেঁটে গিয়ে ওর ঘোড়ার জিনের সঙ্গে সমান্তরালে বাঁধা একটি কী যন্ত্র বের করে আনল। কাছে এসে গাছে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, এই হল তো? এবার বাইসন এলেও মজা বুঝবে। এ বন্দুক নয়। ফোর-ফিফটি-ফোর হান্ড্রেড ডাবল-ব্যারেল রাইফেল।

বউদি কেটলিটা উনুনে চড়াতে চড়াতে বললেন, তার মানে? একসঙ্গে সাড়ে চারশো-পাঁচশো গুলি বেরোয়?

যশোয়ন্ত হতাশ হবার ভঙ্গিতে পাথরের উপর বসে পড়ে বলল, হোপলেস। সাচমুচ বউদি। হোপলেস। তারপর হাত নেড়ে বলল, চারশো-পাঁচশো গুলি বেরোয় না, এটা রাইফেলের ক্যালিবার।

বউদি ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন, বললেন, ওঃ তাই বলো। তা রাইফেলের মালিকের ক্যালিবার কত?

যশোয়ন্ত এবার হেসে ফেলে বলল, তার ক্যালিবার বুঝনেওয়ালা লোক আজ পর্যন্ত এই পালামৌর জঙ্গলে দেখলাম না একজনও। তাই সে আলোচনা করা বৃথা।

জুম্মানের কাছে শুনেছি, যশোয়ন্ত অত্যন্ত রইস আদমির ছেলে। ওদের ছোটখাটো জমিদারির মতো আছে সীমারিয়া আর টুটলাওয়ার মাঝামাঝি। মুখে ও যাই বলুক, বাংলাটা খুব ভাল বললেও, ওরা আসলে বিহারী হয়ে গেছে। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। ওদের জমিদারির মাসিক আয় নাকি প্রায় হাজার দুয়েক টাকা। অথচ এই অল্প টাকার মাইনেতে এই জঙ্গলে ও পড়ে আছে আজ কত বছর। এই কাজটা বোধহয় ওর পেশা নয়, নেশা। বেহেত্‌রীন শিকারি নাকি ও। সারা বছর এইখানেই পড়ে থাকে। বছরে কোনও এক সময় যায় বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে। বেশিদিন থাকে না, পাছে ধরে বিয়ে দিয়ে দেয়। যশোয়ন্ত প্রায়ই আমাকে বলে যে, বিয়ে করা পুরুষ মানুষ আর ভরপেট মহুয়া খাওয়া মাদী শম্বর নাকি সমগোত্রীয় চলচ্ছক্তিহীন জানোয়ার।

হঠাৎ ঘোষদা বললেন, এই গরমে যে কোনও ভদ্রলোক চড়ুইভাতি করে, এই প্রথম দেখলাম।

যশোয়ন্ত বলল, তাও যা বললেন 'ভদ্রলোক'। মাঝে মাঝে এমনি বলবেন! নইলে আমরা যে ভদ্রলোক এ কথাটা এক আমরা এবং জঙ্গলের জানোয়ারেরা ছাড়া আর কেউ তো স্বীকার করে না। মাঝে মাঝে কথাটা শুনতে ভাল লাগে।

ঘোষদা উত্তরে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

বউদি ধমকে বলেন, তোমরা এখানে কী করতে এসেছ? চড়ুইভাতি করতে, না ঝগড়া করতে?

যশোয়ন্ত উল্টো ধমক দিয়ে বলল, দু'টোই করতে।

গরম যদিও আছে প্রচণ্ড। তবু কেন জানি...এ গরমে একটুও কষ্ট হয় না। কারণ এ গরমে ঘাম হয় না মোটে। শুকনো গরম খুব বেশি হলে মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে। তবে এই গরমে বেশি হাঁটা-চলা করলে লু লেগে যাবার সম্ভাবনা এবং তা থেকে অনেক সময়

পঞ্চত্বপ্রাপ্তিও ঘটে। তবু কলকাতার ভ্যাপসা-পচা গরম থেকে এ গরম অনেক ভাল। মনে হয়, মনের মধ্যেও যতটুকু ভেজা স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে, সেটাকে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে দেয় নিশ্চিহ্ন করে। মনটা যেন তাজা, হালকা, সজীব সুগন্ধে ভরে ওঠে।

আর্দ্রতা যত কম থাকে মনে, ততই ভাল।

সুমিতা বউদি আমায় বললেন, কী হল, এমন গোমড়ামুখো কেন?

বললাম, ভাষাটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছি না।

বউদি সপ্রতিভ গলায় হেসে বললেন, এ একটা সমস্যাই নয়। আগে একটি 'কা' পরে একটা 'বা'। তাহলেই ফিফটি পারসেন্ট হিন্দি-নবিশ হয়ে গেলে। বাদবাকি ফিফটি পারসেন্ট থাকতে থাকতে হবে। ভাষা এমনি শেখা যায় না। ভাষা শিখতে কান চাই। তোমার চারপাশে যত লোক কথা বলছে, তাদের উচ্চারণ, তাদের বাচনভঙ্গি এবং তারা কোন জিনিসটাকে কী বলে, কোনও অনুভূতি কীভাবে ব্যক্ত করে, এইটে বুদ্ধিমানের মতো নজর করলে যে কোনও ভাষা শেখাই সহজ।

যশোয়ন্ত বলে উঠল, জব্বর বলেছেন যা হোক। এই কারণে আমি মুরগি-তিতির আর শম্বরের ভাষা আয়ত্ত করেছি।

বউদি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আর ঘোড়ফরাসী ভাষা? সেটা আয়ত্ত করোনি?

দাঁতে একটা ঘাস কাটতে কাটতে দুষ্টু যশোয়ন্ত বলল, এ জঙ্গলে ঘোড়ফরাস বেশি নেই। তাই তাদের সঙ্গে কথোপকথন হয়নি।

বউদি পুরনো কথার সুতো ধরে বললেন, তবে যা বলছিলাম, পালামৌর হিন্দি শিখতে হলে 'কা' আর 'বা'। প্রথমে এই দিয়েই আরম্ভ করতে হবে।

যশোয়ন্ত আমার দিকেই ফিরে বলল, তাহলে আরম্ভ হোক। বলো দেখি ভায়া, কী সুন্দর সূর্যোদয়। হিন্দিতে কী হবে? একটা ব্রেনওয়েভ এসে গেল, বললাল, কা বঁড়িয়া সনরাইজ বা।

বউদি, ঘোষদা আর যশোয়ন্ত একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, সাবাস, সাবাস। তোমার হবে।

দেখতে দেখতে দুপুর হল। আমরা খেতে বসেছি এমন সময় নদীর পাশ থেকে কী একটা জানোয়ার আমাদের ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়ে ডেকে উঠল। ডাকটা অনেক অ্যালসেসিয়ান কুকুরের ডাকের মতো। ঘোষদা চমকে বললেন, কী ও!

মিথ্যা কথা বলব না, আমিও ভয় পেয়েছিলাম।

যশোয়ন্ত হাসতে লাগল, বলল, কোটরা হরিণ, ঘোষদা। আমার ধারণা ছিল না যে এইদিন জঙ্গলে থেকেও আপনি কোটরার ডাক শোনেননি।

ঘোষদা সামলে নিয়ে বললেন, শুনব না কেন? না শোনার কী আছে? তবে খেতে বসার সময় এসব বিপত্তি আমার ভাল লাগে না।

আমি শুধোলাম, কোটরা কী?

যশোয়ন্ত বলল, কোটরা এক রকমের হরিণ। ছাগলের মতো দেখতে। ছাগলের চেয়ে বড়ও হয়। ইংরাজিতে বলে Barking deer। অতটুকু জানোয়ার যে অত জোরে আর অত কর্কশ স্বরে ডাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। জঙ্গলের মধ্যে কোনও রকম অস্বাভাবিকতা, বাঘের চলা-ফেরার বা শিকারীর পদার্পণের খবর ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জঙ্গলে এরা জানান দিয়ে দেয়।

আমি শুধোলাম, এই জঙ্গলে কী কী জানোয়ার আছে?

যশোয়ন্ত বলল, অনেক রকম জানোয়ার আছে। সে সব কি মুখে বলে শেখানো যায়; সব ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে। দাঁড়াও না। তোমাকে আমার চেলা বানাব।

ঘোষদা ধমক দিয়ে বললেন, থাক। তুমি নিজে ডাকাত। দয়া করে ওকে আর চেলা বানিও না। নিজে তো গোল্লায় গেছোই, এই ছেলেটিকে আর দলে টেনো না।

একথা শুনে যশোয়ন্ত হাসি হাসি মুখে ঘোষদার দিকে তাকাল। কথা বলল না।

দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে এল; রোদের তেজ কমে গেল। হাওয়াতে মহুয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। সুহাগী নদীর শ্বেত বালুরেখায় দু-পাশের গাছের ছায়ারা দীর্ঘতর হয়ে এল।

বেশ কাটল দিনটা। এরকম সুন্দর শান্ত দিন সব সময় আসে না। এসব দিন মনে করে রাখবার মতো। অথচ কোনও বিরাট ঘটনা ঘটেনি। কোনও চিৎকৃত সভার আয়োজন হয়নি। তবু, মনে করে রাখবার মতো।

ঘোষদা ও সুমিতা বউদি আর বাংলো অবধি এলেন না। সোজা জিপে ডালটনগঞ্জের দিকে বেরিয়ে গেলেন। যশোয়ন্ত ওর ঘোড়ায় চেপে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে বাংলোয় ফিরল।

সময় কেটে গেল কিছুটা। যশোয়ন্ত গিয়েছে চান করতে। আমি একা।

চান করে টাটকা হয়ে যশোয়ন্ত এসে বসল ইজিচেয়ারে, তারপর হাঁক ছাড়ল, এ রামধানিয়া, ঠাণ্ডাই লাও। অমনি রামধানিয়া যথারীতি সিদ্ধি, পেস্তা, বাদাম ও ভয়সা দুধ দিয়ে বানানো ঠাণ্ডাই শ্বেতপাথরের গেলাসে করে এনে দিল। যশোয়ন্ত খুব রসিয়ে খেল।

যশোয়ন্ত বলল, লালসাহেব, আজ ঘোষদা নে মুঝে বিলকুল খরাব বানা দিয়। মগর জানতে হো মির্জা গালীব নে কেয়া কহা থা?

কেন জানি না, আমার মনে হল আজ যশোয়ন্ত মেজাজে আছে। আজকে হয়তো ও নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে ফেলবে, যা ও অন্যদিন হয়তো কোনওক্রমে বলত না।

আমি ওকে খুঁচিয়ে দিয়ে বললাম, এমনি এমনি কেউ কাউকে খারাপ বলে না নিশ্চয়ই।

যশোয়ন্ত একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। বলল, দোষ-গুণ জানি না। আমি যা, আমি তা। লুকোচুরি আমি পছন্দ করি না। আমি যা, সেই আমাকে যদি কেউ ভালবাসে, কাছে ডাকে, তাকেই আমি দোস্ত বলি, অন্যকে বলি না, অন্যের মতামতের জন্যে আমি পরোয়াও করি না। আমি মদ খাই। কিন্তু আমি মাতাল নই।

যখন ইচ্ছে হয় খাই। কেউ আমাকে কখনও রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামি করতে দেখেনি। মদ খাওয়া ছাড়াও আমি এমন অনেক কিছু করি, যা শুনলে তোমাদের মতো ভাল ছেলেরা আঁতকে উঠবে।

আমি বললাম, কিন্তু যশোয়ন্ত, তোমার মতো ছেলে মদ খাবে কেন?

যশোয়ন্ত আমাকে চোখ রাঙিয়ে বলল, তোমার মতো ছেলে বলছ কেন? আমি কি তোমাদের মতো মাখনবাবু নাকি? মদ খাই, খেতে ভাল লাগে বলে। দিল খুশ্ হো যাতা হ্যায়। তাই খাই।

কিন্তু তোমার কী এমন দুঃখ, যার জন্যে তোমাকে এমনভাবে নষ্ট হয়ে যেতে হবে?

যশোয়ন্ত খুব একচোট হাসল। কেঁপে-কেঁপে। তারপর বলল, যে সব লোক দুঃখ ভোলার দোহাই দিয়ে মদ খায়, সেগুলো মানুষ নয়। আমি মদ খাই কোনও দুঃখ ভোলার জন্যে নয়। কারণ কোনও দুঃখ আমার নেই। মদ খাই খেতে ভাল লাগে বলে। খেয়ে নেশা হয় বলে। কোনও শালার বাবার পয়সাই খাই না। নিজের পয়সায় খাই। খেতে ভাল লাগে বলে খাই। বেশ করি।

তারপর বুঝলে লালসাহেব, যেদিন ইচ্ছা হয় 'লালতি'র কাছে যাই। আগে রুক্‌মানিয়ার কাছেও যেতাম। সে তো মরে যাবে শিগগির। সেও এক ইতিহাস। লালতির কাছে যাই, কিন্তু বিনি পয়সায় যাই না। বিস্তর পয়সা খরচ করতে হয়।

আমি বললাম, থাক, তোমার এই বীরত্বের কাহিনী আমায় আর নাই-বা শোনালে। অসুবিধা এই যে, তুমি যা বাহাদুরি বলে বিশ্বাস করেছ, তা থেকে তোমাকে নড়ানো আমার ক্ষমতার বাইরে। মনে হয়, চেষ্টা করাও বৃথা।

যশোয়ন্ত আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, চেষ্টা করো না লালসাহেব। আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হলে আমি যা, আমাকে তাই থাকতে দিয়ো। যদি কোনও দিন নিজেকে বদলাই তো এমনিই বদলাব, নিজেকে বদলানো প্রয়োজন বলে বদলাব, নিজে যতদিন মন থেকেই সেই পরিবর্তন কামনা না করব, ততদিন পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই, যা আমাকে বদলায়। তুমি বৃথা চেষ্টা কোরো না।

আমি বললাম, রুকমানিয়া না কার কথা বললে। ঘোষদার কাছে শুনেছি, তার জীবন নাকি ইতিহাস! বলো না যশোয়ন্ত, কী সে ইতিহাস। আর কে সে রুকমানিয়া?

সেই অন্ধকারে ওর তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে যশোয়ন্ত আমাকে নিঃশব্দে চিরে চিরে দেখল কিছুক্ষণ; তারপর হায়নার মতো বুক কাঁপিয়ে হেসে উঠল। বলল, একেবারে, হুবহু।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, হুবহু?

হুবহু শহুরে লোক। কৌতূহলী, বিশেষ করে কোনও নিন্দার বিষয় হলে। পরনিন্দা আর পরচর্চা, এই তো করে, কী বলো? তোমার শহুরে লোকেরা?

তারপর নিজেই বলল, রুকমানিয়ার গল্প তুমি শুনতে চাও তো শোনাব। তবে সে আজ নয়। সময় লাগবে। অন্যদিন হবে। অনেক বড় গল্প। লালসাহেব, শুধু রুকমানিয়া কেন? এই যশোয়ন্তের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প আছে। এক-একটা দিনই এক-একটা গল্প।

আরও কিছুক্ষণ পর যশোয়ন্ত উঠল। বলল, অব্ চলো ইয়ার।

বললাম, এই অমাবস্যার অন্ধকারে জঙ্গলের পথে যাবে? তা ছাড়া রাস্তা মোটে দেখা যাচ্ছে না, যাবে কী করে? থেকে যাও না আজ।

যশোয়ন্ত বলল, আরে ঠিক চলে যাব। বড় মজা লাগে এমনি অন্ধকারে যেতে। কারণ ডাইনে-বাঁয়ে কিছু নেই। ঘন অন্ধকারে লাল মাটির আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নিচু রাস্তাটাকে মনে হয় একটি শুয়ে থাকা মেটে-অজগর সাপ। অথচ সেইটুকু দেখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। অন্ধকারে চাইলেই চাপ-চাপ গাঢ় অন্ধকার মুখ-চোখে থাবড়া মারে। ঘোড়ার ওপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে মহুয়ার গন্ধে মাতাল করা বনে খোয়াব দেখতে দেখতে চলে যাই; দেখি কখন 'নইহার' পৌঁছে গেছি। তোমাকেও ঘোড়ায় চড়া শেখাব, দাঁড়াও না।

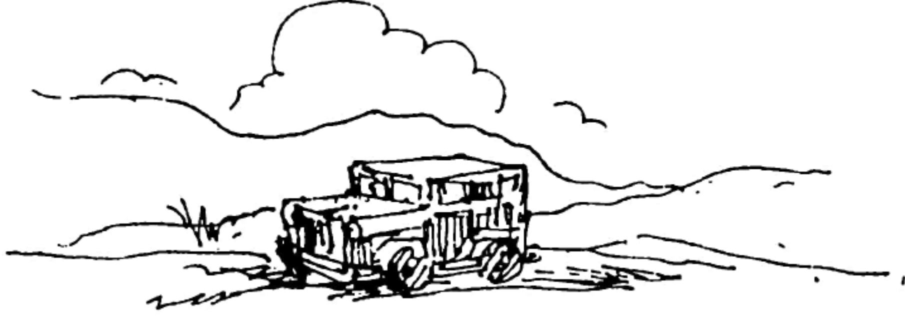
বললাম, হ্যাঁ, তুমি তো আমাকে সব কিছুই শেখাচ্ছ।

যশোয়ন্ত ঘোড়ায় উঠতে বললে, দেখো না ঠিক শেখাব।

তারপর হাত দিয়ে ঘোড়ার গলার কাছে একটু চাপ দিয়ে যশোয়ন্ত বলল, চলো ভয়ঙ্কর।

অবাক হয়ে বললাম, ভয়ঙ্কর কী? ঘোড়ার নাম ভয়ঙ্কর? ও বলল, এই রকম ভয়াবহ জায়গায় নিজে ভয়ঙ্কর না হলে বাঁচবে নাকি। শালা হাতিকে বড় ভয় পায়।

খট্ খট্ খটা খট্ করে যশোয়ন্তের ভয়ঙ্কর ভয়াবহ অন্ধকারে হারিয়ে গেল।



চার

কাল রাত্রে বেশ ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। সমস্ত জঙ্গলে পাহাড়ে চলেছে তাণ্ডব নৃত্য। হাওয়ার সে কী দাপাদাপি আর গর্জন! অথচ বৃষ্টির তেমন তোড় ছিল না। হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সত্তা এমনভাবে মিশে গেছে যে হাওয়াটাই বৃষ্টি, না বৃষ্টিটাই হাওয়া বোঝা যায় না। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতো ঠাণ্ডা পড়ে গেছিল। রাতে দেরাজ খুলে বালাপোশ বের করে গায়ে দিতে হয়েছে। সকালে এখনও বেশ ঠাণ্ডা। হাওয়াটা মনে হচ্ছে জ্যৈষ্ঠের শেষের হাওয়া তো নয়, শরতের প্রথম হাওয়া।

আজকে আমার জিপ গাড়ি আসবে ডালটনগঞ্জে। এবং আমার নতুন বন্দুক। সেখান থেকে ঘোষদার ড্রাইভার গাড়ি, বন্দুক পৌঁছে দিয়ে যাবে।

মনে হচ্ছে, জিপটা যে এত তাড়াতাড়ি এল তার কারণ আর কিছু নয়, কোম্পানির ডিরেকটরেরা সস্ত্রীক এবং সবান্ধবে শিকারে আসছেন পরের সপ্তাহে এখানে। বাঘ শিকারে। যার আর এক নাম, জাঙ্গল ইন্‌স্‌পেকশান। সব খরচা কোম্পানির। যে খরচ কোম্পানির খাতায় লেখার নিতান্ত অসুবিধা, সে খরচ চাপবে তেওয়ারীবাবুর ঘাড়ে, কিংবা অন্য জায়গায় যে হ্যান্ডলিং কন্‌ট্রাকটর আছে, তাঁদের ঘাড়ে।

সভয়ে দিন গুণছি। মালিক ও তাঁর স্ত্রীর আগমনের প্রতীক্ষায়।

পথে বেরিয়ে দেখি, সারা পথে পুষ্পবৃষ্টি হয়ে রয়েছে। শুধু ফুল নয়, কত যে পাতা— রঙিন পাতা, হলদে পাতা, ফিকে হলদে পাতা, গোলাপি পাতা, লাল পাতা, সবুজ পাতা, কচি কলাপাতা রঙা-পাতা, জঙ্গলের গায়ে বিছানো রয়েছে, কী বলব। তার সঙ্গে ফুল। সমস্ত জঙ্গলে—মনে হচ্ছে যেন এক বিচিত্র বর্ণ মখমল কোমল, নয়নাভিরাম গালিচা বিছানো রয়েছে। পা ফেলতে মন কেমন। সেই চমৎকার আবহাওয়ায়, সেই সকালে সমস্ত প্রকৃতির শব্দ গ্রহণ ও শব্দ প্রেরণ করার ক্ষমতা যেন অনেক বেড়ে গেছে। দূর জঙ্গলের ময়ূরের কেঁয়া, কেঁয়া, মোরগের কঁকর কঁ, হরিয়ালের সম্মিলিত পাখার চঞ্চলতার শব্দ যেন মনে হচ্ছে কানের কাছে।

টাবড় আজ বন্দুক নিয়েছে সঙ্গে। মাঝে মাঝে ও টাঙ্গি ছেড়ে বন্দুকও নেয়। তার সেই বন্দুক দেখে মনে হয় তার জন্ম প্রাগৈতিহাসিক কালে। মুঙ্গেরী একনলা গাদা বন্দুক। তাতে কোনও টোপিওয়ালা কার্তুজ যায় না। গাদতে হয়। জানোয়ার বিশেষে সেই গাদাগাদির প্রকারভেদ হয়। ছোট জানোয়ারের জন্য কম বারুদ গাদতে হয়। এই গাদাগাদি কোনও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে হয় না। অংগুলি ধরে হিসাব। যেমন বাঘের জন্য

তিন অংগ্লি, হরিণের জন্য দেড় অংগ্লি ইত্যাদি।

আজকাল বেশ অনেক কিছু শিখে গেছি। আর সেই শহুরে বোকা ছেলেটি নেই। দেহাতী হিন্দিটাও মোটামুটি রপ্ত। সুমিতা বউদির 'কা' এবং 'বা' কিন্তু একেবারে উপেক্ষা করার নয়। রীতিমতো কাজে লেগেছে।

টাবড় একদিন মুরগি মারতে নিয়ে গেছিল।

মাঝে মাঝে গভীর জঙ্গলে গেলে দেখা যায়, শুকনো গাছের ডালে পলাশ ফুলের মতো মুরগি ফুটে আছে। টাবড়ের মতো আমি মহুয়া খাই না। মহুয়া না খেয়েই বলছি।

সকালের সোনালি আলোয় যখন কোনও মদমত্ত মোরগ কোনও বিতৃষ্ণাগত পলায়মানা মুরগির পেছনে পেছনে ছলে বলে কৌশলে কঁক্ কঁক্ কুঁক্ কুঁক্ করতে করতে ধাওয়া করে জঙ্গলময় ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন-কেন জানি না আমাদের সঙ্গে এই আত্মসম্মানজ্ঞানহীন কুক্কুট প্রবরদের একটা জবরদস্ত ও অবিচ্ছেদ্য মিল দেখতে পাই। সোনালি পাখনায় মোড়া, দীর্ঘগ্রীবা, সুতনুকা, কলহাস্য এবং লাস্যময়ী কুক্কুটিদের সঙ্গে, ব্যাককুম্ব্ করা সুগন্ধী স্মিতমুখী আধুনিকাদের কোনও তফাত দেখতে পাই না। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আমরা যে মোরগ-মুরগিদের থেকে কিছুমাত্র বেশি উন্নতি করেছি, তা তখন মনে হয় না।

দেখলাম টাবড় ডেকে ডেকে মুরগি মারে। কাজটা গর্হিত এবং সুখপ্রদ যে নয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু রকমটা আশ্চর্য।

আমরা বাংলো থেকে প্রায় আধমাইল গেছি, এমন সময় বেশ কাছেই শুঁড়িপথের ডানদিকে একটি মোরগ ডেকে উঠল। টাবড়ের মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। রামধানিয়াকে ওইখানে বসে থাকতে বলে আমাকে বলল, আইয়ে হুজৌর।

রামধানিয়া ওইখানেই একটা পাথরের উপর বসে আমাকে আড়াল করে বিড়ি ধরাল।

আমি আর টাবড় পথ থেকে জঙ্গলে ঢুকলাম।

যেখান থেকে মোরগটা ডেকেছিল তার কাছাকাছি গিয়ে একটি ঝোপের মধ্যে আমাকে নিয়ে টাবড় বসে পড়ল। তারপর গলা দিয়ে, জিব দিয়ে, তালু দিয়ে অবিকল মুরগির ডাক ডাকতে লাগল। অঁ-ক-ক-ক্ক-ক...ক্কঁ-ক্ক, আর তার সঙ্গে মাঝে মাঝে মুরগি যেভাবে পা দিয়ে পাতা উলটে পোকা কি খাবার খোঁজে, সেই শব্দ করে আমাদের পাশের ঝরাফুল, পাতা, আঙুল দিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগল।

অবাক হয়ে দেখলাম, টাবড়-মুরগির ডাকে সাড়া দিয়ে দিয়ে সেই অদৃশ্য মোরগের ডাক ধীরে ধীরে আমাদের নিকটবর্তী হতে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে, ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল, একটি প্রকাণ্ড সোনালিতে লালে মেশানো মোরগ বীরদর্পে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। তার পেছনে মুরগির হারেম।

চার চোখের মিলন হওয়ামাত্র টাবড় 'গদাম্' করে দেগে দিল এবং একরাশ পালক হাওয়ায় উড়িয়ে মোরগটি, আর তার সঙ্গে একটি মুরগিও ওইখানেই উল্টে পড়ল। বাদবাকিরা কঁক্কর-কঁ-কুঁক্-কুঁক্-কুঁক্ করতে করতে পড়ি-কি মরি করে পালাল।

শিকারের ফল ভাল হলেও শিকারের প্রক্রিয়াটি ভাল লাগল না। তারপর থেকে এভাবে মুরগি মারতে আমি টাবড়কে সব সময় মানা করেছি। আমার সামনে আর মারেনি সত্যি কথা, কিন্তু মনে হয় না আমার অনুরোধ-উপরোধে কোনও কাজ হয়েছে।

মুরগি দুটো রামধানিয়ার হেফাজতে দিয়ে আমরা আবার এগোলাম।

সূর্যটা এখনও ওঠেনি। হাঁটতে এত ভাল লাগছে যে কী বলব। সমস্ত বন পাহাড় কী এক সুগন্ধে ম' ম' করছে। একটি বাঁক নিলাম। দেখলাম, পথের পাশেই একটু ফাঁকা জায়গায় চড়ুই-রঙা একদল ছোট পাখি মাটিতে কুর্ কুর্ করছে। আমাদের দেখেই পুরো দলটি অবিশ্বাস্য বেগে ছোট ছোট পা ফেলে মিকি মাউসের বাচ্চার মতো দৌড়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

টাবড় শুধাল, ঈ কওন চিজ আপ জানতে হ্যায় সাহাব?

বললাম, আমি আর কটা চিজ্ জানি বাবা?

টাবড় বলল, বটের। এদের নাম বটের, যারা জানে না তারা ভাববে তিতির-বাচ্চা বুঝি। হাবভাব রাহান সাহান অবিকল তিতিরের মতো।

আমি শুধোলাম, রাহান্-সাহান্ কী?

রাহান্-সাহান্ হচ্ছে চরাবরার জায়গা, আদব কায়দা ইত্যাদি।

টাবড়কে বললাম, আমাকে শিকার শেখাবে টাবড়? আমার বন্দুক আসছে কলকাতা থেকে সাহেবদের সঙ্গে।

টাবড় বলল, জরুর শিখলায়গা হুজোর। আনে দিজিয়ে বন্দুকোয়া।

'বাগডুনুয়া' নালায় পৌঁছে দেখি স্তূপীকৃত বাঁশ পড়ে আছে। লাদাই হচ্ছে আর লরি বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে ছিপাদোহর। লরি মানে আধুনিক দানবীয় ডিজেল মার্সিডিজ লরি নয়। সেই মান্ধাতার আমলের ছোট ছোট চিৎকৃত লরি। অঢেল ধুলো, পেট্রলের মিষ্টি গন্ধ এবং গিয়ার চেঞ্জের গোঙানি ভাল লাগে।

গাছতলায় বসে বসে ছাপানো স্টেটমেন্টে দাগ দেওয়া আর নোট দেওয়া—এই তো কাজ। তা ছাড়া সেখানে আমি একজন ভীষণ রকম বড়লোক। লেখাপড়া জানি, সাড়ে চারশো টাকা মাইনে পাই, সাহেবদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা কইতে পারি, গায়ের রঙ কালো নয়, অতএব আমিও একজন সাহেব। এবং শুধু সাহেব নয়, লালসাহেব।

কোনও সত্যিকারের সাহেবকেই এ পর্যন্ত নীল কিংবা কালো বা জাফরানি হতে দেখিনি; সাহেবরা তাঁদের নিজেদের কোনও চেষ্টা ব্যতিরেকেই লাল হয়ে থাকেন। সুতরাং এ হেন পরিস্থিতিতে, আমা-হেন লোকের 'লাল' বা 'সাহেব' বলে পরিচিত হবার কথা ছিল না। নামটার রটনা যশোয়ন্তের দুষ্কর্ম।

তবে এখানে আসার বেশ কিছুদিন পরই দেখছি যে, সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যারা আট আনা, এক টাকা মজুরি পায়, যাদের বিলাসিতা মানে ভাত খাওয়া, যাদের জীবন বলতে জঙ্গলের 'কূপ' আর কুপি-জ্বালানো একটি মাটির ঘর, যাদের খুশি বলতে চার আনার এর হাঁড়ি মহুয়ার মদ কি খেজুরের তাড়ি, তাদের কাছে আমি ছাড়া সাহেব পদবাচ্য আর কোন জীব হবে?



পাঁচ

যেরকম ভেবেছিলাম তেমন কিছু না। বিকেলের দিকে একটি গাড়িতে ওঁরা এসে পৌঁছালেন। হুইটলি সাহেব, মিসেস হুইটলি, বোন জেসমিন এবং হুইটলি সাহেবের বন্ধু বেকার। সঙ্গে আমার জিপও এল। এতদিন পাঠাতে পারেননি এবং যেদিন পাঠানো হবে কথা ছিল, সেদিন পাঠানো সম্ভব হয়নি বলে সাহেব ভদ্রতা করে ক্ষমা চাইলেন।

যশোয়ন্ত আগে থাকতে হাজির ছিল। যা দেখলাম, সাহেবের সঙ্গে যশোয়ন্তের রীতিমতো তুই-তোকারি সম্পর্ক। পিঠে চাপড় দিয়ে কথা বলেন একে অন্যকে। যশোয়ন্তটা এত ক্ষমতাবান জানলে তো আগে ওকে আরও বেশি খাতির যত্ন করতাম। যাকগে যা ভুল হবার, হয়েছে। পরে শুধরে নেওয়া যাবে।

মিসেস হুইটলি চমৎকার মহিলা। রীতিমতো সুন্দরী। মধ্যবয়সী। অপূর্ব কথাবার্তা এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা আমেরিকান হলেও, ইংরেজি শুনে ওয়েস্টার্ন ছবির কথা মনে পড়ে না। আর তস্য সহোদরার তো তুলনা নেই। এমন একটি আর্যকন্যাসুলভ মহিমা যে কী বলব। গায়ের রঙ গোলাপি। পরনে একটি ফিকে চাঁপারঙা গাউন। পোশাকের জন্য চেহারাটা বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে; না চেহারার জন্য পোশাকটা বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। মাথাভরা সোনালি চুল। হাসলে কেমন যেন মাদকতা। সব মিলিয়ে দিন তিন-চার একটু খিদমদগারি করতে হবে বটে এঁদের। তবে এই জঙ্গলে সঙ্গী বিশেষ করে সুন্দরী সঙ্গী পেলে খারাপ লাগার কথা নয়।

বেকার সাহেব, যাঁকে দুঁদে শিকারী বলে হুইটলি সাহেব পরিচয় দিয়েছিলেন, অত্যন্ত কদাকার, মাঝারি উচ্চতার তীক্ষ্ণনাসা ভদ্রলোক। চেহারা দেখলে মনে হয় না নড়াচড়া করবার শক্তি রাখেন। কী করে যে বড় শিকারী হলেন জানি না।

বাংলোর হাতায় চেরি গাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে গল্প হচ্ছিল। যশোয়ন্তের ভাষায় ওর খুব 'দিলখুশ্'। কারণ বিয়ারের বোতলের কম্‌তি নেই। বেকার সাহেব বললেন, আমি ওল্ড স্কুলের লোক। সানডাউন-এর পর হুইস্কি ছাড়া কিছু খাই না। গর্দান খাঁ, জুম্মান এবং অন্যান্যরা সাহেবেদের কাবাব ইত্যাদি জোগাতে ব্যস্ত। আজ বোধহয় দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী হবে। চাঁদের জোর আছে। ভালই হবে। সন্ধের পর আমার মালিক-মালিকিনরা সবাই দিল খুশ্ করতে পারবেন।

যশোয়ন্ত আগামীকাল ভোরের প্ল্যান বোঝাচ্ছিল। একেবারে ভোরে ভোরে হেভি ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়া, সোজা বাগেচম্পার দিকে। কোয়েলের অববাহিকায়। মাচান

বাঁধিয়ে রেখেছে যশোয়ন্ত। টাবড়ও তার ছুলোয়া করবার দলবল নিয়ে প্রায় রাত থাকতে হাজির থাকবে সেখানে। এখান থেকে ওখানে পৌঁছে আমরা মাচায় বসলেই ছুলোয়া শুরু হবে। যশোয়ন্ত যা বললে, তাতে নাকি একজোড়া বাঘ আছেই। বরাত থাকলে একজোড়াই মারা পড়বে। সবই নির্ভর করবে শিকারীদের ওপর।

মিসেস হুইটলি বললেন, দু'টির মধ্যে একটি তো যশোয়ন্ত মারবে।

যশোয়ন্ত বলল, আমি একটিও মারব না। আমি স্টপার। আপনারা অতিথি, আপনারা মারবেন। তাহলেই আমার আনন্দ।

হুইটলি সাহেব আমার জন্য যে বন্দুক এনেছেন, কোম্পানির পয়সায়, সেটি যশোয়ন্ত নেড়েচেড়ে দেখল। ম্যান্টন্ কোম্পানির সাদামাঠা বন্দুক। আঠাশ ইঞ্চি লম্বা ব্যারেল, দো-নলা। যশোয়ন্ত ফিস্ ফিস্ করে বলল, চলো তোমাকে এবার চেলা বানাব। তারপর মিঃ বেকারকে বলল, দেখুন তো এ ছোকরাকে কনভার্ট করতে পারেন কি না! যদি পারেন তো বুঝব আপনার এলেম আছে। বেকার সাহেব সর্বসময় তৃষ্ণাগত প্রাণ। উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ঠিক আছে। বাজি রইল। যাবার আগে কনভার্ট করে যাব।

হুইটলি সাহেব আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, আমার মনে হয় তুমি জেসমিনের সঙ্গে কথা বলে আরাম পাবে। য়্যুনিভার্সিটিতে কী বিষয় নিয়ে পড়ছে জানো? তুলনামূলক সাহিত্য। আমরা অন্য যারা এখানে কী আছি, তারা তো বাঁশ ছাড়া কিছুই বুঝি না।

আমি সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম শুনে জেসমিনও খুব অবাক হল। আমরা দু'জনে দুটো বেতের চেয়ার নিয়ে একপাশে বসে গল্প শুরু করলাম।

আমি বললাম, এই চাঁদ ভাল লাগছে না?

এই চাঁদই আমার অসুখ। আমাদের দেশেও তো চাঁদ কম সুন্দর নয়। বিভিন্ন পরিবেশে, রূপ আলাদা আলাদা বইকী। কেন জানি না, এ জায়গাটা ভারী ভাল লাগছে। সারা রাস্তা আমি তাই বলতে বলতে এসেছি। এখানে আসার আগে আমরা নেতারহাটে একরাত কাটিয়ে এলাম। ভারী চমৎকার জায়গা। সেখানে নেমে বানারি হয়ে পালামৌর গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে এতটা পথ এলাম। জঙ্গল আমার ভীষণ ভাল লাগে। কেন জানি না, আমার মনে হয় আমাদের আধুনিক সভ্যতার একমাত্র আশা, প্রকৃতির সঙ্গে দৃঢ়তর সম্পর্ক।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আশ্চর্য, ঠিক এমনি কথাই আমি বোধহয় দু'দিন আগে আমার ডায়েরিতে লিখেছি। আপনার কথা শুনে ভারী আনন্দ হল।

তারপর শুধোলাম, চাঁদই আপনার অসুখ বললেন, সেটা কীরকম?

জেসমিন হাসল। সেই ফালি-চাঁদের আলোয় চেরি গাছের চিরুনি-চিরুনি পাতার ছায়ায় ব'্ে রুমান্ডি পাহাড়ের পটভূমিতে, মেয়েটির হাসি ভারী ভাল লাগল। জেসমিনের মধ্যে এমন কিছু একটি আছে; ভাল বাজনার মতো, যা দেশকাল বা ভাষার বাধা মানে না।

জেসমিন বলল, পূর্ণিমা রাত হলেই আমার পাগলামি বাড়ে; মনটা যেন কেমন করে, কী যে চাই, আর কী যে চাই-না বুঝতে পারি না। কেবল সমস্ত মন জ্বালা করে। লুকিয়ে লুকিয়ে 'জিন' খাই। চাঁদের আলোর মতো 'জিন'। আমার মা বলেন, The moon has got into your veins. And that's my disease!

খুব মজা লাগল ওর কথা শুনে। চাঁদে পা-দেওয়া দেশের মেয়ে হয়েও চাঁদ নিয়ে এত কাব্যি!

জেসমিন পরীর মতো শ্বেতা হাতে ঢেউ তুলে ভরা-জ্যোৎস্নায় অনেক কথা অনর্গল বলে যেতে লাগল। আমি কল্পনার তুলি দিয়ে বসে বসে ওর কথার উপরে বুলিয়ে বুলিয়ে একটি মনের মতো ওর ছবি আঁকলাম। যা আমি দেখতে পারছিলাম, কিন্তু অন্য কাউকে দেখাতে পারছিলাম না।

মাঝে মাঝে যশোয়ন্ত আর হুইটলি সাহেবের উচ্চকণ্ঠের হাসি এসে কানে ধাক্কা দিচ্ছে। যত রঙ চড়ছে হাসির জোরও তত বাড়ছে। আর এদিকে জেসমিন আমার মনের কাছে একটি পায়রার মতো অনুচ্চে বকম বকম করছে।

জুম্মান এসে কানে কানে বলল, খানা লগা দিয়া সাব।

উঠে গিয়ে ওদের বললাম, এবার খেতে বসা যাক। কাল ভোরবেলা উঠতে হবে।

বেকার সাহেব আমাকে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, বসুন বসুন, খাওয়া তো আছেই, যশোয়ন্ত এখন জোর গল্প জমিয়েছে বাইসন শিকারের।

কিন্তু যশোয়ন্ত সবচেয়ে আগে উঠে পড়ল এবং অর্ডারের ভঙ্গিতে তর্জনী দেখিয়ে বলল, এভরিবডি টু দি ডাইনিং রুম। ডিনার ইজ সার্ভড। দিস ইজ মাই শুট অ্যান্ড এভরিবডি শ্যাল ওবে মি। দেখলাম, সকলে বিনা বাক্যব্যয়ে সুড়সুড় করে খাওয়ার ঘরের দিকে চলল।

খাওয়া-দাওয়া সারা হতে হতে রাত দশটা বাজল। যশোয়ন্ত আমার তাঁবুতে শোবে আজ। কাল একসঙ্গে ভোরবেলা রওয়ানা হওয়া যাবে এখান থেকে। যশোয়ন্ত বলল, তাঁবুর ঝালর-ফালর বন্ধ করা হবে না; গরম লাগবে। আমি বললাম, তোমার তো গরম লাগবেই। গরম গরম জিনিস পান করেছ—কিন্তু আমি এই জঙ্গলে উদোম-টাঁড়ে শুয়ে থাকতে রাজি নই।

খাওয়ার পরে যশোয়ন্ত বলল, ফুঃ, সঙ্গে যশোয়ন্ত বোস আছে। কোনও জানোয়ারের ঘাড়ে একটার বেশি মাথা নেই যে, জেনেশুনেও এখানে আসবে।

ওর সঙ্গে তর্কে পারা ভার।

ভাগ্য ভাল। আকাশটা নির্মেঘ। ফুটফুটে স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। তাঁবুর চারিদিক খোলা থাকাতে তাঁবুময় আলোর বন্যা। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। সুহাগী নদীর দিক থেকে নিচের উপত্যকায় একটা রাতচরা টি-টি পাখি, টিটির-টি টিটির-টি করে ডেকে বেড়াচ্ছে। হাওয়ায় মহুয়া এবং অন্যান্য ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। অবশ্য মহুয়া এখন প্রায় শেষ হয়ে এল। মে-মাসের শেষ।

সবিস্ময়ে দেখলাম, যশোয়ন্ত শুতে এল না পাশের ক্যাম্প খাটে। বাইরে জ্যোৎস্নায় ইজিচেয়ার নিয়ে বসল; এবং কোথা থেকে পেল জানি না, একটা মার্টিনির বোতল খুলে মিষ্টি গন্ধের পানীয় খেতে লাগল।

আমি বললাম, যশোয়ন্ত এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। অনেক হয়েছে, এবার শুয়ে পড়ো, কাল ভোরে উঠে শিকারে যেতে হবে না?

যশোয়ন্ত ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, এরকম বাঘ শিকার জীবনে অনেক করেছি লালসাহেব; তার জন্যে তোমার চিন্তার কারণ নেই। মেয়েটির সঙ্গে তো খুব ভাল জমিয়ে ফেলেছ—বেহেত্‌রীন্‌।

অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘুম ভেঙে গেল। ড্রাইভারদের গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ, খাবার ঘরের টেব্‌লে ব্রেকফাস্টের আয়োজন, রামধানিয়ার নাগরা জুতোর অনুক্ষণ ফটাস ফটাস

ইত্যাদিতে ঘুমিয়ে থাকা আর চলবে মনে হল না। উঠে দেখি, যশোয়ন্ত যে শুধু ঘুম থেকে উঠেছে তাই নয়, চান করে, জামা কাপড় পরে, রাইফেল পরিষ্কার করছে জ্যাকারাণ্ডা গাছের তলায় ঊষার আলোয়। আমাকে উঠতে দেখে বলল, এই যে মাখনবাবু, তাড়াতাড়ি করুন, বন্দুকটাও নিয়ে নিন। আজ মরা বাঘের উপর বউনি হবে।

বললাম, আমার নাম মাখনবাবু নয়।

যশোয়ন্ত হেসে বলল, রাগ করছ কেন দোস্ত। তুমি হলে গিয়ে কলকাতার বাবু। ননীর পুতুল। রোদ লাগলেই গলে যাও কি না। তাই নাম দিয়েছি মাখনবাবু।

ব্রেকফাস্ট সেরে রওয়ানা হতে হতে একটু দেরিই হয়ে গেল। সূর্য অবশ্য তখনও ওঠেনি। দুটি জিপে বোঝাই হয়ে আমরা রওয়ানা হলাম বাগেচম্পার দিকে। যশোয়ন্ত অনেকবার বলেছিল ওখানে নিয়ে যাবে। নিয়ে গিয়ে চাঁদনি রাতে বাইসনের দল দেখাবে। এ যাত্রায় তা যে হবে না বুঝতে পারছি।

চমৎকার রাস্তা। রুমান্ডিতে এসে সেই যে খুঁটি গেড়ে বসেছি, তারপর এতখানি দূরে আসা আমার এই প্রথম। বেশির ভাগই শাল আর সেগুনের বন, বাঁশও আছে অজস্র। রাস্তার দু-পাশে জীরহুল, ফুলদাওয়াই আর মনরঙ্গোলি সকালের শান্তিতে নিস্তেজ হাসি হাসছে। এখনও যৌবন-জ্বালা শুরু হয়নি। রোদের সঙ্গে সঙ্গে ওরা জ্বলতে থাকবে। আর জ্বালাতে থাকবে।

আমার বাংলো থেকে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার রাস্তা। কোয়েল নদীর পাশে, বড় বড় ঘাসে ভরা একটি জায়গায় এসে আমরা থামলাম। মধ্যে অনেকখানি জায়গায় শুধু ঘাস। বড় জঙ্গলও আছে দু'পাশে। জিপগুলো একটা ঝাঁকড়া সেগুনের নীচে রাখা হল। ড্রাইভারদেরও ওখানেই থাকতে বলা হল এবং বলা হল ওরা যেন কথাবার্তা না বলে। চুপ করে গাড়িতে বসে থাকে। ভয়ের কারণ নেই।

যশোয়ন্ত আগে আগে চলল। কাঁধে রাইফেল ফোর-ফিফ্‌টি-ফোর হান্ড্রেড ডবল ব্যারেল। জেসমিনকে শিকারের জলপাই-রঙা পোশাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ওর হাতে একটি দো-নলা শট গান, ডবল-ব্যারেল চার্চিল। বেকার সাহেব ঘুমের সময় যা একটু বিরতি দিয়েছিলেন, ঘুম থেকে উঠেই আবার বিয়ার খেতে শুরু করেছেন। সারা পথ খেতে খেতে এসেছেন। এবং দেখলাম ট্রাউজারের পেছনের দুটো পকেটে (থলি বিশেষ) দুটি আমেরিকান বিয়ার ক্যান উঁকি মারছে। মনে মনে প্রমাদ গুনছিলাম। হাতে রাইফেল নিয়ে এই রকম বিয়ার-মত্ত অবস্থায় বাঘের সম্মুখীন হলে বাঘ কিংবা উনি ওদের মধ্যে কেউ না মরে, মরব হয়তো আমি। রাইফেল ঘুরিয়ে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় হয়তো আমাকেই দেগে দিলেন আর কী। ওঁরও গাঁট্টা-গোঁট্টা ফোর ফিফটি ফোর হান্ড্রেড ডাবল ব্যারেল জেফরিস। মিস্টার হুইটলির হাতে থ্রি সেভেন্টি-ফাইভ হল্যান্ড-অ্যান্ড হল্যান্ড ডাবল ব্যারেল। দেখলেই মনে হয় একখানা যন্ত্রের মতো যন্ত্র। হুইটলি সাহেব সুপুরুষ। তাঁর হাতে মানিয়েছেও ভাল। মিসেস হুইটলি নিজে শিকার করেন না। শিকার দেখেন। সঙ্গে কোমরে বাঁধা একটি বত্রিশ ওয়েবলি স্কটের রিভলবার। নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্যেই।

সেগুন গাছের নীচে জিপটা রেখে আমরা ঘাসের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা সুঁড়ি পথে যখন কোয়েলের ধারে এসে পৌঁছলাম, তখন সূর্য অনেকক্ষণ উঠে গেছে। কোয়েলে সে সময় জল সামান্যই আছে। নদীটি সেখানে রীতিমতো চওড়া। মাঝে মাঝে জলের ক্ষীণধারা আর শুধু বালি।

দেখা গেল তিনটি মাচা বাঁধা হয়েছে। নদীর ধার বরাবর অর্ধচন্দ্রাকারে। জঙ্গলের ভিতর থেকে ঘাসবনে হাঁকোয়া করে আসবে হাঁকোয়াওয়ালারা নদীর দিকে, এবং বাঘ নাকি নদীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে। নদীতে পৌঁছবার আগেই শিকারিরা বাঘ দেখতে পাবেন। আর কোনও কারণে সেখানে বাঘকে মারা না গেলে, বাঘ যখন নদী পেরোবে তখন বাঘকে পরিষ্কার দেখা যাবে। এবং প্রত্যেক অতিথির কাছেই রাইফেল আছে যখন, তখন তাঁরা গুলি করার সুযোগ পাবেন। এবং বলাও যায় না, তাঁদের নিক্ষিপ্ত দু' একটি গুলি বাঘের গায়ে বিঁধেও যেতে পারে। ফিসফিস করে যশোয়ন্তকে শুধোলাম, বাঘ যে নদীতে নামবেই এমন কোনও গ্যারান্টি তো নেই। যশোয়ন্ত বলল নেহাৎ নিরুপায় না হলে বাঘ নদীতে নেমে অতখানি আড়াল-বিহীন জায়গা পেরোবার ঝুঁকি নেবে না। বরঞ্চ হয়তো রেগে 'বিটারস্' লাইনের মধ্যে দিয়ে দু' একজনকে জখম করে কিংবা মেরে, আবার জঙ্গলে ফিরে যাবে, তেমন আশঙ্কা আছে বলে আমায় বিটারদের সঙ্গে থাকতে হবে।

এমন সময় মিসেস হুইটলি একটি খুব সময়োপযোগী প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা যশোয়ন্ত, বাঘ যে আছে, তার প্রমাণ কী? এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বলা বাহুল্য, যশোয়ন্ত খুব হকচকিয়ে গেল। তারপর আমাদের নিয়ে গিয়ে নদীর বালিতে বাঘের টাটকা-পায়ের দাগ দেখাল। বোধহয় শেষরাতে কি ভোর ভোর সময় নদী পেরিয়ে এসে জঙ্গলে ঢুকেছে। বাঘের পায়ের দাগ আমি ওই প্রথম দেখলাম। প্রকাণ্ড থাবা। দেখতে বিড়ালের মতো, কিন্তু পরিধিতে অবিশ্বাস্য। বেকার সাহেব দাগ দেখে নাকি নাকি সুরে বললেন, 'মাঁই গঁড, হি ইঁজ দ্যা ড্যাঁডি অফ অল গ্র্যাঁন্ড ড্যাঁডিজ।'

ভোরের জঙ্গলে বেশ একটি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। কে কোন মাচায় বসবে তা নিয়ে ফিসফিস করা আরম্ভ হল। হঠাৎ আমাদের হাতের কাছ থেকে কতকগুলো তিতির ভর-র্-র্-র্ করে মাটি ফুঁড়ে উঠল। উঠে, উড়ে পালাল।

ঠিক হল বেকার সাহেব পশ্চিমের মাচায় নদীর কিনারায় বসবেন। মিস্টার ও মিসেস হুইটলি পুব-পশ্চিমের মধ্যে একটু উত্তর ঘেঁষে বসবেন। ওই মাচা থেকেই বাঘকে প্রথম দেখার সম্ভাবনা। ওঁরা যেহেতু প্রধান অতিথি, সেইহেতু বেকার সাহেব কিছুতেই ও মাচায় বসতে রাজি হলেন না। তা ছাড়া তিনি বসলেও কত যে বাঘ মারবেন সে আমি জানি। মাচায় উঠেই হয়তো ঘুম লাগাবেন; সব সময় বিয়ার খেয়ে খেয়ে চোখ-মুখের যা অবস্থা হয়েছে, তা আর কহতব্য নয়।

পুবের মাচায় আমি আর জেসমিন বসব। যশোয়ন্ত বলল, সেদিক দিয়ে নাকি বাঘের আসবার সম্ভাবনা খুব কম। কী করে যশোয়ন্ত এমন জ্যোতিষশাস্ত্র আয়ত্ত করেছে জানি না। কিন্তু তার জ্যোতিষীতে মোটে ভরসা পেলাম না। বাঘ তো ট্রাফিক পুলিশের উত্তোলিত হাত মানবে না; যেখানে খুশি সেখানে চলে আসবে। এসব জানোয়ারের কাছ থেকে যত দূরে দূরে থাকা যায় ততই ভাল। জেসমিনকে এবং আমাকে প্রথমত ইচ্ছে করে এক মাচায় বসিয়ে, পরে রগড় করবার অভিপ্রায়; এবং দ্বিতীয়ত বাঘকে কোনক্রমে আমাদের দিকে এনে ফেলে আমার চরম দুর্গতি সাধনের ইচ্ছা যশোয়ন্তের অত্যন্ত প্রবল বলে মনে হল। কিন্তু ওর উপর কথা বলে কার সাধ্যি। স্যান্ডারসন কোম্পানির বড় সাহেব পর্যন্ত ওর আদেশের ওপর 'রা' কাড়ছেন না—আর আমি তো কোন ছার।

ভগবানের নাম স্মরণ করে অতিকষ্টে মাচায় উঠলাম। লতা দিয়ে কয়েকটা ডাল বেঁধে সিঁড়ি তৈরি করেছে। তাও জেসমিন ওঠবার সময়েই দুটো লতা পটাং পটাং করে ছিঁড়ে

গেল। চাকরি বজায় রাখতে এই পোড়া দেশে যে মালিকের সঙ্গে বাঘ শিকারেও বেরোতে হয়, তা কোনওদিন ভাবতে পারিনি। আজ দেখলাম সবই সম্ভব।

যাই হোক, হাতে এবার নতুন বন্দুক। মাঝে মাঝে সেন্ট-মাখানো রুমাল বের করে নলটা মুছছি। যশোয়ন্ত বলেছে, বন্দুকের যত্ন আত্তির কোন ত্রূটি না হয়। নতুন স্ত্রীকেও আমার এই রাইফেলের মতো কেউ ঘন ঘন রুমাল দিয়ে মুছবে বলে মনে হয় না।

যশোয়ন্ত টাবড়দের সঙ্গে ওই শুঁড়িপথ ধরে জঙ্গলের গভীরে চলে গেছে! হাঁকোয়াওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে ও আসবে। মনে মনে যশোয়ন্তের ওপর ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে! বড় পেছনে লাগে এই যা।

ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম, ভয় পাবার মতো কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না। আমি আছি। নতুন বন্দুকও। তাছাড়া সঙ্গে মেমসাহেব শিকারি আছেন, হাতে তিন-হাজারী বন্দুক নিয়ে। তবে, শেষে একজন নারী আমার প্রাণরক্ষয়িত্রী হবে, এই ভাবনাটা বেশ কাবু করে ফেলেছে। গলাটা খাঁকরে নিয়ে ফিস-ফিস করে বললাম,—আপনি এর আগে কী কী জানোয়ার মেরেছেন?

আমি? জেসমিন খুব অবাক এবং কিঞ্চিৎ ভীত হল। কোনও উত্তর না দিয়ে আমতা আমতা করে পকেট হাতড়ে চকোলেট বার করে বলল—নিন, চকোলেট খান। তারপর চকোলেট চিবোতে চিবোতে বলল, একটি মাত্র জানোয়ার এ পর্যন্ত মেরেছি। কুকুর। পোষা কুকুর; পাগলা হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া মানে...আর কিছু...

সে কথা শুনে বুকের মধ্যে যে কী করতে লাগল, তা কী বলব!

এমন সময় অত্যন্ত অবিবেচক এবং নিষ্ঠুরের মতো জেসমিন আমাকে শুধলো, আপনি কী কী মেরেছেন? বাঘ-টাঘ নিশ্চয় মেরেছেন প্রচুর?

চকোলেট চিবুতে চিবুতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বুদ্ধিমত্তা দেখিয়ে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ প্রচুর। যশোয়ন্ত আর আমি তো একসঙ্গেই শিকার-টিকার করি।

জেস্‌মিন চকোলেট গিলে ফেলে বলল, বাঁচালেন। সত্যি কথা বলছি, আমার এতক্ষণ বেশ ভয় ভয় করছিল। আপনি আছেন, ভয়ের কী! কি বলুন?

আমার কি তখন বলবার অবস্থা? তবু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললাম, আরে ভয়ের কী? আমি তো আছি।

'ছুলোয়া' শুরু হয়ে গেল। বহুদূর থেকে গাছের গায়ে কাঠ-ঠোকার আওয়াজ। মনুষ্য মুখ-নিঃসৃত বিভিন্ন ও বিচিত্র অশ্রুতপূর্ব সব আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে সেই সম্মিলিত ঐকতান এগিয়ে আসতে লাগল; উত্তেজনা বাড়তে থাকল, হাতের চেটো উত্তরোত্তর ঘামতে লাগল। ঘন ঘন রুমালে হাত মুছে নিতে থাকলাম। গলাটা শুকিয়ে আসতে লাগল।

এমন সময় আমাদের ঠিক সামনেই ঘাসের মধ্যে ভীষণ একটি আলোড়ন হল। তখন জেসমিন আর আমি উৎকর্ণ উন্মুখ এবং যাবতীয়—উঃ—। হঠাৎ আমাদের হকচকিয়ে প্রকাণ্ড ডালপালা সংবলিত শিং নিয়ে একটি অতিকায় মানে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কালের শম্বর সামনে বেরিয়ে এল। তারপর প্রায় রোরুদ্যমান দু'জন বীর শিকারিকে বৃক্ষারূঢ় দেখতে পেয়েই গাঁক গাঁক আওয়াজ করে হাসতে হাসতে নদী পেরিয়ে চলে গেল ওপারে। লক্ষ করলাম, জেসমিনের বন্দুক পাশে শোয়ানো, কপালে এবং কপোলে

স্বেদবিন্দু মুক্তোর মতো ফুটে উঠেছে। আর চাঁপার কলির মতো বাঁ হাতের পাতাটি আমার হাঁটুর ওপর অত্যন্ত করুণভাবে শোভা পাচ্ছে।

জেসমিন আমার দিকে ফিরে বলল, গুলি করলেন না কেন?

আমি ধমকের সুরে বললাম, মাথা খারাপ! মারলে তো এক গুলিতেই ভূতলশায়ী করতে পারতাম, কিন্তু আমরা তো বাঘের অপেক্ষায় আছি। এখন গুলি করব কী করে?

কথাটা যশোয়ন্তের কাছে শোনা ছিল যে, বাঘের শিকারে অন্য জানোয়ারের ওপর খামোকা গুলি করতে নেই।

জেসমিন হেসে বলল, তাই বলুন, আমি ভাবলাম কী হল, মারলেন না কেন?

মনে মনে বললাম, মারব ওই জানোয়ারকে! বাঘের মতো দাঁত নেই বটে, কিন্তু শিং তো আছে। আর সেই ভয়ঙ্কর পা। অন্য কিছু না করে পেছনের পায়ে একটি লাথি মেরে দিলেই তো সব শেষ।

সাঁই সাঁই ফর ফর করতে করতে একদল ময়ূর আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। অত বড় শরীর নিয়ে যে অমন উড়তে পারে, তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না। উড়ে গিয়ে কোয়েল নদীর ওপারে পৌঁছেই কতগুলো নাম-না-জানা গাছে বসে কেঁয়া কেঁয়া করে ডাকতে লাগল। সমস্ত জঙ্গল যেন সেই ডাকে জেগে উঠল।

এদিকে হাঁকোয়াওয়ালারা আরও কাছে এসে পড়েছে। তাদের চিত্তচাঞ্চল্যকর চিৎকারে মাথা ঠিক রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যান্য মাচাগুলো দেখা যাচ্ছে না আমাদের জায়গা থেকে। ওরাও নিশ্চয় আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। বিটাররা আরও কাছে এসে পড়েছে—আরও কাছে—এখন মাথার মধ্যে হাতুড়ির আঘাতের মতো সেই নিস্তব্ধ বনে বিচিত্র সব আওয়াজ এসে লাগছে।

এমন সময় পাহাড়-বন কাঁপানো একটি গুড়ুম আওয়াজ কানে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে মেদিনী-কাঁপানো বজ্রনিনাদী চিৎকার। বাঘের আওয়াজ! বোধ হয় গায়ে গুলি লেগেছে। পরক্ষণেই মনে হল প্রলয় কাল উপস্থিত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি লাল-কালোয় মেশানো উল্কাবিশেষ একটি 'স্প্রিং'-এর মতো লাফাতে লাফাতে জঙ্গলের পাতা মচমচিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মনে হল, অজ্ঞান হয়ে যাব। জেসমিন আমার গায়ে ঢলে পড়ল। মাচাটা থরথর করে কাঁপছে। ভগবান রক্ষা করলেন। বাঘটা কী মনে করে আমাদের থেকে পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে থাকাকালীনই দিক পরিবর্তন করে পশ্চিমমুখো ছুটল কিছুক্ষণ। তারপর নদীতে। নদীর সাদা বালি, নীল জল আর সকালের রোদে লাফাতে লাফাতে, জলবিন্দু ছিটোতে ছিটোতে, ঝাঁপাতে ঝাঁপাতে, লাল-কালো বাঘটা নদী পেরোতে লাগল।

ওপারের ময়ূরগুলো নতুন করে চেঁচিয়ে উঠল। কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া...। এমন সময় কোন দৃশ্য জায়গা থেকে জানি না, মেঘনাদের বাণের মতো সশব্দে একটি গুলি এসে বাঘটিকে ভূতলশায়ী করল। কিছুক্ষণ থরথর করে কাঁপল বালির ওপর, জলের ওপর। তারপর স্থির হয়ে গেল।

ততক্ষণে হাঁকোয়াওয়ালারা এসে পড়েছে প্রায় আমাদের কাছে।

সম্বিত ফিরে পেতে দেখলাম জেসমিন আমার গায়ে মাথা এলিয়ে তখনও মূর্ছিতার মতো পড়ে আছে। আর মাচার নীচেই দাঁড়িয়ে বাঘের চেয়েও ভয়াবহ যশোয়ন্ত।

জেসমিনকে দুবার নাম ধরে ডাকতেই স্বপ্নোত্থিতার মতো মাথা তুলে লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হয়ে একটু হেসে বলল, Oh, I am most awfully sorry.

যশোয়ন্ত দূরে গেছে কি না ভাল করে দেখে নিয়ে, আমি মরুব্বি শিকারির মতো বললাম, আরে তাতে কী হয়েছে—প্রথম প্রথম সকলেরই অমন হয়।

জেসমিন বলল, কী আশ্চর্য। বাঘটা আমাদের মোটেই দেখতে পায়নি। অথচ আমি কী ভয়ই না পেলাম।

আমি বললাম, তাতে কী হয়েছে, আমরা তো দেখেছি বাঘকে। বাঘ আমাদের নাই বা দেখল।

মেঘনাদের বাণের মতো অদৃশ্য বাণটি যে কে ছুঁড়লেন, তা বোঝা গেল না।

বাঘটিকে ঘিরে নদীর মধ্যে বিটাররা দাঁড়িয়ে আছে। উল্লাসে চেঁচাচ্ছে। হুইটলি সাহেব বেজায় খুশি। এই সময় একটি 'ইনক্রিমেন্টের' কথা বলে ফেললে হয়। যাকগে থাক। প্রকাণ্ড বাঘ।

যশোয়ন্ত বলল, বাংলোয় ফিরে মাপজোক করা হবে। তবে মনে হচ্ছে ন' ফিটের ওপর হবে।

জানা গেল, বেকার সাহেব বিয়ার খেয়ে 'ব্যোম' হয়ে ঘুমুচ্ছিলেন মাচার উপরে। হঠাৎ হুইটলি সাহেবের গুলির আওয়াজে এবং বাঘের চিৎকারে ঘুম ভেঙে উঠে দেখেন নদীতে একটি বাঘ লঙজাম্প প্র্যাকটিশ করছে। অমনি রাইফেল ঘুরিয়ে দেগে দিলেন। একদম। আর দেখতে হল না। টাবড়ের ভাষায়, গোলি অন্দর, জান বাহার। যাই করুন না কেন, যশোয়ন্ত বলছিল, বেকার সাহেব সত্যিই ভাল শিকারি। উল্টোমুখে মাচা বাঁধা, ঘুমুচ্ছিলেন; তবু ঘুম থেকে উঠে শরীর ঘুরিয়ে মাচার পেছন থেকে হঠাৎ গুলি করে গতিমান বাঘকে ভূতলশায়ী করা সোজা কথা নয়।

বেকার সাহেব একটি পাথরের উপর বসে, ট্রাউজারের হিপ পকেট থেকে একটি বিয়ার ক্যান নিজে নিলেন, অন্যটা যশোয়ন্তকে বাড়িয়ে দিলেন। বুঝলাম, সকলেরই বিস্তর আনন্দ হয়েছে বাঘ মারা পড়েছে বলে। আমারও আনন্দ হয়েছে কম নয়; বাঘ আমাদের মারেনি বলে।

হাঁকোয়াওয়ালারা যশোয়ন্তের নির্দেশে দুটি ডাল কেটে আনল। তারপর দড়ি দিয়ে, লতা দিয়ে বাঘের চার-পায়ের সঙ্গে সেই দুটি ডাল লম্বালম্বি করে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল জিপ অবধি। তারপর তাকে জিপের বনেটের উপর পাথালি করে শুইয়ে দেওয়া হল এবং বনেট-ক্লিপের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল। মিসেস হুইটলির সিনে-ক্যামেরা চলতে লাগল অবিরাম: কি-র্-র্-র্-র্—কু-র্-র্-র্-র্।

চামড়া ছাড়ানো আরম্ভ হতে হতে সেই বিকেল। দেখতে দেখতে রাত নেমে এল। 'জ্যাকারান্ডা' গাছের ডালে বড় বড় 'হ্যাজাক' ঝুলিয়ে চামড়া ছাড়ানো হচ্ছে। বাঘটাকে চিৎ করে শোয়ানো হয়েছে। চারটে পা চারদিক দিয়ে বেঁধে টানা দেওয়া হয়েছে। গলা থেকে আরম্ভ করে বুক ও পেটের মাঝ বরাবর চামড়া কাটা হয়েছে। তারপর সাবধানে চামড়া ছাড়ানো হচ্ছে।

কর্ম এটাও একটি আর্ট। যে সে লোকের নয়। গুলিটা যেখানে লেগেছে, ঘাড়ে—
কর্ম এটাও একটি আর্ট। যে সে লোকের নয়। গুলিটা যেখানে লেগেছে, ঘাড়ে—
সেখানে একটি গাঢ় কালচে লাল ক্ষত। চারপাশে অনেকখানি জায়গাও অমনি কালচে

লাল এবং নীলাভ। বাঘের গায়ে মাংস বলে কিছুই নেই। সব পেশী। দড়ির মতো ফিকে লাল পাকানো-পাকানো পেশী; তার উপর বেশি। মেদ বলে যা আছে, তা সামান্য। পেটের কাছে বেশি এবং সারা শরীরেই যা আছে, তা একটি পাতলা আস্তরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাঘের সামনের পায়ের কিংবা হাতের পেশী দেখবার মতো। চামড়া না ছাড়ালে কোনও অনুমান করাই সম্ভব হত না যে সেই হাত দু'খানি কতখানি শক্তির অধিকারী। চোয়ালের পেশীও দেখবার মতো। চলমান বাঘ তাই যখন সুন্দর চামড়া-মোড়া চেহারায় হেলে-দুলে চলে, তখন কেউ তাকে দেখলে বুঝতে পারবে না যে, বিনা আয়াসে মুহূর্তের মধ্যে সে কী সংহার মূর্তি ধারণ করতে পারে।

বন্দুকটা সবে হাতে পেয়েছি। বনে পাহাড়ে বাহাদুরি করার আগে এই চামড়া ছাড়ানো বাঘের আসল চেহারাটা দেখার আমার প্রয়োজন ছিল, ভাবলাম আমি।

চারদিকে এখন ভিড়। কেউ বলছে বাঘের চর্বি চাই, তেল করবে, বাড়িতে বুড়ি মা আছে, বাত হয়েছে, বাত নাকি বাঘের চর্বির তেল ছাড়া সারবে না। আবার কেউ বলছে বাঘ-নখ চাই। বউয়ের গলার হার বানিয়ে দেবে।

গোঁফগুলো তো নেই-ই। কখন যে হাতে হাতে লোপাট হয়ে গেছে, তার পাত্তা নেই।

যে কারণে আসা, সেই বাঘই যখন মারা পড়ে গেল, তখন বোধ করি, এই জঙ্গলে পড়ে থাকতে সাহেবদের কারও আর ইচ্ছা রইল না। তবু জেসমিন আর মিসেস হুইটলির খুব ইচ্ছা ছিল আরও দিন-তিনেক থেকে যাবার। শুক্লপক্ষ বলেই ওঁদের উৎসাহটা বেশি। কিন্তু হুইটলি সাহেব বললেন, অনেক কাজ আছে কলকাতায়। অতএব পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে মালিক-মালকিনরা রাঁচির দিকে রওনা হয়ে গেলেন গাড়িতে। অনেক হ্যান্ডশেক হল; অনেক থ্যাংক য়্যু, অনেক বাই-বাই-ও। তারপর লাল ধুলো উড়িয়ে গাড়ি ছুটল। উধাও।

স্বস্তির নিঃশ্বাস এবার। হাত পা ছড়িয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসলাম।

যশোয়ন্ত বলল, সাবাস দোস্ত। গুরু গুড়: চেলা চিনি। তুমি যে আমাকেও টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাবে হে। তোমার প্রমোশন ঠেকায় কোন শালা!



ছয়

জুন মাস এসে গেল। পনেরোই জুন নাগাদ কাজ বন্ধ হবে জঙ্গলের। তারপর বৃষ্টি নামবে। কোয়েল, আমানত, ঔরঙ্গা, কান্‌হার তখন সকলেই সংহার মূর্তি ধারণ করবে। পথঘাট অগম্য হবে। অতএব কাজ আবার আরম্ভ হতে হতে সেই সেপ্টেম্বর। অতএব এই ক' মাস ছুটি বলা চলতে পারে। অবশ্য স্টেশান থেকে ওয়াগনে মাল পাচার হবে। জঙ্গলেই শুধু কাজ বন্ধ থাকবে। তখন বাঁশ-কাঠের ঠিকাদারদের কলকাতায় কি মুঙ্গেরে কি পাটনায় গিয়ে বাবুয়ানী করার সময়। এই সময়টা এখানে কেউই পড়ে থাকে না। বরসাত হচ্ছে রইস ঠিকাদারদের ওড়বার সময়। তাঁরা তখন গেরোবাজ পায়রার মতো ওড়েন।

যশোয়ন্তের বিহার গভর্নমেন্টের চাকরি। ও ইচ্ছা করলে ওই সময়টা ছুটি নিতে পারে। কিন্তু ও আমাকে বলল, কোথায় যাবে? থেকে যাও। বর্ষাকালে ঘন জঙ্গলের আরেক চেহারা। একেবারে লা জবাব।

বললাম, আমার অবশ্য যাওয়ার কোনও জায়গাও নেই।

যশোয়ন্ত বলল, থেকে যাও, থেকে যাও।

মাঝে মাঝে চুপ করে বসে ভাবি, পালামৌ সম্বন্ধে অনেক জানবার শুনবার আছে। এ যেন ইতিহাস নয়, এ এক জীবন্ত বর্তমান, বেড়াতে বেড়াতে যেন পিছিয়ে পড়েছে। টাবড় মুনশি অনেক কিছু জানে। বসে বসে ওর গল্প শুনি।

বহু জায়গা থেকে আদিবাসীরা এসে এই পর্বতময় নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বসবাস আরম্ভ করে। খাঁরওয়ারেরা আসে, ওঁরাওরা আসে, চেরোরা আসে। রুমান্ডি পাহাড়ের নীচে যে বস্তি 'সুহাগী', সেটি ওঁরাওদের বস্তি। আমার টাবড় মুনশিও জাতে ওঁরাও। বহুদিন আগে খাঁরওয়ারেরা রোটাসগড়ের শাসক ছিল। রোটাসগড় শাহাবাদের দক্ষিণে সেই উঁচু মালভূমি, যেখান থেকে দাঁড়িয়ে শোন নদের সর্পিল পথরেখা চোখে পড়ে। সেই মালভূমিতে মস্ত দুর্গ ওদের। বিরাট দুর্গ। অনেক লড়াই করেছে তারা সেখান থেকে। সে জায়গা ছেড়ে, এগারো থেকে বারো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওরা এসে এই জায়গায় বসবাস আরম্ভ করে।

ওঁরাওরা দাবি করে যে, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা নাকি রোটাসগড়ে শিকড় গেড়েছিলেন। কিন্তু ওদের আদি নিবাস কর্ণাটকে, সেখান থেকে নর্মদা নদ বেয়ে উঠে আসে ওরা। তারপর শোন নদের পারে, বিহারে নতুন ঘর বাঁধে। এরাও বলে রোটাসগড়ে এদেরও জবরদস্ত দুর্গ ছিল একটি। কিন্তু এক উৎসব-রাত্রে যখন প্রচণ্ড আনন্দোল্লাসের পর পুরুষেরা পানোন্মত্ত নেশায় অজ্ঞান হয়ে ঘুমুতে থাকে—তখন শত্রুপক্ষ এসে ওদের দুর্গ

আক্রমণ করে। একজন পুরুষেরও নাকি তখন যুদ্ধ করার মতো অবস্থা নয়। কেবল মেয়েরাই প্রবল বিক্রমে লড়াই চালায়। এবং পরাজিত হয়।

সেই যুদ্ধে হেরে দুর্গ পরিত্যাগ করে ওঁরাওরা দু'দলে ভাগ হয়ে রোটাসগড় থেকে পালায়। এক দল চলে যায় রাজমহল পাহাড়ের দিকে, অন্যদল পুবে ঘুরে কোয়েল নদী বরাবর এগিয়ে এসে ছোটনাগপুর মালভূমির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এসে আস্তানা গেড়ে বসে।

খাঁরওয়ার ও ওঁরাও ছাড়া চেরোরাও এমনই একটা গল্প বলে।

গল্পগুলো নাকি সত্যি। যশোয়ন্ত বলছিল এই জেলার নথিপত্রে এসব কথার সত্য নির্ধারিত হয়েছে।

যশোয়ন্ত একদিন 'পালাম্মুঁ' নামের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিল।

পালামৌ নামটার আসল উচ্চারণ 'পালাম্মুঁ'। আসলে এ নামটির ব্যুৎপত্তি একটি দ্রাবিড় শব্দ থেকে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, খুব সম্ভব 'পালাম্মুঁ' পাল্ আম্ম্ উঁ এই দ্রাবিড় শব্দ ক'টির বিকৃতি। পাল্ মানে দাঁত। আম্ম্ মানে জল এবং উঁ হল বিশিষ্ট বিশেষের বিশেষণ, যথা—গ্রাম, দেশ, জঙ্গল। ঐতিহাসিকদের এই অনুমান একেবারে হাওয়ায় ওড়া নয়। আদিবাসী চেরো প্রধানরা যে-গ্রামে থাকতেন, সে গ্রামের নাম ছিল পালাম্মুঁ। সেই গ্রামেই তাঁদের বহু সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। এই দুর্গবহুল দুর্গম গ্রামের ঠিক নিচ দিয়েই ঔরঙ্গা নদী বয়ে যেত। সেখান থেকে বসে বসে ঔরঙ্গা দেখা যেত। ওই গ্রামের প্রায় কয়েক মাইল ভাঁটিতে এবং উজানে ঔরঙ্গা নদীর কোল, বড় বড় কালো কালো পাথরে ভরা ছিল। বর্ষাকালে যখন নদীতে বান আসত, তখন পাথরগুলো সব দাঁতের মতো উঁচু হয়ে থাকত। তাই নদীর নাম হয়েছিল দাঁত-বের-করা নদী অথবা 'পালাম্মুঁ'। সেই থেকে জায়গার নামও তাই।

এসব জানতে শুনতে বেশ লাগে। অতি গরিব, সরল হাসিখুশি কুচকুচে কালো ওঁরাও যুবক-যুবতী। ওরা যেন ইতিহাসের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমাকে কোন দূরে হাতছানি দেয়। ইতিহাস যেন একটি কলরোলা নদী। কোয়েলের মতো। আজ থেকে ন-শো বছর আগে যখন ওরা শ্বেত মোরগ নিবেদন করে ধার্মেসের পুজো দিয়ে এই পালামৌতে এসে প্রথম বাসা বেঁধেছিল সেদিন আর আজকের মধ্যে, যেন বেশি ফাঁক নেই। ইতিহাসের নদী বেয়েই যেন ওরা চলেছে। চলেছে-চলেছে-চলেছেই।

রুমান্ডি পাহাড়ের নীচে যে সুহাগী নদী, সেও গিয়ে মিশেছে কোয়েলে। সুহাগীকে অবশ্য নদী বলা ঠিক নয়—পাহাড়ি ঝোরা বলা ভাল। পালামৌতে একমেবোদ্বিতীয়ম হচ্ছে কোয়েল।

ঔরঙ্গা, আমানত, কানহার এবং অন্যান্য সবাই গিয়ে মিশেছে কোয়েলে। এই সব কটি নদীই অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সাঙ্ঘাতিক। শুধু যে বর্ষাকালে চকিতে বান আসে তাই নয়, এদের তটরেখায় ও তীরে কোথায় যে চোরাবালি আছে এবং কোথায় যে নেই, তা কেউ জানে না।

আরও কত কিছুর গল্প করত টাবড়। বাইরে হয়তো টিপ-টিপিয়ে বৃষ্টি পড়ত। ঘনান্ধকার বন পাহাড় থেকে কেয়া ফুলের গন্ধবাহী হাওয়া এসে নাকে লাগত। অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকিয়ে কেঁদে উঠত নীল জঙ্গলের ময়ূর: কেঁয়া-কেঁয়া। মনটা যেন কেমন উদাস লাগত। যা যা চেয়েছিলাম এবং যা যা পাইনি সেই সব চাওয়া-পাওয়ার দুঃখগুলো

একসঙ্গে পুবের কালো মেঘের মতো মনের আকাশে ভিড় করে আসত। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, নিজেকে অত্যন্ত একলা এবং অসহায় মনে হত। মনে হত, এই বন-পাহাড়ের নির্জনতা, এর সুন্দর সত্তার মাঝে আনন্দ যেমন আছে, তেমন আছে দুঃখও। সে দুঃখটা বুনো জানোয়ারের ভয়জাত নয়। তা নিজেকে হারানোর।

হাজার হাজার বছর ধরে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে বিপরীতমুখী ছুটে, তার সঙ্গে লড়াই করে যে পার্থক্য অর্জন করেছি, তার গালভরা নাম দিয়েছি সভ্যতা। ওইসব নির্জন নিরালা মুহূর্তে আমার মনে হত, এই সভ্যতার সত্যিকারের আবরণটি এখনও যথেষ্ট পুরু হয়নি এই এত বছরেও। প্রকৃতির মধ্যে এলেই ঠুনকো আবরণটি খসে যেতে চায়। তখন বোধহয় ভিতরের নগ্ন প্রাকৃত ও সত্যি আমি বেরিয়ে পড়ে—যে সত্য রূপকে আমরা ভয় পাই।

মেলা বসেছে মহুয়াডাঁরে। মে মাসের শেষ থেকে মেলা চলবে সেই জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে লোক যাচ্ছে—নানা জিনিস কিনে আনছে। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের কলকাকলিতে জঙ্গল-পাহাড়ের পথ মুখর হয়ে উঠেছে। এখানকার এরা হাসতেও জানে। কেবল মহুয়া আর বাজরার ছাতু খেয়ে থেকেও যে ওরা কী করে এত হাসে জানি না। সব সময় হি-হি-হা-হা করছে। কথাবার্তা বললেই বোঝা যায় যে ওরা খুব রসিক। সবচেয়ে আমার যা ভাল লাগে, তা ওদের সরলতা । ভণ্ডামি বলে কোনও শব্দ বোধ হয় ওঁরাওরা জানে না। হেসেই জীবনটাকে উড়িয়ে দিতে যেন শিখেছে বংশ-পরম্পরায়।

আগামীকাল ওদের জেঠ-শিকারি বা মৌসুমী শিকারের দিন। এই শিকার একটি সামাজিক উৎসব। আগে একদিন ছিল, যখন শিকারটাই ওঁরাওদের প্রধান জীবিকা ছিল। আজ আর তা নেই। ওরা খেতি করে, কূপ কাটে, কেউ কেউ বা দূরে শহরে গিয়ে অন্যান্য নানাভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ওদের পোশাক-আশাক এবং সামাজিক বাঁধনটাও ঢিলে হয়ে গেছে। শহর-প্রত্যাগত কালো জিন্‌সের ইস্ত্রী-বিহীন ট্রাউজার আর তার উপরে ঘন লাল-রঙা শার্ট এবং হাতে ঘোরতর বেগুনি রুমাল-নেওয়া ওঁরাও যুবকও আজকাল এই জঙ্গুলে পাহাড়েও চোখে পড়ে। তবে পুরনো জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধ এখনও পুরোপুরি ধুয়ে মুছে যায়নি।

শিকারে যাবার নেমন্তন্ন আমারও ছিল। টাবড় মুনশি এসেছিল, সঙ্গে মুনশির বড় ছেলে আশোয়াও এসেছিল। কিন্তু যশোয়ন্ত এখানে নেই। ডাল্টনগঞ্জে গেছে। নইহারে থাকলেও একটা খবর পাঠানো যেত। অতএব ওদের সবিনয়ে 'না' করে দিলাম।

লক্ষণটাও খুব খারাপ মনে হচ্ছে। দিনে দিনে যশোয়ন্তের সান্নিধ্য একটি সাঙ্ঘাতিক নেশার মতো আমাকে পেয়ে বসেছে। আমার কল্পনা-রঙিন আরামপ্রিয়তার জগৎ থেকে বাইরের জগতে দূরত্ব-সূচক একটি পা ফেলতে গেলেও যশোয়ন্তের হাত ধরতে ইচ্ছা করে। ওর কর্কশ, চিৎকৃত, বেপরোয়া সঙ্গ, আমি আজকাল আমার প্রেমিকার শরীরের মতোই কামনা করি।

সন্ধ্যাবেলা টাবড়দের দলবল ফিরল শিকার থেকে। তীর ধনুক টাঙ্গি নিয়ে। বলল, একটি বড়কা দাঁতাল শুয়োর, একটি কোটরা এবং একটি শম্বর শিকার করেছে ওরা।

ওদের মধ্যে কেউ কেউ মাংস রোদে শুকিয়ে রেখে দেবে। তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে যখন বীজ ছড়াবে ক্ষেতে, সেই ধান কিংবা বাজরা কি মাড়ুয়ার সঙ্গে মাংস দেবে মিশিয়ে। ওদের বিশ্বাস, তাতে ফসল ভাল হবে। শিকার জিনিসটাকে ওরা নিছক

শখ বলে জানেনি, তার সাফল্য-অসাফল্যের উপর ওদের কৃষির সাফল্য-অসাফল্য নির্ভরশীল; এ কথা ওঁরাও চাষী আজও বিশ্বাস করে।

বেশ লাগে এই টাবড়দের। টাবড় আমাকে অনেকখানি হরিণের মাংস দিয়ে গেল শালপাতায় মুড়িয়ে। মেটে মেটে দেখতে। বলল, শম্বর খেতে ভাল না, আর শুয়োর হয়তো আপনি খাবেন না, তাই হরিণ দিয়ে গেলাম, জুম্মান রাঁধতে জানে। ভাল করে রেঁধে দেবে।

সেদিন বিকেলের দিকে মেঘ করে এল। সমস্ত পুব-দক্ষিণ এবং দক্ষিণের জঙ্গল পাহাড় সব নতুন করে চোখে ধরা পড়ল।

হঠাৎ মনে হল এদের চিনতাম না। মোটে চিনি না। কালচে আর নীলাভ মেঘে সমস্ত দিকচক্রবাল ভরে গেছে। আকাশ যে কোনও দিন সাদা কি নীল ছিল এখন তা দেখে চেনার উপায় নেই। সেই কালো পটভূমিতে গাছ-গাছালি এবং পাহাড়ের নিজস্ব রঙ বদলে গিয়ে তাদের অন্য রঙের বলে মনে হচ্ছে। যে দিকের জঙ্গলের কোনও নিজস্ব রঙের বাহার ছিল না; দিনের বেলায় যাদের পাটকিলে, ফ্যাকাশে বলে মনে হত, তাদেরও রূপ খুলে গেছে।

নইহারের পথে নয়াতালাও থেকে উড়ে-আসা একঝাঁক কুন্দশুভ্র বক মালার মতো সেই কালো আকাশে দুলতে দুলতে উড়ে চলেছে বুড়হা-করমের দিকে। কতগুলি শকুন, যারা চাহাল চুঙ্রুর দিকের মাথা পাহাড়টার নীচের ঘন উপত্যকার উপরে বাঘে-মারা কোনও জানোয়ারের মড়ি লক্ষ করে এতক্ষণ চক্রাকারে উড়ছিল, তারাও অনেক-অনেক উপরে উঠে গেছে। মনে হচ্ছে, ওরা বৃষ্টিকে পথ দেখিয়ে আমাদের রুমান্ডি পাহাড়ে আর সুহাগী নদীতে আনবে বলে মেঘ ফুঁড়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করছে।

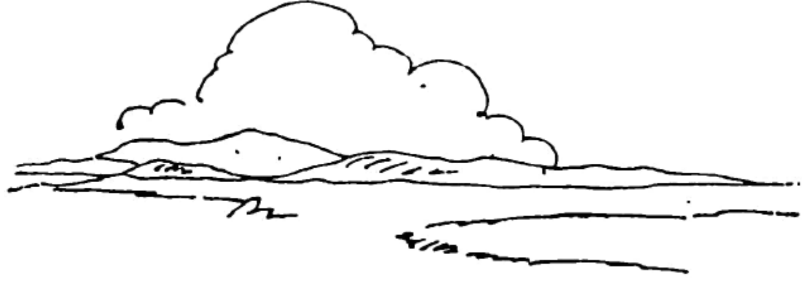
ঝাঁকে ঝাঁকে হরিয়াল, রাজঘুঘু, টিয়া, টুঁই মাথার উপর দিয়ে চঞ্চল পাখনায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে। সুহাগী গ্রামে আসন্ন বৃষ্টির আগমন শব্দগুলো ঝুম ঝুম করে বাজতে শুরু করেছে। আর এই সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে দূর জঙ্গল থেকে ময়ূরের কেঁয়া-কেঁয়া রব এই আদিগন্ত বন পাহাড়ের বুকের, কেয়া ফুলের গন্ধবাহী বর্ষা বরণের আনন্দে অধীর একটিমাত্র সুর হয়ে, ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসছে।

কবে যেন শুনেছিলাম, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া। এখন মনে হচ্ছে, সেই গানটি মেঘ হয়ে, সুহাগী নদীর সোহাগ হয়ে ধীরে ধীরে এই বর্ষা-বিধুর সান্ধ্য প্রকৃতিতে করুণ হয়ে বাজছে।

পৃথিবীতে যে এত ভাললাগা আছে, তা এই রুমান্ডি পাহাড়ে এই গোধূলির মেঘে ঢাকা আলোয় উপস্থিত না থাকলে জানতাম না। প্রকৃতিকে ভালবাসার মতো ব্যথানীল অনুভূতি যে আর নেই, তাও জানতাম না।

এসে গেল—এসে গেল, রুম-ঝুম রুম-ঝুম করে ঘুঙুর পায়ে, সাদা বুটি বসানো নীল ঘাঘরা উড়িয়ে শিলাবৃষ্টি এসে গেল। বর্ষারাণী এসে গেল।

বনের রঙ জলের রঙ মেঘের রঙ সন্ধ্যার রঙ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে চতুর্দিকে নরম সবুজে হলুদে সাদায় এমন একটি অস্পষ্ট ছবির সৃষ্টি হল, আমার বড় সাধ হল যে আবার আমার মায়ের গর্ভে ফিরে গিয়ে নতুন করে জন্মাই। নতুন করে ছোটবেলা থেকে এই রুমান্ডিতে একটি ওঁরাও ছেলের মতো বাঁশি বাজিয়ে বড় হবার অভিজ্ঞতা, বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা, মোষের পিঠে চড়ে তিল তিল করে নতুন করে উপভোগ করি।



সাত

সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হওয়া গেল।

বাঁয়ে, দূরে মেঘ মেঘ নেতারহাটের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মেঘলা আকাশে একটি মেঘস্তম্ভের মতো। প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক চলার পর যশোয়ন্ত জিপ থামাল কুরুয়া বলে একটি ছোট গ্রামে। ওঁরাওদের গ্রাম। বেশি হলে পনেরো-কুড়ি ঘর লোকের বাস। এই গ্রামের মোড়লদের বাড়ির গোয়ালঘরে জিপটা ট্রেলার শুদ্ধু ঢুকিয়ে দিল যশোয়ন্ত।

জনাচারেক লোক তৈরি ছিল, তারা শিরিণবুরু থেকে এসেছে আমাদের নিয়ে যেতে। সবচেয়ে মজা লাগল একটি ছোট সুখে-ভরপুর ডুলি দেখে, এই ডুলিতে বৌদি যাবেন।

সুমিতা বৌদি ডুলি দেখেই তো খিল্‌খিল্ করে হাসতে লাগলেন। বললেন, মরে গেলেও এতে চড়তে পারব না। তোমাদের সঙ্গে হেঁটেই যাব। যশোয়ন্ত বলল, আপনি পাগল নাকি? এক মাইল পথ, সবটাই প্রায় চড়াই, হেঁটে যাওয়া সোজা কথা!

বন্দুক আর রাইফেল আমি নিজেই হাতে নিলাম। অন্য লোকের হাতে দেওয়ার জিনিস নয় এগুলো। তাছাড়া গুরু আমার সঙ্গে আছে। বন্দুকের অযত্ন করি, সাধ্য কী?

পাকদণ্ডী রাস্তা। কোথাও চড়াই কোথাও বা উৎরাই। বেশিটাই চড়াই, কখনো পথ গেছে সবুজ উপত্যকার উপর দিয়ে, কোথাও বা ঘন শাল বনের মধ্যে মধ্যে। শটিফুলের মতো কী একরকম রঙিন ফুল ফুটে আছে গাছের গোড়ায় গোড়ায়। নতুন জল পেয়ে ডালে ডালে কত শত কচি কলাপাতা-রঙা পাতা গজিয়ে উঠেছে। সমস্ত জঙ্গল পাহাড় সবে চান-করা সুন্দরী কিশোরীর মতো এই মেঘলা দুপুরে স্বপ্নাতুর চোখে চেয়ে আছে।

বৌদিকে শুধোলাম, কি বৌদি, কষ্ট হচ্ছে নাকি?

বৌদি বললেন, একটুও না।

বৌদি একটি ফিকে কমলা রঙা তাঁতের শাড়ি পরেছেন। গায়ে একটি হালকা সাদা শাল।

ঘোষদার বপু ক্ষীণ নয়। বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন, এবং কিছুটা গিয়েই বলছেন, দাঁড়াও তো ভায়া একটু। আমি আর ঘোষদা দাঁড়াচ্ছি, যশোয়ন্ত আর সুমিতবউদি এগিয়ে যাচ্ছেন। আবার ওঁরা গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন; আমরা ধরছি।

দেখতে দেখতে আমরা বেশ উঁচুতে উঠে এসেছি, বেশ উঁচু। দূরে, কোয়েলের চওড়া গেরুয়া সাদায় মেশানো আঁচল দেখা যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন ও সবুজ জঙ্গল পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে।

নেতারহাটের পাহাড়টা যেন একেবারে নাকের সামনে। এক একবার নিঃশ্বাস নিলে মনে হচ্ছে যে বুকের যা কিছু গ্লানি সব সাফ হয়ে গেল।

আরও কিছুদূর উঠে একটি বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ল একটি ছবির মতো ছোট গ্রাম, পাহাড়ের খাঁজের উপর শান্তিতে বিছানো রয়েছে। কিন্তু এখনও প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিটের রাস্তা।

এমন সময় বৃষ্টি নামল। ঝুপঝুপিয়ে না হলেও টিপটিপিয়েও নয়। দৌড় দৌড়। বৌদি বেচারীর দুরবস্থার একশেষ। শাড়ি-টাড়ি লাল হয়ে গেছে লাল মাটি লেগে। চুল ভিজে গেছে, নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। জামাকাপড় স্বচ্ছ। ভাগ্যিস শালটা ছিল। নইলে দেবরদের সামনে বউদিকে বেশ বিব্রত হতে হত। একটি ঝাঁকড়া মহুয়া গাছের নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা হল, কিন্তু সে গাছের পাতা থেকে টুপ টুপ করে যা জমা জল পড়ছিল, তার চেয়ে বৃষ্টিতে ভেজা অনেক ভাল ছিল। ঘোষদা টাকে ঠাণ্ডা লাগাবার ভয়ে রুমাল জড়িয়েছেন। সকলেরই চুল ভিজে এলোমেলো, ঝোড়ো কাকের মতো অবস্থা।

সুমিতা বউদিকে কিন্তু ভেজা অবস্থায় সাধারণ অবস্থার চেয়ে বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছে। গালের দুপাশে অলকগুলো ভিজে কুঁকড়ে আছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চিবুক গড়িয়ে নাক বেয়ে জল নামছে। কোনো প্রসাধন নেই, কোনও আড়াল নেই। ঋজু শরীরে ভেজা পাইন গাছের মতো দেখাচ্ছে বৌদিকে।

আরও বেশ কিছুক্ষণ চলার পর যশোয়ন্ত হাঁক ছেড়ে বলল, পৌঁছ গ্যয়া। তাকিয়ে দেখলাম। আমি যে ভারতবর্ষেই আছি, অন্য কোনও বহুল প্রচারিত সুন্দরী দেশে নেই, তা বুঝতে কষ্ট হল। পরমুহূর্তেই বুঝলাম, আমি ভারতবর্ষেই আছি এবং একমাত্র ভারতবর্ষেই এই নিসর্গ সৌন্দর্য সম্ভব। অন্য কোনও দেশে নয়।

গ্রামের বাড়ি-ঘরগুলো সমতল জায়গায় ইতস্তত ছড়ানো। বাড়িগুলো চতুষ্কোণ নয়, কেমন বেঢপ। যশোয়ন্ত বলছিল, চতুষ্কোণ বাড়ি ওঁরাওদের মতে মাঙ্গলিক নয়। সব কটি বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে একটি দোতলা বাড়ি চোখে পড়ল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বন বিভাগের বাংলো বুঝি। শালের খুঁটির উপর দোতলা বাংলো। উপরে টালির ছাদ। বৃষ্টি ধোওয়া কোমল নয়নাভিরাম লাল রঙ। কৃষ্ণচূড়া ও ইউক্যালিপ্‌টাসের সারির মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

আমাদের সাদারঙা কাঠের গেট খুলে ঢুকতে দেখেই একটা ছাই-রঙা অ্যাল্‌সেসিয়ান লাফাতে লাফাতে ডাকতে ডাকতে আমাদের দিকে ছুটে এল।

সুমিতা বৌদি হাঁক দিলেন: মারিয়ানা, মারিয়ানা।

ডাকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলোর বারান্দায় একটি মেয়েকে দেখা গেল। পরনে একটি হালকা সবুজ শাড়ি। ভারি সুন্দর গড়ন। বারান্দার রেলিং-এ একবার হাত দুটো ছুঁইয়েই, শরীরে দোলা দিয়ে আনন্দে কলকলিয়ে বলল, একি তোমরা এসে গেছ! পরক্ষণেই কাঠের পাটাতনে শব্দলহরী তুলে শরতাকাশের দ্রুত শ্বেতা মেঘের মতো মারিয়ানা সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে এসে সুমিতা বৌদিকে জড়িয়ে ধরল। বলল, ঈস কী খারাপ। এতদিনে আসবার সময় হল?

সুমিতা বউদি হেসে বললেন, বেশ বাবা বেশ, আমি খুব খারাপ, নইলে এই বৃষ্টিতে কাকের মতো ভিজে, এই পোশাকে তোমাকে দেখতে আসি!

হুঁ। আমাকে দেখতে না আরও কিছু! এসেছ তো শিরিণবুরুর হাতি দেখতে।

যশোয়ন্ত কপট ধমকের সুরে বলল, আঃ মারিয়ানা আমরা এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ঝগড়া শুরু করলেন, দেখছেন না, সঙ্গে নতুন অতিথি আছেন? বলে আমাকে দেখাল।

মারিয়ানা বোধহয় সত্যিই আমাকে লক্ষ করেনি, এখন যশোয়ন্ত বলাতে হঠাৎ নবাগন্তুকের প্রতি চোখ পড়ল। মারিয়ানা হাত তুলে নমস্কার করল, আমি প্রতিনমস্কার করলাম।

মারিয়ানা সুন্দরী নয়, কিন্তু তার চোখ দুটি ভারী সুন্দর লাগল। মানে এত সুন্দর যে, ওর চোখ ছাড়া অন্য কিছু না থাকলেও ক্ষতি ছিল না।



আট

তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। কাঠের দরজার গায়ের ছোট-বড় ফুটো দিয়ে ঘোলা রঙের আলোর আভাস এসে ঘরের অন্ধকারকে জোলো করছে।

বেশ শীত। শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছি বাইরে জোর হাওয়া বইছে। কম্বলটা বেশ ভাল করে টেনে কাঁধ ও গলার নিচ দিয়ে জড়িয়ে যথাসম্ভব আরাম করে আর একটি জবরদস্ত ঘুম লাগাবার চেষ্টা করলাম, যতক্ষণ না ভাল করে সকাল হয়। এমন সময় যশোয়ন্ত ওর ঘর থেকে উঠে এসে আমাকে এক ঠেলা মারল। বলল, কেয়া সাহাব? চালিয়ে, জেরা শিকার খেলকে আঁয়ে।

আমি বললাম, এই সুখশয্যা ছেড়ে আমি কোনওরকম শিকারে যেতেই রাজি নই।

যশোয়ন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে কম্বলটা একটানে মাটিতে ফেলে দিল এবং অর্ডার করল, দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও।

নিরুপায়।

যশোয়ন্ত ওর রাইফেলটা নিয়েছে। আমার হাতে নয়া বন্দুক। হিমেল আমেজ-ভরা হাওয়ায় পার্বত্য প্রকৃতি থেকে ভারী সুবাস বেরুচ্ছে। কোথায় শাল মুড়ি দিয়ে বসে কফি খেতে খেতে মেজাজ করব তা নয়, চলো এখন শিকারে।

ভাগ্যিস মনে মনে বললাম কথাটা। যশোয়ন্ত শুনতে পেলেই লাফিয়ে উঠত, বলত, ওরে আমার মাখনবাবু!

মনে হচ্ছে সুমিতা বউদিরা ওঠেননি এখনও কেউ। বাবুর্চিখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আহা-হা বড় শীত। এক কাপ চা কিংবা কফি খেয়ে বেরোতে পারলে বড় ভাল হত। বাবুর্চিখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে লোভাতুর দৃষ্টি ফেলতে লাগলাম। মনের সাধ মনেই রইল। এমন সময়ে আমাদের দুজনকে চমকে দিয়ে জানালা থেকে মারিয়ানা ডাকল। ওকি? আপনারা চললেন কোথায় এই সকালে?

যশোয়ন্ত বলল, কেন? আপনিই না কাল বললেন, হরিণ না মেরে আনলে খাওয়া নেই। এমনভাবে অতিথি সৎকার করেন, আগে জানলে কি আর আসতাম?

মারিয়ানা হেসে বলল, না না, ভাল হবে না। জল গরম হয়ে গেছে। অন্তত এক কাপ করে কফি খেয়ে যান।

যশোয়ন্ত অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আকাশ এবং ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর বিরক্ত হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, তথাস্তু।

তারপর মারিয়ানা লিড করল। সকালে আমরা যে পথে গিয়েছি, সে পথে নয়, অন্য পথে। কিন্তু পথটা খাড়া চড়াই। মারিয়ানা একটি সাদা খরগোশের মতো তরতরিয়ে উঠতে লাগল। বেশ অনেকখানি খাড়া উঠলাম। আমাদেরই বেশ কষ্ট হচ্ছিল। মেয়েদের হবারই কথা। কিন্তু উপরে উঠে যা দৃশ্য দেখলাম, তাতে চোখ জুড়িয়ে গেল। আমরা বোধহয় একটি পাহাড়ের একেবারে মাথায় উঠেছি। নীচে খাড়া খাদ এবং সেই খাদ গিয়ে কোয়েলের উপত্যকায় মিশেছে। মাইলের পর মাইল ঘন অবিচ্ছেদ্য জঙ্গল। দুটি শকুন উড়ছে আমাদের পায়ের নীচে চক্রাকারে। বাঘ কিংবা চিতা কোনও জানোয়ার মেরে রেখেছে বোধ হয় জঙ্গলে।

পুবে সূর্য উঠে এখন প্রায় মাথার কাছাকাছি আসব আসব করছে। সমস্ত বৃষ্টিস্নাত উপত্যকা কাঁচা রোদে ঝলমল করছে।

যশোয়ন্ত বলল, ডাইনে-বাঁয়ে ভাল করে নজর করো। কোনও কিছু নড়লে-চড়লেই বলবে। প্রায় মিনিট পাঁচেক আমরা নির্বাক সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনও কিছুই নজরে পড়ল না। হতাশ হয়ে নেমে যাব, এমন সময় প্রায় আমাদের পায়ের নীচের গভীর ও ঘনান্ধকার উপত্যকা থেকে মার্সিডিস ট্রাকের হর্নের মতো একটি আওয়াজ শোনা গেল। পরপর দুবার।

যশোয়ন্ত বলল, হাতির দল চরতে-চরতে একেবারে পাহাড়ের গোড়ায় চলে এসেছে। পাহাড়টা এদিকে এত খাড়া যে, হাতি যে উঠে আসবে সে সম্ভাবনা নেই। কাউকে না বলে, হঠাৎ যশোয়ন্ত দুটো বিরাট পাথর গড়িয়ে দিল উপর থেকে নীচে। পাথরগুলো কড়-কড় শব্দ করে নীচে গড়িয়ে যেতে লাগল। কিন্তু গাছপালার জন্যে নীচে অবধি পৌঁছল বলে মনে হল না। তারপর যশোয়ন্ত আর একটি পাথর 'পুটিং দি শট' ছোঁড়ার মতো করে নীচে ছুঁড়ল। এবং সে পাথরটা নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো-বা কোনও হাতির গায়েই পড়ে থাকবে, নীচের জঙ্গলে একটি আলোড়নের সৃষ্টি হল। তারপর যা দেখলাম তা ভোলার নয়। অত বড় বড় হাতি চার পা তুলে যে কত জোরে দৌড়য়, জঙ্গলে তা না দেখলে বিশ্বাস হত না। একটা ঘাসে ভরা মাঠ পেরুবার সময় দেখা গেল।

ঘোষদা বললেন, ইস কী ডেঞ্জারাস। ওদিকে না গিয়ে যদি এদিকে আসত? এসব খুনে লোকদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরুনোও বিপদ।

হাতির দল প্রচণ্ড শব্দে দৌড়তে দৌড়তে চোখের নিমেষে গিয়ে আরও গভীর জঙ্গলে পৌঁছল। সেখানে তাদের আর দেখা যাচ্ছিল না।

মারিয়ানা বলল, কেমন? হাতি দেখালাম তো!

এবার নামার পালা। আমরা সবাই নামতে লাগলাম। হঠাৎ সুমিতাবউদি বললেন, এই তোমরা একটু এগোও, আমি এক্ষুনি আসছি।

আমরা সকলে এগিয়ে গেলাম। পরে বউদি এসে আমাদের ধরলেন।

যশোয়ন্ত বলে উঠল, এটা অত্যন্ত অন্যায়। একটুও ফ্র্যাঙ্ক হতে পারেন না? সুমিতাবউদি অবাক এবং কিঞ্চিৎ বিরক্ত গলায় শুধোলেন, কীসের ফ্র্যাঙ্ক? মানে বুঝলাম না তোমার কথার।

যশোয়ন্ত বলল, সে গল্প জানেন না? আমার হাজারিবাগী খুরশেদের গল্প। খুরশেদের সঙ্গে শিকারে গেছি। সে মেমসাহেবের গল্প বলছে, যে মেমসাহেব আগে নাকি ওখানে শিকারে এসেছিল। খুরশেদ ইংরাজি বলে, 'টেক-টেক নো-টেক একবার তো সি' গোছের।

সে বলল, ক্যা কহে হুজৌর উ মেমসাব ইতনি ফ্র্যাঙ্ক থি। বেশক ফ্র্যাঙ্ক। শুধোলাম, মানে? সঙ্গে সঙ্গে খুরশেদ বলল, হামলোগ হিঁয়া বৈঠকে গপ কর রহা হ্যায় ঔর মেমসাব হুঁয়াই বৈঠকে হিসি কর রহি হ্যায়। কেয়া ফ্র্যাঙ্ক!

যশোয়ন্তের এই গল্প শুনে সুমিতাবউদি এবং মারিয়ানা দুজনে একসঙ্গে নাভি থেকে নিশ্বাস তুলে বললেন, ই-স-স কী-খারাপ! বলেই সুমিতাবউদি হাসতে লাগলেন। ঘোষদা ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। যশোয়ন্ত সেই হাসির তোড়ের মাঝে বলল, কই, আপনারা তো জঙ্গলে ফ্র্যাঙ্ক নন!

মারিয়ানা সত্যিই লজ্জা পেয়েছে। একবার একটু ফিক করে হেসে গম্ভীর হয়ে গেছে।

যশোয়ন্তটাকে নিয়ে একদম পারা যায় না। এমন অনেক পুরুষালি রসিকতা ও মজার কথা আছে যা পুরুষদের কাছে অবলীলাক্রমে বলা চলে, কিন্তু মেয়েদের সামনে ভুলেও বলা চলে না। কিন্তু কে বোঝাবে? এটা একটা জংলি। একেবারে আকাট জংলি। একে সভ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বেশ ভাল খাওয়া হল দুপুরে। মুরগির ঝোল আর ভাত। খাওয়ার পর সুমিতাউদি বললেন, আমি একটু জিরিয়ে নিচ্ছি ভাই, তোমরা কিছু মনে কোরো না। বড় খাড়া ছিল পাহাড়টা।

ঘোষদা আগেই গিয়ে বিছানা নিয়েছেন। যশোয়ন্ত একটি শালপাতার চুট্টা ধরিয়ে বারান্দায় পায়চারি করে বেড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমিও একটু গড়িয়ে নিই, রাতে আবার ভেজ্জা নাচতে হবে। তারপরই শুধোলো, গাঁয়ে সেই সুন্দরী মেয়েটি আছে তো? না অন্য গ্রামে চলে গেছে বিয়ে হয়ে? কি মারিয়ানা? মারিয়ানা হেসে বলল, আছে। আপনি এসেছেন এ খবরও সে পেয়েছে। খবর পেয়েই হাসতে আরম্ভ করেছে। বলছে, পাগলটা আবার এসেছে।

আমি বললাম, হ্যাঁ পাগল না ন্যাকা-পাগল।

মারিয়ানা মুখ নিচু করে হাসতে লাগল।

যশোয়ন্তকে বলল, এমন চেলা বানিয়েছেন যে, গুরুর গুরুত্ব থাকলে হয়। যশোয়ন্ত বলল, ওসব কথা শোনেন কেন?

যশোয়ন্ত ঘরে গেল শুতে। আমি ইজিচেয়ারে বসেছিলাম। ভেবেছিলাম, চুপ করে বসে এই অপূর্ব শিরিণবুরুর একটি প্রশান্ত দুপুরকে ধীরে ধীরে বিকেলে গড়িয়ে যেতে দেখব। সেই আপাততুচ্ছ সম্পদ, সেই বিচিত্র, আনন্দময় দৃশ্যকে সকলে দেখতে পারে না। সকলের সে চোখ নেই। সিনেমাটোগ্রাফি অত্যন্ত সার্থক শিল্প, কারণ তাতে অডিও-ভিসুয়াল এফেক্ট আছে। কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি আমার রুমান্ডির বাংলোয় বসে প্রতিদিন রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে ভরা যে সিনেমা রোজ দেখি, সেই পর্যায়ে কোনও দিন কোনও আর্ট পৌঁছবে কিনা জানি না। প্রকৃতি নিজের হাতে তুলি ধরে নিজের হাতে বাঁশি ধরে সেই ছবি রোজ আঁকেন, আবার রোজ মুছে ফেলেন। অথচ প্রতিদিনের ছবিই বিচিত্র। কোনও ছবিই অন্য কোনও ছবির প্রতিভূ নয়।

মারিয়ানা কোথায় গিয়েছিল জানি না, হঠাৎ বারান্দা আলো করে ফিরে এল। বলল, মশলা খাবেন? বললাম, দিন।

একটি ছোট জাপানি কাচের রেকাবিতে একমুঠো দারুচিনি-লবঙ্গ-এলাচ এনে মারিয়ানা হাত বাড়াল।

বলল, আপনি বুঝি দুপুরে ঘুমোন না?

আমি বললাম, মোটেই না। মানে, চেষ্টা করলেও পারি না।

ও হেসে বলল, আমার মতো।

আমি শুধোলাম, এখানে আপনার একা একা লাগে না? একদম একা একা থাকেন?

মাঝে মাঝে যে একা, খুবই একা লাগে না তা নয়, তবে বেশির ভাগ সময়ই লাগে না। স্কুল তো আছেই—তাছাড়া জোত-জমি দেখাশুনা করি, মুরগি ও গরুর তত্ত্বাবধান করি, একটু আধটু বাগান করি, তাতেই একসারসাইজ-কে একসারসাইজ এবং সময় কাটানো-কে সময় কাটানো হয়। বাদবাকি সময়ে পড়াশুনা করি। এবং পড়াই তা তো জানেনই।

আমার কিন্তু এই বন-পাহাড় ভাল লাগে। ছোটবেলা থেকেই ভাল লাগে।

আমি শুধোলাম, কীসের পড়াশুনা? কোনও বিশেষ বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই?

মারিয়ানা বলল, কোনও বিশেষ বিষয় নিয়ে নয়। যা পড়তে ইচ্ছা হয় তাই পড়ি। তবে বেশির ভাগই সাহিত্যের বই। ইদানিং একটু-আধটু ছবিও আঁকার চেষ্টা করি।

কী আঁকেন? ল্যান্ডস্কেপ?

না! না! আমি এমনি হিজিবিজি এলোমেলো রঙ বোলাই। বোলাতে বোলাতে কোনওটা বা কোনও ছবিতে দাঁড়ায়। ছবি মানে বিভিন্ন রঙের সুরুচিসম্পন্ন সমষ্টি মাত্র। আবার কোনওটা বা কিছুই হয় না। ছিঁড়ে ফেলে দিতে হয়। কিন্তু আঁকতে পারি আর নাই পারি, নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য এত ভাল হবি আর কিছু নেই।

আমি দ্বিধাগ্রস্ত গলায়, এত নতুন পরিচয়ে বলাটা সমীচীন হবে কি না ভেবে বললাম, ভোলাবার প্রয়োজনই বা কী নিজেকে?

মারিয়ানা একরাশ বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, হয়তো বা আছে প্রয়োজন। নিজেকে মাঝে মাঝে ভোলাবার প্রয়োজন কার না আছে? তারপর বলল, প্রায় হঠাৎই, চলুন আমার পড়ার ঘর এবং বাড়িটা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাই।

চলুন।

কোন ব্যক্তির পড়ার ঘর বা স্টাডিতে যেতে আমার খুব ভাল লাগে। সেই ঘরটি যেন সেই বিশেষ লোকটির মনের আয়না। অবশ্য, যাঁরা সত্যিকারের সে ঘর ব্যবহার করেন। অনেকে লোক দেখাবার জন্যে যেমন ঘর সাজিয়ে রাখেন তেমন ঘর নয়। যে ঘর ব্যবহৃত হয়, সে ঘর দেখলেই বোঝা যায়। সে ঘরে তার ব্যক্তিত্বের অনেকখানি ছড়িয়ে থাকে।

মারিয়ানার দোতলা কাঠের বাংলোটির চারপাশে চওড়া ঘোরানো কাঠের বারান্দা। সামনে-পেছনে দুটি করে ঘর। পেছনে পশ্চিমমুখো একটি ছোট ঘর।

স্টাডিটি ছোট—আগে ওর বাবার ছিল। পুরো পশ্চিম দিকটাতে দেওয়াল নেই। কাচের জানালা। ভেতরে পরদা ঝুলছে। তবে সে পরদা পুরোটা সরানো। একটি টেবিল। বেতের কাজ করা একটি টেবিলবাতি। চতুর্দিকে দেওয়ালে বসানো আলমারিতে সারি সারি রাশি রাশি বই। মেঝেতে একটি সাদা মোটা গাল্‌চে পাতা। যে চেয়ারে বসে ও পড়াশুনা করে, সেই চেয়ারটির উপরে একটি হরিণের চামড়া পাতা। টেবিলের উপরেও ইতস্তত অনেক বই ও কাগজপত্র ছড়ানো। কালি কলম টেবিলের উপর। ঘরটা থেকে একটি মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে—হয় মারিয়ানা যে তেল মাখে মাথায়, সে তেলের গন্ধ, নয়তো যে আতর বা অন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে, তার সুবাস এই ঘরের আবহাওয়ায় ভরে রয়েছে। এই বুঝি মারিয়ানার মনের গন্ধ।

মারিয়ানা বলল, বসুন না, আমার চেয়ারে বসুন।

আমি অবাক হলাম। বললাম, কেন?

আহা, বসুনই না।

বসলাম। বসে যা দেখলাম, তা একেবারে হৃদয়-ভোলানো। পুরো কাচের জানালা দিয়ে আদিগন্ত যতদূর দেখা যায় কেবল পাহাড় আর পাহাড়, জঙ্গল আর জঙ্গল। বহুদূরে বেশ চওড়া একটি নদীর রেখা দেখা যাচ্ছে। মারিয়ানা জানাল, ঔরঙ্গা নদী, কোয়েলে গিয়ে মিশেছে।

সবুজের যে কত রকম বৈচিত্র্য, তা এই ঘরে বসে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায়। এই রকম একটি স্টাডি পেলে সারাজীবন আমি আনন্দে কাটাতে পারি—আর কোনও জাগতিক কিছুর উপর আমার লোভ নেই।

মারিয়ানাকে বললাম কথাটা। মারিয়ানা হাসল। বলল, বেশ তো, যখন খুশি আসবেন, এলেই আমি এই স্টাডি আপনাকে ছেড়ে দেব। যে ক' দিন থাকবেন, সে ক' দিন এ স্টাডি আপনার।

উত্তরে চুপ করে থাকলাম। ভাবলাম, এ রকম ঘর তো মনেরই একটি কোণ, এতে কি দূর থেকে এসে কেউ বসতে পারে? না, এ ঘরে কাউকে কেউ বসাতে পারে?

মারিয়ানা অনেকক্ষণ চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

স্টাডির দেওয়ালে, চেয়ারে বসে সামনাসামনি চোখে পড়ে এমন জায়গায় পাশাপাশি দুটি ফটো। একখানা ফটো কেমন ব্যথাতুর বিশীর্ণ মুখ, চশমা-চোখ ভদ্রলোকের। সমস্ত মিলিয়ে এক মনীষী-সুলভ পরিমণ্ডল। মারিয়ানা বলল, আমার বাবা। তার পাশে আর একখানা ফটো কমবয়স্ক এক ভদ্রলোকের। বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। পরনে সাহেবি পোশাক। মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল উলটো করে ফেরানো। ভারি সুন্দর ও অভিব্যক্তিময় চোখ। যেন অনেক কিছু না-বলা কথা বয়ে নিয়ে বেড়ানো। মানে, এমন একটি মুখ, যা একশো লোকের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়বে।

মারিয়ানা বলল, সুগত রায়চৌধুরী। আর্কিটেক্ট। কলকাতায় চাকরি করেন। লেখেনও। ওঁর কোনও লেখা পড়েননি?

বাঃ ভারি ইমপ্রেসিভ চেহারা তো। না, লেখা পড়িনি!

ভদ্রলোক মারিয়ানার কে হন তা মারিয়ানা বলল না। আমিও জিজ্ঞেস করলাম না।

আমরা ফিরে এসে বারান্দায় বসলাম। হাওয়াটা বেশ জোরে বইছে। পাহাড়টার নীচে বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশটা আবার কালো করে এল। মারিয়ানা ঘর থেকে একটি পশমি শাল নিয়ে এল। জড়িয়ে বসল গায়ে।

বারান্দা থেকে বাঁদিকে চাইলে একটি বেশ উঁচু পাহাড়ের চুড়ো দেখা যায়। ঘন বনে ছেয়ে আছে সমস্ত পাহাড়। মেঘ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চুড়ো। আমি শুধোলাম, পাহাড়টার নাম কী?

মারিয়ানা ঘুরে বসে বলল, ওই তো মুচুকরানির পাহাড়। ওই পাহাড়ের নাম বহুরাজ। খাঁরওয়ারেরা ওখানে পুজো দেয়। মুচুকরানির নইহার বলে ওই পাহাড়টাকে।

বলুন না, কী করে পুজো করে? কী দেবতা মুচুকরানি?

সে তো অনেক কথা। অল্পের মধ্যে আপনাকে বলছি। মুচুকরানি খাঁরওয়ারদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা। অনেকে এঁকে দুর্যাগিয়া দেওতাও বলে। এখন আর তেমন হাঁক-ডাক নেই। খাঁরওয়ারেরা আজকাল অনেকে ক্রিশ্চান হয়ে গেছে। আমরা ছোটবেলায়

আমরা বাবুর্চিখানার বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি খেলাম। আগুনে একটু গরমও হয়ে নিলাম।

কফি খেতে খেতে বললাম, উইল ফোর্স বলে একটি কথা আছে তো! ইচ্ছার জোর যাবে কোথায়?

যশোয়ন্ত বলল, ভালর জন্যেই বলেছিলাম। খামোকা হয়রাণ হবে, শিকার মিলবে না দেরি করে ফেললে। যা মাখনবাবুর পাল্লায় পড়েছি।

মারিয়ানা একটি সাদা শাল জড়িয়েছে গায়ে, তাতে কালো কাশ্মিরী পাড় বসানো। আগুনের লাল আভা লেগেছে ওর গালের একপাশে, কপালে, অলকে, দুধ্‌লি রাজহাঁসের গায়ে প্রথম ভোরের সোনালি-আলো যেমন ছড়িয়ে পড়ে। ও হেসে বলল, ভদ্রলোককে এমন করে নাজেহাল করছেন কেন?

সমবেদনা জানিয়ে মারিয়ানা আমাকে আরও অপ্রতিভ করে তুলল।

কফির কাপ নামিয়ে রেখে আমরা রওয়ানা হলাম। মারিয়ানা বলল, গাড়ুয়া-গুরুং-এর বাম ঢালে নিশ্চয়ই যাবেন কিন্তু। আমার ইনফরমেশান পাক্কা। হরিণ পাবেনই।

একটি পাকদণ্ডী রাস্তা বেয়ে যশোয়ন্ত নিয়ে চলল আমাকে। আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ নেমে গেছে নীচে। দূরে নেতারহাটের মাথা-উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বহু নীচে কোয়েলের আঁচল বিছানো। পাখিরা সব জেগেছে। শ্বাপদেরা সবে ঘুমুতে গেছে রাতের টহল শেষ করে। আশ্বাপদেরা সবে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে সারারাত সজাগ থাকার পর। ময়ূর ডাকছে। মোরগ ডাকছে থেকে থেকে। ছাতারেদের সম্মিলিত চিৎকার আর বন-টিয়াদের কাকলি এই প্রভাতী হাওয়া মুখরিত করে রেখেছে। গাছে লতায় পাতায় তখনো শিরশির করে হাওয়া বইছে—তখনও জলে ভেজা ঝরা ফুল লতা-পাতায় পথপ্রান্তরে ছেয়ে রয়েছে।

আমরা বেশ অনেকদূর নেমে, একটি মালভূমির মতো জায়গায় এলাম। সেখানে বড় বড় গাছ আছে, কিন্তু বেশি নয়। শাল সেখানে কম। বহেড়া, পন্নন, পুঁইসার, গামহার, ইত্যাদি গাছের ভিড়ই বেশি। কুল ও কেলাউন্দার ঝোপও আছে। যশোয়ন্ত পথে নজর করতে করতে চলেছে, নানা জানোয়ারের পায়ের দাগ।

নরম ভিজে মাটিতে শম্বরের পায়ের দাগ। সজারুদের ছাপও চোখে পড়ল। এক জায়গায় অনেকগুলো সজারুর কাঁটা কুড়িয়ে পেলাম। তার মধ্যে কিছু কাঁটা ভেঙে বেঁকে গেছে। যশোয়ন্ত বলল, হয় এখানে বাঘে কোন সজারু ধরেছে, নয়তো স্থানীয় কোন শিকারী সজারু শিকার করেছে।

গাড়ুয়া-গুরুং-এর ঢাল যে কোন দিকে তা যশোয়ন্তই জানে।

একটি বাঁক ঘুরতেই আমরা একতাল ছোবড়া-সর্বস্ব হাতির পুরীষের সামনে উপস্থিত হলাম। আশেপাশের গাছের ডালপালা ভাঙা। যশোয়ন্ত বাঁ হাত দিয়ে সেই পুরীষে হাত ছুঁইয়ে দেখল। তারপর কেঁদ গাছের পাতায় হাত মুছতে-মুছতে বলল, এখনও গরম আছে দোস্ত, বেটারা একটু আগেই গেছে। বন-জঙ্গল ভেঙে নিজেদের রাস্তা নিজেরাই করে যেখান দিয়ে কোয়েলের দিকে নেমে গেছে হাতিরা, আমরা তার বিপরীত মুখে চললাম। কারণ, আমাদের আশু উদ্দেশ্য হরিণ শিকার। হাতির দলের সামনে গিয়ে পড়া নয়।

আরও কিছুদূর যেতেই যশোয়ন্ত বলল, বন্দুকে গুলি ভরো। ডানদিকে বুলেট, বাঁ দিকে এল-জি। চলো, আমার আগে আগে চলো, এমনভাবে পা ফেলো যাতে শব্দ না হয়, শুকনো ডাল বাঁচিয়ে, আলগা পাথর বাঁচিয়ে।

মিনিট পনেরো যাবার পর যশোয়ন্ত আমাকে মাটিতে বসে পড়তে বলল। গুরু-বাক্যানুযায়ী বসে পড়লাম। যশোয়ন্ত আমার পাশেই বসল। বসে, একটি ঘন কেলাউন্দার ঝোপের পাশ দিয়ে কী যেন দেখতে লাগল।

এমন সময়ে একটি অতর্কিত আওয়াজ হল, ব্বাক। মনে হল কোনও অ্যালসেশিয়ান কুকুর ডেকে উঠল। সেই সুহাগীর চড়ায় চড়ুই-ভাতির সময় যেমন শুনেছিলাম। ডাকটি অনেকটা সেই রকম। যশোয়ন্ত আঙুল দিয়ে আমাকে কাছে যেতে ইশারা করল। ওর কাছে গিয়ে দেখি, দু'টি ছাগলের চেয়ে বড় হরিণ পাহাড়ের উপরের ঢালে যেখানে কচি-কচি সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সেখানে মুখ নিচু করে ঘাস খাচ্ছে। দুটির মধ্যে একটি আমাদের বিপরীত দিকে পাহাড়ের খাদে কী যেন দেখছে আর ডেকে উঠছে।

যশোয়ন্ত ফিসফিসিয়ে বলল, এল-জি দিয়ে মারো।

আমি হাঁটু গেড়ে বসে উত্তেজনার বশে, এক সঙ্গে দুটি ট্রিগারই টেনে দিলাম।

হরিণগুলো খুব বেশি দূরে ছিল না। তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটি হরিণ আমার মতো শিকারীর গুলিতেই সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই পড়ে গেল।

আনন্দে অধীর হয়ে আমি লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, অমনি যশোয়ন্ত আমাকে হাত ধরে টেনে বসাল।

অন্য হরিণটি এক দৌড়ে পাহাড়ে উঠছিল। মাঝে-মাঝে গাছপালার আড়ালে আড়ালে তার শরীরের কিছু লালচে অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হরিণটি আমাদের থেকে প্রায় দেড়শ গজ দূরে পৌঁছে গেল এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কান খাড়া করে আমাদের দিকে চাইল। সেই মুহূর্তে আমাকে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিয়ে যশোয়ন্ত ওর থার্টি-ও-সিক্স রাইফেলটা এক ঝটকায় তুলল এবং গুলি করল। এবং কী বলব, হরিণটা সার্কাস করতে করতে ডাল-পালা ঝোপ ঝাড় ভেঙে প্রথম হরিণটা যেখানে পড়েছিল, প্রায় তার কাছাকাছি ডিগবাজি খেয়ে গড়াতে-গড়াতে পাহাড় বেয়ে নেমে এসে থেমে গেল।

লোকের মুখে শুনেছিলাম, যশোয়ন্ত ভাল শিকারি। আজ সত্যিকারের প্রত্যয় হল, কত ভাল শিকারি সে।

আমি বললাম, তোমার রাইফেল কি জাদু করা? ও বলল, আরে ইয়ার, জাদু হচ্ছে ভালবাসার জাদু। রাইফেলকে যদি তেমন করে ভালবাসো, তবে রাইফেলও ভালবাসবে তোমাকে।

ততক্ষণে পুবের পাহাড়গুলোর মাথার উপরের আকাশটায় একটু লালচে ছোপ লেগেছে। অবশ্য সামান্য জায়গায় মেঘও করেছে মনে হচ্ছে। যশোয়ন্ত ওর রাইফেলটা আমায় ধরতে দিয়ে, এগিয়ে চলল হরিণ দুটোর কাছে।

প্রথম বন্দুকে প্রথম শিকার করে অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল আমার। এবং হয়তো গর্বও।

হরিণগুলোর কাছে গেলাম। দেখলাম, আমার দুটি গুলিই লেগেছে। বুলেটটা বুকে লেগেছে—একটা রক্তাক্ত ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে বুকে। আর এল-জি দানাগুলো সারা শরীরে ছিটানো রয়েছে। যশোয়ন্ত যে হরিণটা মেরেছিল, তার কাছে গিয়ে দেখি রাইফেলের গুলি গলা দিয়ে একটি চার ইঞ্চি পরিধির গর্ত করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। জিভটা বেরিয়ে গেছে এবং মৃত হরিণটা জিভটা কামড়ে রয়েছে। দু' চোখের কোণে

দু' বিন্দু জল জমে আছে। এই দৃশ্য দেখে এক লহমায় আমার শিকারের শখ উবে গেল। এত খারাপ লাগল যে কী বলব।

যশোয়ন্তকে বললাম, আমাদের খাবারের জন্যে একটি হরিণই তো যথেষ্ট ছিল তবু তুমি অন্যটাকে মারলে কেন?

ও ধমক দিয়ে বলল, নিজের পেট ভরালে তো চলবে না; গাঁয়ের লোকেরা বড় গরিব। ওরা বছরে একদিনও মাংস খায় কিনা সন্দেহ। ওরা খাবে। ওদের জন্যে মারলাম।

আমি তখন বেশ রেগে বললাম, তা বলে এরকমভাবে মারবে?

এবার যশোয়ন্ত আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তবে কীরকমভাবে মারব? কসাইখানায় যখন পাঁঠা কাটে, তখন পাঁঠার এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট হয়। খাসিকে যখন আড়াই পোঁচ দিয়ে জবাই করা হয়, তখনও খাসির এর চেয়ে বেশি কষ্ট হয়। অষ্টমীর দিন ভোঁতা রামদা দিয়ে যখন আনাড়ি লোক মোষের গলায় কোপের পর কোপ মারে, তখনও মোষের এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট হয়। কষ্ট মানেটা কী? একটি প্রাণ শেষ হবে, আর কষ্ট হবে না। তবে আমরা যেভাবে মারলাম, এর চেয়ে কম কষ্ট দিয়ে জানোয়ার মারা সম্ভব নয়। যাদের এত কষ্টজ্ঞান, তাদের শিকারে আসা উচিত না এবং শিকারের মাংস খাওয়াও অনুচিত।

আমার বক্তব্যটা মোটে বুঝতে পারেনি, তদুপরি এতগুলো রূঢ় কথা বলল। চুপ করে থাকলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, আর কোনওদিন শিকারে যাব না ওর সঙ্গে।

যশোয়ন্ত কোমরে ঝোলানো ছোরাটা দিয়ে একটি শলাই গাছের ডাল কাটল। তারপর ছোরা দিয়ে যে হরিণটা আমি মেরেছিলাম, তার খুরের একটু উপরে চিরে দিল। সামনের দু পা এবং পেছনের পায়েও। তারপর পাতলা মাংসের ভেতর দিয়ে সেই ডালটা গলিয়ে দিল। ফলে হরিণটা চার পায়ে ঝুলে থাকল সেই ডালে। যশোয়ন্ত আমার রুমালটা চাইল এবং নিজের খাকি-রঙা রুমালটাও বের করল। হরিণটাকে ডালটির এক প্রান্তে ঝুলিয়ে তার আগে ও পিছনে রুমাল দুটি কষে বাঁধল, যাতে হরিণের পা হড়কে না যায়। তারপর অবলীলাক্রমে সেই তিরিশ সেরী হরিণটাকে কাঁধে উঠিয়ে বক রাক্ষসের মতো তরতরিয়ে পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল। আমাকে অর্ডার করল, রাইফেল বন্দুকে গাছে-টাছে ধাক্কা না লাগে, আমার পেছনে-পেছনে পথ দেখে চলো।

আমরা সবাই ব্রেকফাস্টে বসেছি। মারিয়ানা ও সুমিতা বউদি যদিও আমাদের সঙ্গেই খেতে বসেছেন, তবু ওঁরা দুজনেই নিজেরা খাওয়ার চেয়ে আমাদের খাবারই তদ্বির করছেন বেশি।

ঘোষদাকে দেখলে মনে হয়, খাদ্যদ্রব্যের উপর লোভ থাকাতে অন্য অনেক জ্বালাময়ী রিপুর হাত থেকে উনি বেঁচে গেছেন।

যশোয়ন্ত এই এল হরিণের চামড়া ছাড়িয়ে। গাঁয়ের লোকদের পাঠিয়েছে গাডুয়া-গুরুং-এর ঢালে দ্বিতীয় হরিণটি নিয়ে আসতে। রাতে নাকি খুব জোর মহুয়া খাওয়া হবে এবং ভেজ্জা নাচা হবে।

যশোয়ন্ত আমার পাশে এসে বসল। তারপর চওড়া কব্জিওয়ালা হাত দিয়ে থাবা মেরে মেরে খেতে লাগল। ওর হাতে আমি হরিণের রক্তের গন্ধ পাচ্ছিলাম।

মারিয়ানাকে যশোয়ন্ত বলল, মাংসটাকে স্মোক করতে হবে। কাউকে বলুন না, বেশ কিছুটা শুকনো কাঠ এবং খড় পাঠিয়ে দিক। সরষের তেল আর হলুদ আমি মাখিয়ে রেখে এসেছি।

তা বলছি। আপনি আগে খেয়ে নিন তো, তারপর হবে। মারিয়ানা বলল।

সুমিতাবউদি বললেন, তাহলে লালসাহেব, হরিণ শিকার হল? গুরুর নতুন চেলা।

যশোয়ন্ত কোঁৎ কোঁৎ করে দুধ গিলতে গিলতে বলল, এমন চেলা হলে গুরুর জাত যেতে বেশি দেরি নেই। চেলা মরা হরিণ দেখে মেয়েদের মতো কাঁদে।

সুমিতাবউদি হি-হি করে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন, এ মাঃ, তুমি কি সত্যি কেঁদেছ?

ঘোষদা বললেন, কাঁদবেই তো! কোনও ভদ্রলোক এমন করে নিরপরাধ পশুকে মারে?

যশোয়ন্ত বলল, মারিয়ানা, ঘোষদার পাতে আজ এক টুকরো মাংসও যদি পড়ে, তবে খুব খারাপ হবে কিন্তু।

ঘোষদা চটে গিয়ে বললেন, খাওয়ার সঙ্গে কী আছে? খাওয়ার জিনিস খাব না! তবে মারামারি আমি পছন্দ করি না।

মারিয়ানা কথা বলল না। ও শুধু আমার দিকে তাকাল একবার।

বাইরে তখন বেশ রোদ্দুর। কিন্তু এমন ঠাণ্ডা যে, বর্ষাকাল বলে মোটে মনেই হচ্ছে না। মনে হচ্ছে পৌষ মাস। বাইরে বেরিয়ে রোদ্দুরে আমরা দুজনে একটু চুপ করে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ যশোয়ন্ত আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, আজকে তোমার প্রথম শিকারের দিন। অত হতাশ বা দুঃখিত হয়ো না। পৃথিবীতে কারুকে না কারুকে দুঃখ না দিয়ে অন্য কারুকে আনন্দ দেওয়া সম্ভব নয়।

একটু থেমে যশোয়ন্ত বলল, তুমি জানো না লালসাহেব, আজকে রাতে এই শিরিণবুরু গাঁয়ের ভারী গরিব ছেলেমেয়েরা যখন ওই হরিণের মাংস খেয়ে আনন্দে গাইবে, ভেজ্জা নাচবে, কল-কল করে হাসবে, তখন তোমার মনে হবে, হরিণ মেরে ভগবানের কাছে কোনও পাপ যদি করেও থাক, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তও করেছ। লালসাহেব, ন্যায়-অন্যায়টা রিলেটিভ ব্যাপার।

চুপ করে শুনছিলাম ওর কথা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম, মারিয়ানা, সুমিতাবউদি এবং ঘোষদা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আমাদের দিকে আসতে লাগলেন। সুমিতাবউদি ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, মহুয়াসিঁড়ি নদীর ধারে দুপুরে চড়ুইভাতি হবে নাকি?

যশোয়ন্ত আবার সেই পুরনো যশোয়ন্ত হয়ে হেসে বলল, নিশ্চয়ই হবে। আমি তোমাদের বাঁশপোড়া কোটরার কাবাব খাওয়াব।

মারিয়ানা বলল, আমি ভিনিগার দিয়ে ভিজিয়ে রেখে এসেছি কিছু মাংস, বিকেলে তোমাদের মাংসের চাটনি খাওয়াব।

তা তো হল; এখন হাতি দেখাবে না আমাদের?

তোমাদের হাতি দেখাতে হলে তো পর্বতের মতো হাতিকে মহম্মদের কাছে আসতে বলতে হয়। বলল যশোয়ন্ত।

মারিয়ানা বলল, ইস ভারী তো দেমাক আপনার। আপনি ছাড়া বুঝি আর কেউ এখানে নেই?

টাবড় বলল, নয়া তালাওর পাশের শটি খেতে শুয়োরের দল রোজ সন্ধে হলেই নামে। ইয়া ইয়া বড়কা বড়কা দাঁতালো শুয়োর। গেলে নির্ঘাৎ মারা যাবে।

আমি বললাম, মাচা-টাচা বাঁধা আছে?

টাবড় বলল, মাচা কী হবে হুজৌর? মাটিতেই লুকিয়ে বসে মারব।

শুনেই তো অবস্থা কাহিল। বললাম, না বাবা, এই বৃষ্টি বাদলায় মাটিতে বসে শিকার-টিকার আমি করি না।

টাবড় মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল।

ইদানিং কিন্তু সকালে বিকেলে একা একা বন্দুক হাতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এদিক-ওদিক যাই। তবে বড় রাস্তা ছেড়ে খুব একটা অন্যত্র ঢুকি না। গা ছম ছম করে। বড় রাস্তার আশেপাশে যা পাখিটাখি পাই, তাই মারি। যশোয়ন্ত বলেছিল, এই রকম শিকারকে বলে Pot hunting। খাদ্য সংস্থানের জন্যে।

সুহাগী নদীর রেখায় যশোয়ন্তের বসবার প্রিয় জায়গাটার কাছেই একটি বড় গাছে সন্ধের মুখে মুখে প্রচুর হরিয়াল এসে বসত। ওখানে গিয়ে প্রায়ই মারতে লাগলাম হরিয়াল। ভাল করে নিশানা করা যায় না—পাখিগুলো বড় চঞ্চল, এক জায়গায় মোটে বসে থাকে না, কেবলই এ ডাল থেকে ও ডালে তিড়িং তিড়িং করে লাফায় আর কিচির মিচির করে। তবে বড় ঝাঁক থাকলে এক গুলিতে আমার মতো শিকারিও তিন-চারটে ফেলে দিত। পাখিগুলোর ঘন সবুজ রঙ। বুকের কাছে যেন একটু হলদেটে সাদা। মাংস ভারী ভাল। আর আমার জুম্মান যা রোস্ট বানাত, সে কী বলব।

বন্দুকের ফাঁকা টোটার বারুদের গন্ধ শুকতে ভাল লাগত, মরা পাখির ঝপ করে গাছ থেকে পড়ার আওয়াজ ভাল লাগত। বুঝতে পারতাম যে, আরও কিছুদিন থাকলে আকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া যশোয়ন্তের সঙ্গে প্রকৃতিগত পার্থক্য বলে কিছু থাকবে না। যাকে একদিন ঘৃণাও করতাম, সেই জংলির সঙ্গে একেবারেই একাত্ম হয়ে যাব।

যশোয়ন্ত চলে যাবার পরই আমার বাংলোর পেছনের পুটুস-ঝোপে একটি বড় খরগোশ মেরে তাকে যশোয়ন্তের মতো বাঁশ-পোড়া করে খেয়েছি। এমনি করে খরগোশের মাংসে যে একটা মেটে মেটে আঁশটে গন্ধ থাকে, সেটা এভাবে রান্না করলে একেবারে থাকে না। গুরুর অবর্তমানে আমি নিজের চেষ্টায় যে কতদূর এগিয়ে গেছি, ভাবলে নিজেরই আশ্চর্য লাগে। গুরু কবে ফিরবে এবং তাকে এসব গল্প করব, সেই ভাবনায় বিহ্বল হয়ে আছি।

শুয়োর মারতে পারমিট লাগে না। বছরের সব সময়েই মারা চলে। সেই জন্যেই তো এত বিপত্তি। ইতিমধ্যে আবার একজন লোককে ওই নয়া তালাওর কাছে শুয়োর ফেঁড়েছে। কাল আবারও এসে টাবড় বলল। বললাম, তুমি নিজে গিয়ে মারছ না কেন টাবড়? টাবড় বলল, আমার বন্দুক বিগড়ে আছে। ঘোড়াটা ঠিকমতো পড়ে না। তাই ওরকম বন্দুক নিয়ে অতবড় দাঁতাল শুয়োরের সামনে যেতে ভরসা পাই না। ভাবলাম, আমার বন্দুকটা টাবড়কে দিয়ে দিলেই তো কার্যসমাধা হয়, কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল যশোয়ন্তের কথা। কলকাতার শিকারিরা এখানে এসে তাস খেলে আর বিয়ার খায়, এবং তাদের বন্দুক নিয়ে জংলি শিকারিরা শিকার করে। তারপর সেইসব জানোয়ারের চামড়া মাংস কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নিজেরা মেরেছে বলে জাহির করে, আর ড্রইংরুমে বসে

ন্যাকা মেয়েদের কাছে রোমহর্ষক শিকারের গল্প করে। সুন্দরী মেয়েরা শোনে, আর উঃ, আঃ, উম—ম—ম—ম্ ইত্যাদি নানারকম গা-শিরশিরানো আওয়াজ করে।

অতএব বন্দুক দেওয়া যাবে না।

টাবড়কে বললাম, তবে চলো, কালই যাওয়া যাবে।

সকালে যশোয়ন্তের চিঠি এল হাজারিবাগের ছাপ মারা। লিখেছে, মায়ের নিউমোনিয়া হয়েছে। আরও সাত দিনের আগে আসতে পারছে না। একটু সুস্থ করে আসবে। আমি যেন অবশ্য অবশ্যই একদিন নাইহারে গিয়ে ওর বাংলোর তত্ত্ব-তল্লাশ করে ওর চাকরকে কিছু নির্দেশাদি দিয়ে আসি। খবর অবশ্য ওর অফিস থেকেও দেবে। তা ছাড়া দু' রকম শম্বরের মাংসের আচার তৈরি করে রেখেছে ও। তারই একরকম যেন আমি নিয়ে আসি এবং অন্য রকম আচারটা যেন ঘোষদা সুমিতাবউদিকে ডালটনগঞ্জে পৌঁছে দিই। চাকরটা ওর ভাল্লুকের বাচ্চাটার ঠিকমতো যত্নআত্তি করছে কিনা তাও যেন দেখে আসি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যেতে হবে একদিন যশোয়ন্তের নাইহারে। আগে কখনও যাইনি।

বেলা থাকতে থাকতে টাবড় এসে পোঁছাল। বলল, চালিয়ে হুজৌর, আভ্‌ভি চল দেনেসে সামকো পইলে পইলে পোঁছ যাইয়েগা।

আমি বললাম, এত তাড়াতাড়ির কী। জিপ নিয়ে গেলেই তো হবে। পরেই যাব।

টাবড় একগাল হেসে বলল, তুহর জ্িপোয়া না যালথু।

ভাবলাম, এমনই অগম্য জায়গা!

দুটো পৌনে তিন ইঞ্চি অ্যালফাম্যাক্স এল. জি এবং দুটি স্ফেরিক্যাল বল নিয়ে টাবড়ের সঙ্গে বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হলাম। টাবড় নিজের বন্দুকটাও নিয়েছে। দেগে তো দেবে, তারপর ফুটুক চাই না ফুটুক। আমি হেন বড় শিকারি তো আছিই। সঙ্গে চওথা বলে সুহাগী গ্রামের আর এক বুড়ো চলল, কাঁধে একটা ঝকঝকে টাঙ্গি নিয়ে।

শেষ বিকেলের সোনালি আলো বর্ষার চকচকে বন জঙ্গলে ঝিকমিক করছে। আমার বাংলো থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে রাস্তাটা বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। রোদ এসে পড়েছে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে। ধান হয়েছে জায়গায় জায়গায়। গাছের গোড়াগুলোতে একটু-আধটু জলও রয়েছে কোথায়ও কোথায়ও। পাহাড়ের ঢালের গায়ে খাঁজ কেটেও ফসল ফলিয়েছে ওরা।

পথে এক জায়গায় একসঙ্গে প্রায় একশো-দেড়শো বিঘা জায়গা নিয়ে আম বাগান। ডালটনগঞ্জের কোন জমিদার নাকি এখানে শখ করে আম লাগিয়েছিলেন। এখানের আমে পোকা হয় বেশ। গরমের দিনে ভাল্লুকের এটা একটা আড্ডাখানা হয়ে ওঠে সন্ধের পর। নয়া তালাও থেকে ফেরার মুখে কত লোক যে এই পথে এইখানে ভাল্লুকের মুখে পড়েছে, তার লেখাজোখা নেই।

'আভভি বাৎচিৎ বিলকুল বন্ধ হুজৌর। হামলোঁগ পৌঁছচ চুকে হে' বলল টাবড়।

অস্তগামী সূর্যের বিষণ্ণ আলোয় নয়া তালাওর উঁচু বাঁধ দেখা যাচ্ছিল। এক ঝাঁক হুইস্‌লিং টিল চক্রাকারে তালাওর উপর উড়ছিল শিস দিতে দিতে। একটি ধূসর জাঙ্গিল মন্থর ডানায় উড়ে চলেছিল রুমান্ডির দিকে।

তালাওটি খুব যে বড়, তা নয়। বর্ষার ঘোলা জলে ভরা। অনেকগুলো নালা এতে পাহাড়ের এদিক-ওদিক থেকে এসে মিশেছে। মধ্যেকার জল অপেক্ষাকৃত কম ঘোলা।

পাশে পাশে নানা রকম জলজ উদ্ভিদ আছে। শরবনের মতো ছিপছিপে ডাঁটা গাছ,স্পাইডার লিলির মতো ছোট ছোট ফুল; হিঞ্চে কলমির মতো অনেক নাম-না- জানা শাক। অনেক রঙের।

তালাওর একটা পাশে আগাগোড়া শটি আর কচু লাগানো। টাবড় দেখাল, শুয়োরের দল গর্ত করে আর সেগুলো লাট করে আর কিছু বাকি রাখেনি। কচুবন আর শটিবনের গা ঘেঁষে বিরাট একটা বাজপড়া বট গাছ। আসন্ন সন্ধ্যার রক্তিম আকাশের পটভূমিতে প্রেতাত্মার মতো অসংলগ্ন ভঙ্গিতে আকাশের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি আর টাবড় সেই গাছের গোড়ার ফোকরের মধ্যে ঢুকে বসলাম। প্রায় মাটির সমান্তরালে। বসবার আগে, টাবড় পাথর ছুঁড়ে তার ভিতরের শঙ্খচূড় কি গোখরো সাপ যে নেই, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল। চওথা বুড়োকে টাবড় তালাওর অন্য পারে পাঠাল। ওদিকের জঙ্গলের ভিতর কোনও গাছে উঠে বসে থাকতে বলল। গুলির শব্দ শুনলে যেন আসে।

একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। সোঁদা মাটির গন্ধ উঠছে চারদিক থেকে। চারদিকে এমন একটা বিষণ্ণ শান্তি, এমন একটা অপার্থিবতা যে, কী বলব। শাল সেগুনের চারারা বর্ষার জলে একেবারে সতেজ সরল হয়ে পত্রপল্লব বিস্তার করেছে। একটা টি-টি পাখি, কোথা থেকে উড়ে এসে বেশ কিছুক্ষণ টিটিরটি-টিটিরটি করে জলের ধারে-ধারে ডেকে বেড়াল। তারপর হঠাৎই ডুবন্ত সূর্যটাকে যেন ধাওয়া করে গিয়ে জঙ্গলের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার। তবে শুক্লপক্ষ ছাড়া জঙ্গলে কখনও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হয় না। বিশেষ করে জলের পাশে থাকলে তো অন্ধকার বলে মনেই হয় না। তা ছাড়া আজ অষ্টমী কি নবমী হবে। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই এখানে যা চোখে পড়ে, তা হচ্ছে সন্ধেতারা। অমন শান্তিতে ভরা, পান্নার মতো সবুজ, কান্নার মতো টলটলে তারা বুঝি আর নেই। দপ-দপ করে জ্বলবে। নিঃশব্দে কত কী কথা বলবে হাওয়ার সঙ্গে, বনের সঙ্গে। জলের পাশে কটকটে ব্যাঙগুলো ডাকতে লাগল কটর-কটর করে। ওপাশের জঙ্গল থেকে একটা হায়না বিকট অট্টহাসি হেসে উঠল। হঠাৎ আধো-অন্ধকারে দেখলাম, এক জোড়া অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো শেয়াল আমাদের থেকে বড়-জোর তিরিশ গজ দূরে চকচক করে জল খাচ্ছে। নিস্তব্ধ জলে সন্ধ্যাতারার ছায়াটা এতক্ষণ নিষ্কম্প ছিল; এখন জলে ঢেউ লাগতে, কাঁপতে কাঁপতে সবুজ ছায়াটা তালাওর মধ্যে চলে গেল।

এ জঙ্গলে অ্যালসেশিয়ান কুকুর কোত্থেকে আসবে? নিশ্চয়ই শিয়াল।

জল খেয়ে শিয়াল দুটো চলে গেলে টাবড় ফিসফিসিয়ে কানে-কানে বলল, ডবল সাইজকা থা হুজৌর।

আমি শুধোলাম, ক্যা থা?

ও বলল, হুন্ডার। অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।

আমি বললাম, ওগুলো যে নেকড়ে, তা আগে বললে না কেন? মারতাম।

টাবড় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'ছোড়িয়ে! উ মারকে ক্যা হোগা? দোগো শূয়ার পিটা দিজিয়ে, খানেমে মজা আয়গা।'

রাত প্রায় এক প্রহর হল। বেশ মশা। হাওয়ার বেগটা একটু কম হলেই মশার প্রকোপ বাড়ে। শুয়োরের বাচ্চাদের পাত্তা নেই। অন্ধকারে কচু গাছগুলোকে শুয়োর কল্পনা করে

করে চোখে ব্যথা ধরে গেল। এমন সময় আমাদের পেছনে জঙ্গলের দিকে মাটিতে ঘৃণায় পদাঘাত করলে যেমন শব্দ হয়, তেমন আওয়াজ হল এবং একাধিক শক্ত পায়ের পদধ্বনি ভেসে এল।

টাবড় আমার গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে হুঁশিয়ার করে দিল। দেখতে-দেখতে প্রায় গাধার সমান উঁচু একটা দাঁতওয়ালা শুয়োর আমাদের সামনে বেরিয়ে এল জঙ্গল ছেড়ে। মাঝে-মাঝে থেমে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে এমন জোরে জোরে মাটিতে পদাঘাত করতে লাগল যে বলবার নয়। ফুলঝুরির মতো চারিদিকে ছিটকে পড়তে লাগল সেই মাটির গুঁড়ো।

শুয়োরের চেহারা দেখে আমার বড়ই ভয় হল। আমরা প্রায় মাটির সমান্তরালে বসে থাকাতে শুয়োরটাকে আরও বেশি বড় বলে মনে হচ্ছিল। তার পেছনে আরও চার-পাঁচটি শুয়োর দেখা গেল।

বড় শুয়োরটা আমাদের দিকে কোনাকুনি করে একবার দাঁড়াল। কানটা দেখা যাচ্ছে। ধীরে-ধীরে পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে। পাশ থেকে। ভাবলাম এই মাহেন্দ্রক্ষণ। তারপর, গুরু যশোয়ন্তের নাম স্মরণ করে বন্দুক তুলে, বন্দুকের সঙ্গে ক্ল্যাম্পে লাগানো টর্চের বোতাম টিপেই ঘোড়া টেনে দিলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে ধপ করে একটা আওয়াজ এবং গগন-নিনাদি এমন চিৎকার হল যে, বলার নয়। সেই চিৎকার চারিদিকের জলে জঙ্গলে পাহাড়ে বনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল। সবিস্ময়ে ও সভয়ে দেখলাম যে, বড় দাঁতাল শুয়োরটি পড়ে গেছে মাটিতে এবং অন্য শুয়োরগুলো 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলে তেড়ে ছুটছে জঙ্গলমুখো।

বেশ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে ফোকর থেকে বেরিয়ে টাবড়ের সঙ্গে কথা বলতে যাব, এমন সময় অতর্কিতে সেই সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্কের মতো শুয়োর নিজ-চেষ্টায় অধঃপতিত অবস্থা থেকে উত্থিত হয়ে, প্রায় হাওয়ায় উড়ে আমাদের দিকে তেড়ে এল। সে যে কী ভয়াবহ দৃশ্য, তা কল্পনা করা যায় না। প্রথমেই মনে হল, বন্দুকটা ফেলে দৌড়ে প্রাণ নিয়ে পালাই। কিন্তু সে সময়ই বা কোথায়? আমার এই মুহূর্তের চিন্তার মধ্যেই কানের পাশে কামান দাগার মতো একটা শব্দ হল। 'বাবা-গো' বলে ধপ করে বসে পড়লাম।

বেঁচে আছি যে, বুঝলাম সে সময়েই—যখন আমাদের পায়ের কাছে এসে এত বড় বরাহ-বাবাজি হুড়মুড়িয়ে মাটি ছিটকিয়ে গুচ্ছের কচু গাছ ভেঙে ধপাস করে আছড়ে পড়ল।

টাবড় বত্রিশ পাটি বিগলিত হয়ে বলল, 'তুহর হাত তো বঁড়িয়া বা, একদ্দম কানপট্টিয়ামে লাগলথু।'

শুয়োরটার দাঁতটি বেশ বড়। দেখলে ভয় লাগে।

টাবড় শুয়োরটার কাঁধে উল্টো মুখে ঘোড়ার মতো বসে লেজটাকে আঙুলে তুলে উঁচু করে দেখাল। বেশ কালো পুরুষ্টু লেজ। ডগার দিকে খোঁচা-খোঁচা, বিচ্ছিরি দেখতে লোমের গুচ্ছ। টাবড় বুনো শুয়োর আর পোষা শুয়োরের পার্থক্য বোঝাল। পোষা শুয়োরের লেজ শোয়ানো থাকে আর জংলি শুয়োরের লেজ একটি জাজ্জ্বল্যমান দুর্বিনয়ের প্রতীকের মতো উত্তুঙ্গ হয়ে শোভা পায়।

আমরা কথা বলতে বলতে চওথা বুড়ো অন্ধকারে টাঙ্গি ঘোরাতে ঘোরাতে কারিয়া-পিরেতের মতো জঙ্গল ফুঁড়ে বেরুল। শুয়োরটাকে দেখে তার সে কী আনন্দ। শুয়োরের মুখটাকে দু'হাতের পাতার মধ্যে নিয়ে প্রেমিক যেমন প্রেমিকাকে আদর করে, সে ঠিক তেমনিভাবে আদর করে দিল।

এখানে মুচুকরানির যা বিয়ে দেখেছি, তা ভোলবার নয়। এখনও যে হয় না তা নয়, তবে সেই প্রাণ আর নেই।

কীরকম?

দেখতাম, বছরে তিনবার করে বিয়ে হত। ওই বহুরাজ পাহাড়ের ওপারে জুডুয়াহার গ্রাম। গ্রামের লোকেরা ভোরবেলা স্নান সেরে একটি দোলানী সুরের গান গাইতে গাইতে বহুরাজ পাহাড়ে উঠত। সঙ্গে উক্কামন্দ্ গ্রামের লোকেরাও জুটত। তারা হচ্ছে মুচুকরানির বাবার গ্রামের লোক। সেই দোলানী গানের সুর এখনও কানে ভাসে আমার। পাহাড়ে পাহাড়ে কেঁপে কেঁপে সকালের রোদ্দুরে সেই গান আমাদের শিরিণবুরুতে এসে পৌঁছত। ওরা গাইতে গাইতে বহুরাজ পাহাড়ের মাথায় উঠে যেত। ওই পাহাড়েরই গুহায় মুচুকরানির বাস। মুচুকরানির ছোট সুডৌল সিঁদুরচর্চিত মূর্তিখানি পুরোহিত নামিয়ে আনতেন। রানির মাথায় এক ফালি তসর সিল্কের পট্টি জড়িয়ে দেওয়া হত—বসানো হত একটি নতুন দোহরের উপর। তারপর একটি বাঁশের পালকিতে রানিকে চড়িয়ে তারা নেমে আসত পাহাড় বেয়ে।

পুরোহিত সবচেয়ে আগে নামতেন, নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে। রানিকে এনে একটি বিরাট বটগাছের তলায় রাখা হত জুডুয়াহারে। সেখান থেকে বরের বাড়ি উক্কামন্দে রওনা হত কনেযাত্রীরা রানিকে নিয়ে। উক্কামন্দে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপহার সামগ্রী এসে পৌঁছাত মুচুকরানির সামনে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কৌতূহলী চোখে চেয়ে থাকত। আমরাও যেতাম। বাবা আমাদের বহুবার নিয়ে গেছেন দেখতে। মারিয়ানা থেমে গেল, বলল, আর শুনতে আপনার ভাল লাগবে?

আমি বললাম, দারুণ লাগছে, প্লিজ বলুন।

উক্কামন্দের কণাদি পাহাড়ে থাকতেন মুচুকরানির বর। বরের বর্গ হচ্ছে অগোরা। তারপর সেই বটগাছের তলা থেকে আবার নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে ওরা সকলে উঠতো কণাদি পাহাড়ে। বরের গুহায় পৌঁছবার জন্য।

প্রবাদ ছিল যে, কণাদি পাহাড়ের সেই গুহার নাকি তল নেই। সমস্ত পাহাড়টারই নাকি মাঝখানে ফাঁপা। সুড়ঙ্গ নেমে গেছে কত যে নীচে, তার খোঁজ কেউ রাখে না। সেখানে পৌঁছে মুচুকরানিকে আবার পূজা দিয়ে পালকি থেকে নামানো হত। তারপর বর যেখানে বসে থাকতেন, গুহার ভেতরে একটি পাথরের খাঁজে, সেখানে তাঁকে বরের পাশে রেখে আসা হত। পুরোহিত একটি বড় পাথর নিয়ে সেই গুহায় গড়িয়ে দিতেন। সেই অতল গুহাতে পাথরটি ধাক্কা খেতে খেতে শব্দ করে গড়িয়ে চলত নীচে। তখন বাইরে সমবেত গ্রামবাসী নিঃশব্দে ও সভয়ে দাঁড়িয়ে সেই শব্দ শুনত।

গুহাটি এতই গভীর ছিল যে, বহুক্ষণ পর্যন্ত ওই শব্দ শোনা যেত। তারপর সব স্তব্ধ হয়ে গেলে, মনে করা হত যে, মুচুকরানি ও তার অগোরা বরের শুভবিবাহ সম্পন্ন হল। তখন ওরা সবাই আনন্দ করতে করতে পাহাড় থেকে নেমে আসত এবং সন্ধেবেলায় নেচে-গেয়ে বিবাহ উৎসব শেষ করত।

এই অবধি বলে মারিয়ানা চুপ করল।

মনে হল, মারিয়ানার গল্প যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। ওই জুড়ুয়াহার গ্রামের খাঁরওয়ারদের সঙ্গে আমিও যেন মারিয়ানার মতো কোনওদিন মুচুকরানির বিয়েতে উপস্থিত ছিলাম। চোখের সামনে সব যেন সত্যি হয়ে উঠেছিল ওর গল্প শুনতে শুনতে।

এক সময় দেখতে দেখতে সন্ধে নেমে এল। সন্ধে হবার প্রায় পরেই মারিয়ানার বাংলোর গেট পেরিয়ে দু'জন চারজন করে মেয়ে-পুরুষ এসে জুটতে লাগল। বাংলোর হাতার পেছনে ও-পাশের খাদের দিকে একটা ঝাঁকড়া চেরি গাছের তলায় আগুনের ব্যবস্থা করা হয়েছে দেখলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে। শেষ বিকেল থেকেই। তবে দমকা হাওয়াটা নানা রকম মিষ্টি সুবাস খাদ থেকে বয়ে এনে সমস্ত বাগানে উথাল-পাথাল করছে। আমরা একে একে জড়ো হলাম সেই গাছের নীচে। মারিয়ানা বেতের চেয়ার পাতিয়ে দিয়েছে। আগুনটাও বেশ গনগনে হয়ে উঠেছে। আমরা একেবারে ভি-আই-পি ট্রিটমেন্ট পাচ্ছি। সকলেই বেশ আরামে বসে নাচ দেখার জন্যে তৈরি।

যশোয়ন্ত ওদের সঙ্গে নাচবে। ছেলেরা ও মেয়েরা সামনি-সামনি এক লাইনে দাঁড়াল। মেয়েদের পরনে শুধু শাড়ি। বুকের ওপর দিয়ে ঘোরানো। হাঁটুর নিচ অবধি শাড়ি। বেশির ভাগই সাদা হাতে-বোনা মোটা পাড়ের শাড়ি। লাল এবং সবুজ পাড়ই বেশি। মাথার চুলে ভাল করে তেল মেখেছে। ঘাড়ের এক পাশে হেলিয়ে খোঁপা বেঁধেছে। খোঁপায় নানা রকমের ফুল গুঁজেছে প্রত্যেকে। জংলি মেয়েদের গায়ে বাঘের গায়ের মতো কেমন যেন একটি নিজস্ব গন্ধ আছে। তেলের গন্ধ, চুলের গন্ধ, শারীরিক পরিশ্রমজনিত ঘামের গন্ধ, সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা বিজাতীয় ভাব। ওদের দূর থেকে দেখতে ভাল লাগে, মনে মনে কল্পনায় আদর করতে ভাল লাগে, কিন্তু ওদের কাছে গেলে, তখন ওরা যতই আমন্ত্রণী হাসি হাসুক না কেন, কেমন গা রি-রি করে। কেন হয়, জানি না।

যশোয়ন্তের কিন্তু ও-সব কোনও সংস্কার নেই। মনে-প্রাণে জংলি ও। সত্যি সত্যিই জংলি—সেটা ওর মুখোশ নয়।

একটি ভারী আমেজ-ভরা ঘুমপাড়ানি গানের সঙ্গে সঙ্গে ওরা নাচ আরম্ভ করল। ছেলেরা ও মেয়েরা একেবারে একে অন্যের কাছে চলে আসছে। আগুনের আভায় মেয়েদের মুখের লজ্জা ঢাকা থাকছে না। ছেলেরা দুষ্টুমিভরা চোখে হাসছে।

ওরা দুলে দুলে গান গাইছে, মাথা হেলাচ্ছে, ভঙ্গুর গ্রীবা-ভঙ্গিমায় গুনগুনিয়ে গাইছে।

দেখতে দেখতে সমস্ত জায়গাটার যেন চেহারা পালটে গেল। মাদলগুলো হয়ে উঠল পাগল। পায়ের তালে তালে, কোমর দোলানোর ছন্দে, আঁখির ঠারে ঠারে ওরা নাচতে লাগল।

যশোয়ন্ত কিন্তু ওর অলিভ গ্রিন ট্রাউজার ছেড়ে ওদের মতো ধুতি পরেছে। ও যে কতখানি সুপুরুষ, তা ওই ওঁরাও যুবকদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পটভূমিতেও প্রতীয়মান হচ্ছে। পায়ের মাংসপেশী থেকে আরম্ভ করে গ্রীবার গড়ন পর্যন্ত কোনও জায়গায় কোনও অসঙ্গতি নেই। যৌবনের চিকন চিতাবাঘের মতো ও সর্পিণী মেয়েগুলোর সঙ্গে নাচছে।

মারিয়ানা কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে গানের মানে বলছিল, এই নাচের নাম ভেজ্জা নাচ। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে এভাবে নাচলেই তাকে ভেজ্জা নাচ বলে। যে গানটি ওরা আজ গাইছে তার মানে হল:

এই দাদা, তুই আমাকে জামপাতা এনে দিলে,
তোর সঙ্গে আমি ভেজ্জা নাচব;
কানে জামপাতা পরব।
যদি আনিস্, তবে তোর সঙ্গে ভেজ্জা নাচব;
নিশ্চয় আনিস কিন্তুরে দাদা।
ঈস খারাপ।

ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা একসঙ্গে নাচে,
ঈস কী খারাপ—
যখন ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে নাচে,
তখন নাচতে নাচতে ভোর হয়ে এলে,
ছেলেদের কক্ষনও বিশ্বাস করতে নেই।
এই জুড়ি, অসভ্য!
আমার গা থেকে হাত সরাও না,
দেখছ না। নাচতে নাচতে আমার শাড়ি আলগা হয়ে গেছে!
তাই হোক, আলগা হয়ে খুলে পড়ুক,
নাচের সময় তো শেষই হয়ে এল।

ধীরে ধীরে নাচের বেগ আরও দ্রুত হতে লাগল। তারপর, সেই বর্ষণসিক্ত হিমেল রাতকে আর চেনা গেল না। মনে হতে লাগল, এ এক আলাদা রাত—অন্য কোন পৃথিবীর প্রাণের গল্প নিয়ে পিদিম জ্বেলে এ-রাত আমাদের জন্যে অনেক আনন্দের পশরা সাজিয়ে এনেছে।

"...ঈস কী খারাপ—ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে নাচে। ঈস কী খারাপ...। এই দাদা জামপাতা এনে দিবি? এই দাদা জামপাতা এনে দিবি?"

নাচে গানে মিলে, ছেলে-মেয়েদের মুখভরা হাসি আর চোখভরা প্রাঞ্জলতায় কেমন যেন নেশার মতো হয়েছিল। নেশায় বুঁদ হয়েছিলাম। এমন সময় ফটাং করে একটি বেরসিক আওয়াজ হল। যশোয়ন্ত নাচ ছেড়ে দৌড়ে এল। দৌড়ে এসে আগুন থেকে বাঁশের টুকরোটা বের করল। ওখানেই বেতের চেয়ারে বসে আমরা বাঁশ-পোড়া খেলাম। সত্যি! কোথায় লাগে কাবাব। জিভে দিতে না দিতে গলে যায়। দারুণ!

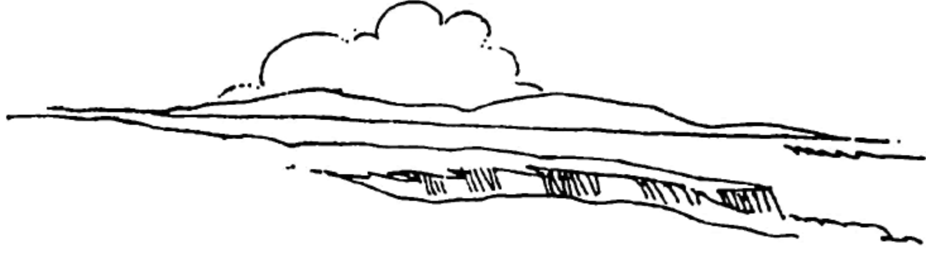
নাচ চলল প্রায় রাত ন'টা অবধি। এ নাচ তো আমাদের দেখানোর জন্যে। ওরা যখন গাঁয়ের মধ্যে সত্যি ভেজ্জা নাচে, তখন সারারাত তো বটেই, সকালের দু এক প্রহর অবধি নাচ গড়ায়।

চমৎকার কাটল সন্ধেটা। রুমান্ডির একাকিত্বে অভ্যস্ত মনটা অনেকদিন পর এত লোক, এত নাচ, এত হইচই দেখে আনন্দে চমকে চমকে উঠল।

সুমিতাবউদি যশোয়ন্তের শিরিণবুরুর প্রেয়সীকে ওঁর একটি শান্তিনিকেতনী ফুল-তোলা কাপড়ের শাল দিলেন। মেয়েটা হাসতেও পারে। বসন্তকালের হাওয়ায় দোলা-লাগা মাধবীলতার মতো কেবলই নুয়ে নুয়ে হাসে, পুষ্পভারাবনত স্তবকের মতো শরীরটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাসে।

যশোয়ন্ত আমাকে ফিসফিসিয়ে বলল, কী লালসাহেব, হরিণটা মারার জন্যে আমাকে ক্ষমা করেছ তো? বলো, একটি বীভৎস দৃশ্যের বিনিময়ে এতগুলো আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখতে পেলে কি না? ওরা বছরে ভাত এবং মাংস যে ক'বার খায়, তা গুনে বলা যায়।

সত্যি সত্যি ক্ষমা করতে পারলাম কি না জানি না, তবু মনে হল যশোয়ন্তই ঠিক। ওকে যেমন করে বলেছিলাম সকালে, তেমন করে বলা ঠিক হয়নি। তবে এটুকু বুঝলাম যে, সেই সকালের মৃত হরিণের রক্তাক্ত দুঃখে যদি কোনও ফাঁকি না থেকে থাকে, এদের আজকের সন্ধ্যার আনন্দেও কোনও ফাঁকি নেই।



নয়

ফিরে এসে রুমান্ডিতে আবার বেশ গুছিয়ে বসেছি। তবে আমরা এখান থেকে ফেরার পরদিনই যশোয়ন্ত টেলিগ্রাম পেল। ওর মার স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ঘটেছে। সুতরাং ওর চলে যেতে হল হাজারিবাগ। দেখতে দেখতে তিনটে দিনও কেটে গেল। অথচ কোনও খবর পাঠাল না। বেশ চিন্তায় আছি।

এদিকে কোয়েলে ঢল নেমেছে। অনেক মাছ ধরা পড়েছে। বাগেচম্পা থেকে প্রায়ই নানারকম ছোট বড় মাছ ধরে গ্রামের লোকেরা আমার জন্যে পাঠায়। দাম দিই। খুশি হয়ে নেয়। পাহাড়ি নদীর মাছের বড় স্বাদ।

টাবড়কে সেই যে বলেছিলাম শিকারে যাবার কথা, তা সে মনে করে রেখেছে। শিরিণবুরু থেকে ফিরে আসার পর থেকেই বার বার আমাকে বলছে, চালিয়ে হুজৌর, এক রোজ বরহা মারকে আঁয়ে।

গাঁয়ের লোকেরা শুয়োর বড় আনন্দ করে খায়। কিন্তু এদিকে আমার গুরু তো হাজারিবাগে। গুরু ছাড়া শিকারে যাই-ই বা কী করে। শেষে একদিন না থাকতে পেরে বলেই ফেললাম, যশোয়ন্ত না থাকলে শিকারে যেতে আমার ভয় করে। টাবড় তো হেসেই বাঁচে না। বলে, যশোয়ন্তবাবু বড় শিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তা বলে টাবড়ই বা কম কীসে? তার এই মুঙ্গেরি গাদা বন্দুক দিয়ে সে মারেনি এমন জানোয়ার তো নেই জঙ্গলে, এক হাতি ছাড়া।

ভাবলাম, যাব তো শুয়োর মারতেই, ভয়ের কী? সে কথাটা কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে বলতেই, বুড়ো তো মারে আর কী। বলে, 'বরহা কৌন্‌সা ছোটা জানোয়ার হ্যায়'! শুয়োরকে ওরা বাঘের চেয়ে কম ভয় করে না। শুয়োর আর ভাল্লুক নাকি ওদের সব চাইতে বড় শত্রু। বিনা প্ররোচনায়, বিনা কারণে এরা যখন তখন আক্রমণ করে বসে। তাড়া করে মাটিতে ফেলে, মানুষের উরু থেকে আরম্ভ করে সোজা পেট অবধি ধারালো দাঁতে চিরে ফালা ফালা করে দেয় শুয়োর। সেরকমভাবে শুয়োর চিরলে মানুষকে বাঁচানোই মুশকিল হয়! আর ভাল্লুক তো আরও ভাল। যখন দয়া করে প্রাণে না মারে, তখন সে এক থাবলায় হয় কান, নয় ঠোঁট, নাক ইত্যাদি খুবলে নেয়। তাছাড়া নখ দিয়েও একেবারে ফালা ফালা করে দেয়।

এতদিনে বুঝলাম, এই জঙ্গলে পাহাড়ে, যেসব ভয়াবহ বিকৃত মূর্তি দেখি রাতে, যাদের আধো অন্ধকারে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠতাম প্রথম প্রথম, তারা সবাই ভাল্লুক-কবলিত হতভাগ্য মানুষ।

জানি না, কত দিন, আর কত দিন, যশোয়ন্তের কাছে শিকার করার বিপক্ষে বক্তৃতা করতে পারব। আমার বক্তব্যই ঠিক, কিংবা যশোয়ন্ত এবং যশোয়ন্তের সাগরেদ এই টাবড়, চওথা, এদের সকলের সরব ও নীরব বক্তব্যই ঠিক, তা নিয়ে ভাববার অবকাশ ঘটেছে। সেই শিরশিরে হাওয়ায়, নয়াতালাওর ধারে, মৃত শুয়োরের পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হল; আজ থেকে ক' মাস আগে যে শহুরে ছেলেটি রুমাণ্ডি-র বাংলোয় এসে জিপ থেকে নেমেছিল, সেই ছেলেটিতে এবং আজকের আমি-তে যেন বেশ অনেকখানি ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে। তাকে যেন পুরোপুরি খুঁজে পাচ্ছি না আজকের আমার মধ্যে।

ভাল-মন্দ বিচার করবার যোগ্যতা বা ইচ্ছা আমার নেই। যশোয়ন্তের জীবনই ভাল, না যে-জীবনে আমি কলকাতায় অভ্যস্ত ছিলাম, সেই জীবনই ভাল, তার উত্তরও আমার কাছে নেই। শুধু বুঝতে পারছি যে, একটি জীবনের মধ্যে দিয়ে এসেছি এবং অন্য এক জীবনের চৌকাঠ মাড়িয়ে তাতে প্রবেশ করেছি। ভাল করলাম কি মন্দ করলাম; জানি না।



দশ

নইহারে ছোট্ট অফিস। তার পাশে রেঞ্জারের কাঠের দোতলা বাংলো। রাস্তার বিপরীত দিকে অনেকখানি ধূ-ধূ মাঠ—ওরা বলে টাঁড়। যশোয়ন্ত বলে বিশ্ব-টাঁড় জায়গা। কোনও নির্জন স্থান বোঝাতে হলেই যশোয়ন্ত এই কথাটা ব্যবহার করে।

একতলায় বসবার ঘর একটি—তাতে হাতির পায়ের টিপয়, বাঘের চামড়ার গালচে, মোটা সেগুন গাছের গুঁড়ির মোড়া, টেবলের উপর ব্যাম্বুসা আরডেনেসিয়ার ফুলদানিতে একগুচ্ছ ফিকে, হালকা-রং নাম-না-জানা ফুল। দেওয়ালে টাঙানো বাইসনের মাথা, ভাল্লুকের মুখ, শম্বরের শিং, বুনো-মোষের শিং, দরজার সামনে চামড়ার পাপোষ এবং আরও কত কী। ঘরের বাইরে একপাশে একটি নেয়ারের চৌপাই—তার উপরে একটি চিতল হরিণের চামড়া বিছানো।

ঘরে ঢোকার আগেই চোখে পড়ল যে, ছোট ছেলেরা যেমন করে বাতাবি লেবু দিয়ে ফুটবল খেলে, তেমনি করে একটা ভাল্লুকের গাবলু-গুবলু কেলে-কুচকুচে বাচ্চাকে নিয়ে যশোয়ন্তের চাকর সামনের মাঠের করবী গাছগুলোর পাশে পাশে ফুটবল খেলছে।

তাকে কিছু বলার আগেই সে আমার কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ইসকো কুছভি তকলিফ নেই হো রহা হ্যায় হুজৌর—অ্যাইসেহি রোজ সুবে রেঞ্জার সাব ইসকা সাথ খেলতে হ্যায়।

আমি সভয়ে বললাম, এই কি খেলা?

ও বললে, হ্যাঁ।

বুঝলাম, যশোয়ন্ত নিশ্চয়ই বলেছে, ভাল্লুকরা খুব একসারসাইজ করনেওয়ালা জানোয়ার—বাড়িতে বেশিদিন বসে খেলে স্টিভেডরের বাড়ির মেয়েদের মতো নাদুস নুদুস হয়ে যাবে; সুতরাং রোজ সকালে উঠে গুনে গুনে ওকে পঞ্চাশবার লাথি মারবে। নইলে ওর গায়ে ব্যথা হবে। কিন্তু তারপর নিজের পায়ের ব্যথা সারাবার জন্যে বেচারা রমনলাল যে কুয়োতলায় বসে কাড়ুয়া তেল গরম করে পায়ে লাগাবে, এটা আর যশোয়ন্ত ভাবেনি হয়তো।

শোবার ঘরেও একটি নেওয়ারের খাট। তার উপরে ভাগলপুরি চাদর বিছানো। রাবারের একজোড়া বাথরুম স্লিপার। একজোড়া গামবুট। দেওয়ালের পাশে কাঠের স্ট্যান্ডে পর পর বন্দুক সাজানো। একটি বারো বোরের দোনলা বন্দুক, একটি ফোর-ফিফটি-ফোর হান্ড্রেড ডাবল ব্যারেল রাইফেল, অন্যটি থার্টি ও সিক্স ম্যানলিকার যা দিয়ে ও গাড়ুয়া-গুরাং-এর ঢালে হরিণ মেরেছিল। তা ছাড়া পয়েন্ট টু-টুও একটি।

জানালার পাশে একটি আয়না, তার নীচে একটি ব্রাশ এবং চিরুনি। কোনও রকম কসমেটিক বা আফটার-শেভ লোশান ইত্যাদি ব্যবহার করে না যশোয়ন্ত। আয়নার পাশে একটি কালীমায়ের ছবি। ছবির নীচে দু'টি শুকনো রক্তমুখী জবা।

যশোয়ন্তের ঘরটা ওর মনেরই প্রতীক। নিরাভরণ। বইপত্র ইত্যাদির বালাই নেই। দেওয়ালের মধ্যে একটি ছোট কুলুঙ্গীর মতো। তাতে নানা রঙের নানা সাইজের নির্জোষধির বোতল সাজানো।

ঘরের সংলগ্ন বাথরুম। কাঠের দরজা ঠেলে ঢুকলাম।

জানালা দিয়ে রাস্তাটা চোখে পড়ে। লাল ধুলোর রাস্তাটা সকালের রোদে শুয়ে আছে। ডাক-হরকরা চিঠির খয়েরি ঝুলি ঝুলিয়ে ধুলো উড়িয়ে সাইকেল চালিয়ে আসছে। বাথরুমের জানালায় শিক অথবা পরদা নেই। একটা বড় টার্কিশ তোয়ালে মেলা রয়েছে। মুখ-খোলা জবাকুসুমের শিশির গন্ধ ভুর-ভুর করছে। পরিষ্কার না-করা অবস্থায় সেফটি-রেজারটা পড়ে রয়েছে কাঠের বেসিনের উপর। সামনের দেওয়ালে-ঝোলানো আয়নাতে, নীচের লতানে-ফুলের ছাওয়া জানালায় বসে বড় বড় কামুক ঠোঁটে হাঁ করে যে দাঁড়কাকটা ডাকছে, তার ছায়া পড়েছে।

রেঞ্জ অফিসে নানান জায়গা থেকে ফরেস্ট গার্ডরা এসে হাফপ্যান্টের নীচে খাকি শার্ট গুঁজে হাত নেড়ে কী সব আলোচনা করছে। দু'-একজন ফরেস্ট বাবুও এসেছেন। যশোয়ন্তের ঘোড়া 'ভয়ংকর'কে আস্তাবলে সহিস দলাই-মলাই করছে। তার চটাং-ফটাং আওয়াজ ভেসে আসছে।

যশোয়ন্তের এই ছোট বাংলোয় বেশ কেমন একটা শান্ত তৃপ্তি আছে। বুদ্ধিমতী মধ্যবিত্ত মিষ্টি মেয়েদের মুখে যেমন দেখা যায়। যশোয়ন্ত যেন বুঝেছে সুখ কোথায় আছে। সুখকে যেন ও হাত দিয়ে ছুঁয়েছে—ছুঁয়ে, মুঠি ভরে, কারও মসৃণ স্তনের মতো নেড়ে-চেড়ে দেখেছে। ভরা-মুঠি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিজেকে টুকরো টুকরো করে দূরে ছুঁড়ে ফেলেনি। সে সুখ ও জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরেই পাক, কি হুইস্কির বোতল ছুঁয়েই পাক। কী করে যে সে পেয়েছে তা জানি না, কিন্তু ও সুখকে যে নিঃসন্দেহে পেয়েছে, তা আমি নিশ্চিত বুঝতে পাই।



এগারো

একদিন সন্ধ্যার মুখে মুখে নয়াতালাও থেকে একজোড়া হাঁস মেরে টাবড়ের সঙ্গে ফিরছি; অন্ধকার প্রায় হয়ে এসেছে। এমন সময় পথের পাশে একটি পত্র-বিরল নাম-না-জানা গাছে আকাশের পটভূমিতে দেখি স্পষ্ট হয়ে একটি হাঁসের মতো পাখি, গাছের প্রায় মগডালে বসে আছে।

পাখিটাকে হাঁসের মতো দেখতে, অথচ এ কেমন হাঁস? যে জল ছেড়ে রসিকতা করবার জন্য গাছের মগডালে বসে থাকে? তা ছাড়া, জোলো কোনও হাঁস গাছে বসে, এমন কথা তো শুনিনি।

আমি নতুন শিকারি। বাছ-বিচার পরে করি। গুলি করি, পাখি মাটিতে পড়ুক, তারপর চেনা যাবে কী পাখি এবং আদপে পাখি কি না।

গুলি করলাম।

ওঃ, আজকাল যা মারছি, সে কী বলব। একেবারে গুরুর মতন। গোলি অন্দর জান বাহার, একদ্দম্ সাথে সাথ।

লদলদিয়ে পড়ল পাখিটা নীচে। এ যে দেখি, হাঁসেরই মতো। জোড়া ঠোঁট, জোড়া পা। আশ্চর্য।

বাংলোর হাতায় ঢুকেই দেখলাম, যশোয়ন্ত বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে।

কখন এলে? কবে এলে? বলে ওকে আপ্যায়ণ করতে না করতে ও টাবড়ের হাতে ঝোলানো পাখিটাকে দেখে আমার দিকে চোখ কটমটিয়ে বলল, ও পাখিটা মারলে কেন? এটা কী পাখি জানো?

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, না তো জানি না।

যশোয়ন্ত বেশ রাগ-রাগ গলায় বলল, কী পাখি জানো না, ফটাস করে মেরে দিলে? এক রকমের wood-duck। অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য পাখি। একে আমি আজ দু' মাস হল লক্ষ করছি—ভাবছিলাম অন্য কোথা থেকে আর একটা উড়ে এলে আমার রেঞ্জে একজোড়া পাখি হবে। আর তুমি মেরে বসলে পাখটাকে?

টাবড়কে খুব ধমকাল যশোয়ন্ত। আমাকে মারতে বারণ করেনি বলে। মানে, ঝিকে মেরে বউকে শেখানো। তারপর বেশ বিরক্তির সুরে, টেনে টেনে আমাকে বলল, আগে জঙ্গলকে চেনো, জানোয়ার, পাখিদের চেনো, তাদের ভালবাসতে শেখো, তারপরই দুম-দুম করে গুলি চালিয়ো। গাছে-বসা পাখিকে গুলি করে মারাতে কোনও বাহাদুরি

নেই—যে কেউ মারতে পারে—কিন্তু মারবার আগে যে-পাখির প্রাণটা নিচ্ছ, সে কী পাখি সেটা অন্তত ভাল করে জেনে নিয়ো। তাকে আদপে মারা উচিত কিনা, সেটা জেনে নিয়ো। গাছ চেনো, পাখি চেনো, ফুল চেনো। জঙ্গলের এই শিক্ষাটাই বড় শিক্ষা। বুঝলে, লালসাহেব। গুলি করাটা কোনও শিক্ষার মধ্যেই পড়ে না। ওটা সবচেয়ে সোজা। গুলি করার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই।

জুম্মান কফি করে নিয়ে এল।

খুব লজ্জিত হয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর শুধোলাম, তোমার মা কেমন আছেন?

যশোয়ন্ত বলল, এখন নর্মাল। মা তোমাকে একবার হাজারিবাগে নিয়ে যেতে বলেছেন। মানে, টুটিলাওয়াতে।

আমি বললাম, যাব, নিশ্চয়ই যাব।

যশোয়ন্তকে এমন খারাপ মেজাজে আমি কোনওদিন দেখিনি। সত্যিই তো, ও জঙ্গলের রেঞ্জার। কোনও রকম অনুমতি-টনুমতি নিই না, তার উপর এমন যথেচ্ছভাবে যা মারবার নয় তাই মেরে বেড়াই। রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আমি হলেও রাগ করতাম।

কফি আর চিঁড়ে ভাজা খেতে খেতে যশোয়ন্ত হয়তো ভাবল যে, ওরও আমার প্রতি ব্যবহারটা একটু বেশিরকম রূঢ় হয়ে গেছে। জানিনে সে জন্যে কিনা, কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, জানো লালসাহেব, আমি যখন তোমার মতো জঙ্গলে নতুন ছিলাম, তখন এমনই ভুল করে আমি একটা পাখি মেরেছিলাম। হলুদ-বসন্ত পাখি।

আমি তখন একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। ডি এফ ও সাহেবের মেয়ে। আমি তখন ছোকরা রেঞ্জার। মেয়েটির নাম ছিল নিনি। শুধু এই হলুদ-বসন্ত পাখি মারার অপরাধে সে আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল। তা নইলে আজ আমার জীবন হয়তো অন্যরকম হত।

অনেকক্ষণ আমরা দু'জনে চুপ করে বসে রইলাম।

আমি বললাম, আমার খুবই অন্যায় হয়েছে wood-duck-টা মেরে। বিশ্বাস করো যশোয়ন্ত, আমি জানতাম না।

যশোয়ন্ত বলল, তোমার তো অন্যায় হয়েছেই, কিন্তু তোমার চেয়ে বেশি অন্যায় টাবড়ের। ও জানত, ওটা কী পাখি এবং ও পাখি কতবার দেখতে পেয়েও মারিনি। ভারী বদমাশ শালা।

আমরা দু'জনে আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

আমি বললাম, বহুদিন পর আজ এলে, আজ রাতে আমার কাছে থেকে যাও যশোয়ন্ত; বেশ গল্প-গুজব করা যাবে—তুমি হাজারিবাগে যে ক'দিন ছিলে সে ক'দিন ভারী একা একা লেগেছে। তোমার আমার বন্ধুত্বটা যে রীতিমতো সর্বনাশা হয়ে উঠেছে, তা বোঝা যাচ্ছে।

যশোয়ন্ত বলল, কথাটা মন্দ বলোনি। থেকে গেলেও হয় আজ। তবে একটু হুইস্কি খেতে হবে। আর একটা শর্ত। কাল ভোরে উঠেই চলে যাব আমি। অনেকদিন ছুটিতে ছিলাম। অফিসে কাগজপত্র বহু জমে আছে। তা ছাড়া, পরশু আমাকে পাটনা যেতে হবে একটা এক্সেস ফেলিং-এর কেসে। কেস উঠবে পরশুর পরদিন। ক'দিন থাকতে হবে পাটনায় কে জানে? জুম্মানকে বলো তো, তোমার ওই wood-duck-টাকেই তাড়াতাড়ি রোস্ট করুক। শালাকে খেয়ে শালার দুঃখ মোচন করা যাক।

এই বলে, যশোয়ন্ত উঠে গিয়ে 'ভয়ংকরে'র পিঠে ঝোলানো রাইফেল ও একটা ঝোলা নিয়ে এল। রাইফেলটাকে ঘরে রেখে এল; ঝোলা থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করল, তারপর ঝোলাটিও ঘরে রেখে এল। তারপর ভয়ংকরকে লাগাম খুলে পেছনের মহুয়া গাছের নীচে বেঁধে এসে বলল, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তোমার গ্যারেজে জিপের পাশে থাকবে ভয়ংকর।

বাইরেটায় বেশ জমাট বাঁধা অন্ধকার। আকাশটা মেঘলা আছে বলে। মাঝে মাঝেই মেঘ ফুঁড়ে সদ্য-বিধবার শ্বেতা বিষণ্ণতা নিয়ে শ্রাবণ মাসের চাঁদ উঁকি মারছে। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে একটানা রুম-ঝুম রুম-ঝুম। অনেক রকম ব্যাঙ, পোকা, জংলি ইঁদুর সবাই ডাকছে; চলা-ফেরা করছে।

আমার বাংলোর চারপাশে কার্বলিক অ্যাসিড ভাল করে ছিটোই প্রতি সপ্তাহে। গরম আর বর্ষায় সাপের উপদ্রব বড় বেশি। এ-অঞ্চলে শঙ্খচূড় আর বাদামি গোখরোই বেশি। একবার কামড়ালে আর রক্ষা নেই। মাঝে মাঝে তারা আবার শর্ট কাট করার জন্য বাংলোর হাতার মধ্যে দিয়ে এমনকী, কখনও-সখনও আমার বারান্দার উপর দিয়েও যাতায়াত করে থাকে। প্রথম-প্রথম কী যে অস্বস্তি লাগত, কী বলব। আজকাল গা-সওয়া হয়ে গেছে।

গেটের পাশের নালায় প্রায় রোজই সন্ধে-রাত্তিরে সাপে ব্যাঙ ধরে। আর সে এক উৎকট আওয়াজ। আজকাল আর মাথা ঘামাই না। শব্দ শুনে বুঝতে পারি, পুরোটা গেলা হল কি না। মনে মনে বলি, গেলা হয়েছে, এখন যাও বাবা, আর জ্বালিয়ো না।

জুম্মান বারান্দায় আরও চেয়ার বের করে দিল। আমরা দু'জনে বসলাম। যশোয়ন্ত হুইস্কির বোতলটা খুলল! মাঝে মাঝে শালপাতার চুট্টায় টান লাগাতে লাগল।

আমি বললাম, যশোয়ন্ত একটা গল্প বলো। তোমার অভিজ্ঞতার গল্প। বলব বলব করো, কিন্তু বলো না কোনওদিন। তোমার তো কতরকম অভিজ্ঞতা আছে এই জঙ্গল পাহাড়ে।

যশোয়ন্ত কী বলতে গেল, এমন সময় হঠাৎ দূরাগত মাদলের শব্দ কানে এসে পৌঁছল।

রাস্তাটা বাংলোর গেট পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখান থেকে। তারপরেই একটি হ্যাজাকের আলোর রেশ নাচতে-নাচতে এগিয়ে এল। তারপর রোশনাই। হ্যাজাক জ্বালিয়ে বরযাত্রীরা চলেছে। মধ্যে ডুলিতে বর। সব বরযাত্রীর হাতে একটি করে লাঠি। দু'জনের কাঁধে গাদা-বন্দুক! পায়ে নাগরা। মালকোঁচা মারা, সাজি মাটিতে কাচা ধুতি-কুর্তা। মাদল বাজিয়ে হাঁড়িয়া খেয়ে আনন্দ করতে করতে সকলে চলেছে।

ধীরে ধীরে বরযাত্রীর প্রসেশান আমাদের চোখের বাইরে চলে গেল; মাদলের আওয়াজ আবার ঝিঁঝিঁদের আওয়াজে ডুবে গেল। হ্যাজাকের আলোটা যেন লক্ষ লক্ষ ভাগে বিভক্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ জোনাকি হয়ে এই বর্ষণসিক্ত পাহাড়-বনে ছড়িয়ে গেল। পিট-পিট মিট-মিট করতে লাগল। কাছে আসতে লাগল, দূরে যেতে লাগল; দলবদ্ধ হতে লাগল, দলছুট হতে লাগল।

যশোয়ন্ত বলল, এই জঙ্গলেই এক অদ্ভুত ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিলাম, তার গল্পই শোনাই। আজকের রাতটা, কেন জানি না আমারও মনে হচ্ছে, গল্প শোনবার মতোই রাত।

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে যশোয়ন্ত গল্প আরম্ভ করল। যশোয়ন্তের সে গল্প আজ আর হুবহু মনে নেই—তাই আমার জবানীতেই বলি:

গরমের দিন। ফুরফুর করে হাওয়া দিয়েছে শালবনের পাতায় পাতায়। মহুয়ার গন্ধে সমস্ত বন-পাহাড় মাতাল হয়ে উঠেছে। শাল ফুলের সুগন্ধি রেণু জঙ্গলময় উড়ে বেড়াচ্ছে হাওয়ার সঙ্গে।

আমি আর ঝুমরু বসে আছি একটা পাঁইসার গাছের ডালে। গাছের নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে লুকুইয়া-নালহা। পাহাড়ি ঝরনা। এখন জল সামান্যই আছে। নদীরেখার এখানে ওখানে বড়-ছোট, কালো-সাদা পাথর। নদীর দু'পাশের বড় বড় শাল গাছের ছায়া ঝুঁকে পড়ে জলের আরসিতে মুখ দেখছে। আমরা বসে আছি ভাল্লুকের আশায়। আমাদের প্রায় হাত পঁচিশেক দূরে, নদীর প্রায় কিনার ঘেঁষে, একটি ফলভারাবনত ঝাঁকড়া মহুয়া গাছ। ঝুমরু গ্যারান্টি দিয়ে নিয়ে এসেছে যে, ভাল্লুক মহুয়া খাবেই। অতএব জুয়াড়ির মতো বসে আছি তো বসেই আছি। চাঁদটা আরও বড় হল। চাঁপাফুলের রং ছিল এতক্ষণ। এবার সেই প্রথম যৌবনের হরিদ্রাভা ঝরিয়ে দিয়ে অকলঙ্ক সাদা হল। তারপর ঝুরঝুরিয়ে ঝরতে লাগল চাঁদ, এই পালামৌ জঙ্গলের আনাচে-কানাচে। চাঁদ যত রূপক্ষরা হতে লাগল, ততই চারদিকে বন-পাহাড় ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল। নদীরেখায় পাথরের ছায়াগুলোকে থাবা-গেড়ে বলো, এক একটি কালো শোন-চিতোয়া বলে ভুল হতে লাগল।

সোজা সামনে লাতের জঙ্গল। বাঁয়ে গাড়ুর বিখ্যাত পাহাড়। ডাইনে রাতের মোহাবরণে মুণ্ডুর জঙ্গলের সীমা দেখা যাচ্ছে। এই পূর্ণিমা রাতের মায়ায় সব মিলেমিশে এক হয়ে সমস্ত প্রকৃতি শুধুমাত্র একটি সুগন্ধি শ্বেতা সত্তায় প্রকাশিত হচ্ছেন।

আটটা প্রায় বাজে। তবুও ভাল্লুকের 'ভ' নেই। রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে পায়ের উপর রেখে, পেছনের ডালে হেলান দিয়ে একটু আরাম করে বসবার চেষ্টা করছি।

ঝমরুর মুখ দিয়ে মহুয়ার তাড়ির এমনই খুশবু বেরোচ্ছে যে, আমার মনে হল ভাল্লুক যদি আদৌ আসে, তো মহুয়া গাছে না এসে ঝমরুর মুখ চাটতে আসবে। এদিকে পা-টাও টনটন করছে এমনভাবে এতক্ষণ বসে থেকে।

যথাসম্ভব কম শব্দ করে পা-টা ঠিক করে বসছি, এমন সময় নদীরেখায় আমাদের থেকে বেশ অনেকটাই দূরে কী একটা আওয়াজ শুনলাম। কান খাড়া করে শুনতে মনে হল যে, সে শব্দ দেহাতি নাগরা জুতোর নীচের লোহার নালের সঙ্গে পাথরের ঘষা লাগার শব্দ।

তার মানে, কোনও লোক লুকুইয়া-নাল্হা ধরে এদিকে আসছে।

কানে কানে ঝুমরুকে শুধোলাম—কোই বারুদী বন্দুকওয়ালা হ্যায় ক্যা?

ঝুমরু উত্তরে ওর হাত দিয়ে প্রায় আমার মুখচাপা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল—বাত মতো কিজিয়ে হুজৌর। লগতা কি সুগান সিংহি আ রহা হ্যায়। বিলকুল চুপ রহিয়ে।

সুগান সিং কে? এবং তাকে এমন ভয় করারই বা কী আছে?

তখন শুধোবার উপায় ছিল না। তবু রাইফেলটাকে আনসেফ করে, ডান হাতটা কুঁদোর কাছে চেপে ধরে, সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বন-পাহাড়ে অপরিচিত ও ভয়ানক সুগান সিং-এর পদক্ষেপ শুনতে লাগলাম।

খটাং খটাং নালের আওয়াজ হচ্ছিল। যদি সে শিকারি হত, তবে সে নিজের আগমন বনে বনে এমন করে প্রকাশ করত না।

দেখতে দেখতে দূরে একটা বড় কালো পাথরের আড়াল থেকে একটি দীর্ঘদেহী কালো ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এল। গায়ে একটি দেহাতি ফতুয়া, পরনে মালকোঁচা-মারা

ধুতি, কাঁধের উপর শোয়ানো টেলিস্কোপিক লেন্স লাগানো একটি রাইফেল। চাঁদের আলোয় চকচক করছে। লোকটি বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছিল। মাঝে মাঝে কেন্দুপাতার পাকানো বিড়িতে সুখটান লাগাচ্ছিল। সে আমাদের দেখতে পেল না। দেখতে পাবার কারণও ছিল না। কারণ আমরা যে পাঁইসার গাছে বসে ছিলাম, সেটা রীতিমতো ঝাঁকড়া। সুগান সিং নাগরা খটখটিয়ে আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে লুকুইয়া-নালহা ধরে ডাইনে মোড় নিল।

লোকটা চলে যাবার পর ঝুমরু নিশ্বাস ফেলে বলল—বাপ্পারে বাপ্পা, বনদেওতা কা দোয়াসে বড়ী জোর বাঁচ গ্যায়া আজ।

আমি শুধোলাম, লোকটা কে? তাকে এত ভয়েরই বা কী?

ঝুমরু চোখ বিস্ফারিত করে বলল—ডাকাইত বা। ঔর কৌন? কিতনা আদ্‌মীকো জান্‌সে মারা উস্‌কো কই ঠিকানাহি নহী।

মারে কেন?

কৌন জানতা? সায়েদ বদলা লেতা হোগা।

বদলা কীসের?

উত্তরে ঝুমরু বলল, সুগান সিং-এর বাবা, মা, বুড়ি ঠাকুমা ও ছোট বোনকে পাশের পাহাড়ের অবস্থাপন্ন মাহাতো একসঙ্গে এক ঘরে পুড়িয়ে মেরেছিল। এ পর্যন্ত সুগান সিং সেই মাহাতো পরিবারের চারজনকে খুন করেছে। তা ছাড়া তার পথে যারা বাধা দিতে এসেছে, তারা যে কত খুন হয়েছে তার লেখাজোখা নেই।

বললাম, পুলিশ নেই? পুলিশ কী করে?

ঝুমরু বলল, পুলিশ থাকবে না কেন? ডি-আই-জি সাহেব একবার নিজে এসেছিলেন বড় ফৌজ নিয়ে। সুগান সিং-এর নাগাল পেলেন না। শোন্‌চিতোয়ার মতো সেয়ানা এই সুগান সিং। তা ছাড়া ধরতে পারলেও, সাক্ষীই হয়তো জোগাড় হবে না। কারণ, সাক্ষী রেখে তো কেউ কাউকে খুন করে না।

তারপর একটু থেমে বলল—বহত মুশকিল কা বাত। ঈ তামাম জংগল্লে উসীকা রাজ হ্যায়।

ভয় করে না? শিকারে শিকারে ঘুরিস?

ভয়?

ঝুমরু সগর্বে তাড়ি-খাওয়া, কামার্ত মুখখানা আমার দিকে ফিরিয়ে বললে—ঝুমরু কাউকে ভয় করে না।... বাপকি বেটা, সিপাহি কি ঘোড়া, কুছ নহিত থোড়া থোড়া।

শুধোলাম, ভয় করিস না, তো মারলি না কেন তখন সুগান সিংকে? ঝুমরু বলল, জীনে দিজীয়ে হুজৌর কুত্তাকো। সাল ডাকাইতকো।

এমন গড়গড় করে ইতিহাস বলার পরেও যে, কোনও জানোয়ার এ তল্লাটে আসবে—তা আমার মনে হল না। ঝুমরুকে সে কথা জানাতেই সে মহাবিক্রমে প্রতিবাদ করে বলল—বে-ফিক্কির রহিয়ে হুজৌর, হিঁয়াকা ভাল্ সব বহেড়া হ্যায়। অর্থাৎ ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই, এখানকার ভাল্লুকরা সব কালা।

অতএব, নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসলাম—কতক্ষণ বসে থাকতে হবে এই তাড়িখোরের পাল্লায় জানি না। এমন সময়, আমাদের ঠিক পেছন থেকে জলদ-গম্ভীর গলায় কে যেন বলল—মেহেরবাণী করকে জরা উতারকে আইয়ে সাহাব।

চমকে তাকিয়ে দেখি, আমাদের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে সুগান সিং দাঁড়িয়ে আছে। সেই মোহাবিষ্ট রাতে, চাঁদের আলোর বুটি-কাটা জাফরিতে দুটি পাকানো গোঁফসমেত সুগান সিং-এর মুখের কথা, এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

রাইফেলটা আমার হাতে ধরাই ছিল, সেটাকে ওঠাবার চেষ্টা করতেই, সুগান সিং ওর রাইফেলের নলটা আমার পিঠে ঠেকিয়ে দিল। ঝুমরু সেই সময় ইচ্ছা করলে ওর গাদা বন্দুক দিয়ে গুলি করতে পারত, কিন্তু করল না। সুগান সিং নবাবী কায়দায় বলল, আপকো রাইফেল মুঝে দিজিয়ে সাহাব।

বুঝলাম, আপত্তি করে লাভ নেই। ভয় পেয়েও লাভ নেই।

সুগান সিং আমার রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে ওর রাইফেলটা বগলে চেপে যেন অনুনয় করে বলল, অব চলা যায়।

ঝুমরুর গাদা বন্দুক গাছের ডালে যেমন ছিল তেমনই রইল। সুগান সিং মানা করল ঝুমরুকে ওতে হাত দিতে। তারপর আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা শুরু হল।

আগে ঝুমরু, তারপর আমি, সকলের পেছনে সুগান সিং। মাঝে মাঝে পেছন থেকে সংক্ষিপ্ত আদেশ আসছে, 'ডাইনে', 'বাঁয়ে', 'নিচুসে',—ইত্যাদি।

চলতে চলতে ঝুমরু কথা বলল— হামলোগোঁকা কঁহা লে যা রহা হ্যায় জী?

বলার সঙ্গে সঙ্গে, আমাকে টপকে গিয়ে সুগান সিং ঝুমরুর ঘাড়ে পড়ল। ঘাড়ে পড়ে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে চোখের নিমেষে ওকে এক ঘা কষাল। ঘা খেয়ে ঝুমরু পাথরের উপরই ছিটকে পড়ল। ওর কনুই কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। সুগান সিং ওকে লাথি মেরে উঠিয়ে বলল—চল চল, শো গ্যয়ে মেরি টীকায়েতকা বেটা।

আমার ডানদিকের একটা দাঁতে পোকা ছিল। বেশ ব্যথা ছিল গালে। মনে মনে প্রার্থনা করলাম ভগবানের কাছে যে, সুগান সিং আমাকে আর যেখানেই মারুক, ডান গালে যেন না মারে।

পথে যে কত পাহাড়ি নদী পেরোলাম, তার ইয়ত্তা নেই। কাক-জ্যোৎস্নায় হাসছে চারদিক। আর সেই অসহনীয় নিস্তব্ধতাকে মথিত করে বনে-পাহাড়ে আমরা হেঁটে চলেছি। সুগান সিং-এর নাগরার নালের সঙ্গে পাথরের ঘষা লেগে খটাং খটাং শব্দ হাওয়া ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর আমরা একটি সুন্দর ছোট মালভূমিতে এসে পৌঁছালাম। গভীর জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা জায়গা আবাদ করা হয়েছে জঙ্গল কেটে। ছোট ছোট তিন-চারটি কুঁড়ে ঘর। মাটির দেওয়াল, খাপরার চাল। ঘরের মধ্যে, মধ্যের ঘরটি অপেক্ষাকৃত বড়। সেই বড় ঘরটিতে মিটিমিটি করে কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। কিন্তু জায়গাটা এমন ভুতুড়ে মনে হল যে, বিশ্বাস হল না এখানে আদৌ কেউ থাকে বা থাকতে পারে! থাকেও না হয়তো। এখানেই বোধ হয়, আমাদের কোর্ট মার্শাল হবে। ভগবান জানেন।

সেই শব্দহীন জগতে, আমরা তিনটি প্রাণী প্রেতমূর্তির মতো এসে দাঁড়ালাম।

ঘরগুলোর কাছে একটি ঝাঁকড়া সাগুয়ান গাছ। তার নীচে গোটা দুই চারপাই পাতা আছে। সুগান সিং আমাদের সেখানে গিয়ে বসতে ইশারা করে, সাবধানে সেই মধ্যের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে উঁকি দিল। তারপর ডাকল, সুরাতীয়া, এ-সুরাতীয়া।

চাঁদের আলোয় ডাকাইত সুগান সিং দাঁড়িয়ে ছিল। ভাল করে দেখলাম। ছিপছিপে হলে কী হয়, শরীরে অসম্ভব বল রাখে সে, তা গড়ন দেখলেই বোঝা যায়। চোখ দুটো

দিয়ে যেন বুদ্ধি ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু বেশ শান্ত সমাহিত। গোঁফ দুটো না থাকলে ওকে কেউ ডাকাত বলে বিশ্বাসই করত না।

কপালে কী আছে জানি না। তবে সত্যি বলতে কী, ঝুমরুর জামাকাপড় রক্তে ভেসে যেতে দেখেও, আমার বেশ মজা লাগছিল। শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখাই যাক না, এই কথাই প্রথম থেকে ভাবছিলাম। এদিকে ঝুমরু মাঝে মাঝে ওর রক্তাক্ত জামা-কাপড়ের দিকে তাকাচ্ছে আর বলছে,—'হা রাম, হা রাম, ঔর জীনা নহী হ্যায়।

আবার ডাকল সুগান সিং: সুরাতীয়া, এ-সুরাতীয়া!

সেই চাঁদনি রাতের ঘুমপাড়ানি রাতের ঘরে জানি না কোন সুন্দরী ঘুমিয়েছিল। সে আনন্দে ঘুম-ভাঙা গলায় চিকন স্বরে ভিতর থেকে শুধোল,—ক-ও-ন?

উত্তরে সুগান সিং হাসতে হাসতে বলল,—ঔর ক-ও-ন? তুহর সুগান বা।

তার পরের দৃশ্যের জন্যে মনে মনে তৈরি ছিলাম না।

মেয়েটি প্রায় দরজা ভেঙে বাইরে এসে, শ্রাবণ মাসের কোয়েল নদীর স্রোতের মতো, সুগান সিং-এর বুকে আছড়ে পড়ল। আর সুগান তারে রাইফেল ধরা হাতেই জড়িয়ে ধরে এমনভাবে ও এতক্ষণ ধরে চুমু খেল যে, আমার মনে হল, প্রথম দাড়ি-কামানোর পর থেকে ডাকাতের পুঞ্জীভূত সমস্ত কামনা সেই একটি চুমুতে কেন্দ্রীভূত হল।

সুগানের সব ব্যাপারেই ডাকাইতি।

আলিঙ্গনের ঘোর কাটতেই মেয়েটির নজর যেই হতভাগ্য আমাদের দিকে পড়ল, অমনি সে লজ্জায় মরে গিয়ে, শাড়িতে ঢেউ তুলে, জ্যোৎস্না সাঁতরে, ঘরে গিয়ে দুয়ার দিল।

আর সুগান সিং হাসতে লাগল। হাঃ হাঃ হাঃ করে।

এতক্ষণে সুগান সিং-এর যেন মনে পড়ল আমাদের কথা। হঠাৎই খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল আমাকে,—তসরিফ রাখিয়ে সাহাব, তসরিফ রাখিয়ে।

সসংকোচে বসলাম চৌপায়াতে।

পাশের কুঁড়ে থেকে একটি লোক যেন মন্ত্রবলে বেরিয়ে এল। সুগান সিং তাকে আদেশ করল, এ রামরিচ, সরবৎ লাও।

প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে পাথরের গেলাসে করে সরবৎ এল। মনে হল সিদ্ধির, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। তখন প্রাণের দায়। অমন সুগন্ধি সরবৎটাও রসিয়ে খেতে পারলাম না। কীসের সরবৎ তা কে জানে? এই হয়তো জীবনে শেষ খাওয়া।

সুগান সিং নাগরা খুলে মাটিতে বসে পড়ল, যেন আমাকে সম্মান করার জন্যেই। বসে বসে গোঁফে তা দিতে লাগল। কাছ থেকে ওকে দেখলাম। খুব বেশি হলে তিরিশ বছর বয়স হবে।

হঠাৎ সুগান সিং কথা বলল। বলল, মুঝপর নারাজ না হো সাহাব। আমি আপনাকে এবং আপনার মিথ্যেবাদী অনুচরকে এতখানি রাস্তা কষ্ট দিয়ে এনেছি, শুধু আমি যে ডাকাইত নই, সে কথাটা জানাতে। আমার পরিবারের সকলকে গিধ্বর মাহাতো পুড়িয়ে মারল। তখন আমার কী-ই বয়স সাহাব। একদিন কূপ কাটতে গেছি গাডুর জঙ্গলে। ফিরে এসে দেখি, সমস্ত বাড়ি পুড়ে ছাই। তার মধ্যে মা'র ঠাকুরমার এবং বোনের রুপোর গহনা খুঁজে পেয়েছিলাম, ছাইয়ের সঙ্গে মিশেছিল। বাবার কোনও চিহ্ন পাইনি। সবই ছাই হয়ে গিয়েছিল। আমার দিদিকে সে ঘটনার দু'মাস আগে একদিন মাহাতো ধরে নিয়ে গেছিল।

সেখান থেকে পালাবার সময় রাতের বেলা ভাল্লুকের মুখে পড়ে। আপনারা তো ভাল্লুক শিকারে এসেছিলেন, তাই না? ভাল্ আমিও খুব মারি। দিদি মারা যাবার পর থেকে বেশি করে মারি। তা ছাড়া, মাহাতোও মারি। টীকায়েত মারিনি এ পর্যন্ত। আজই প্রথম মারব টীকায়েতের বেটাকে। বলে, ঝুমরুর দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, ওকে পেটে গুলি করে মারব, যাতে বেশি কষ্ট পেয়ে মরে। সাহাব, মাহাতো যে আমার পরিবারের সকলকে পুড়িয়ে মারল, কই তার তো কোনও বিচার হল না! বিচার নেই বলেই রাইফেল হাতে বিচার খুঁজতে বেরোতে হল আমাকে। আমার উপায় ছিল না।

হুজৌর, ইয়ে বাত তো সাহী হ্যায় যো ম্যায় উস লোগোঁকো গোলীসে ভুঁঞ্জ দিয়া। মগর দুখ মুঝে এহি হ্যায়, কি উসলোগোকো আগসে জ্বলানে নেহি সেকা।

সুগান সিং তারপর হঠাৎ শুধাল, আপ কাঁহাকে রহনেওয়ালা হ্যায় সাহেব? বানিয়ে বললাম, বঙ্গালকা। কাঁহাকা? ও আবার শুধোল। আবার বানিয়ে বললাম, কলকাত্তাকা।

কলকাতা শুনেই সুগানসিং প্রায় চমকে উঠল; বলল, আরে রাম। আপতো মেরি শ্বশুরালকে আদমী। বলেই হাঁক ছাড়ল, আরে এ সুরাতীয়া ইধির আওয়াত জেরা।

সুরাতীয়া দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে এক-পা এক-পা করে ঘর থেকে বেরিয়ে চাঁদে ভিজে সপসপে আঙিনা বেয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। মাথায় ঘোমটা টানা। একটু আগের লজ্জা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ঘোমটার ফাঁকে লজ্জাবনত মুখ থেকে একটি সুকুমারী চিবুক উঁকি দিচ্ছে।

সুগান সিং বললে, আরে সাহাব কলকাত্তাকা রহনেওয়ালা বাংগালি। মনে হল, 'বাঙালি' কথাটা শুনেই সুরাতীয়ার ভীষণ অস্বস্তি হল, কিঞ্চিৎ ভয়ও পেল। এমনকী, মনে হল, ওর পা দুখানি কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটে যেতে চাইছে। সুগান সিং সাহস দিয়ে বলল, আরে ডর ক্যা, বাত করো।

সুরাতীয়া মুখ তুলল, লজ্জা ভেঙে। দেখলাম, একটি সংস্কৃত, লাবণ্যময়ী বাঙালি-বাঙালি মেয়ে। গড়নটি ভারী সুন্দর। মাথাভর্তি এত চুল যে, খোঁপার ভারটা যেন যৌবনের চেয়ে ভারী বলে ঠেকল। সুরাতীয়া পরিষ্কার বাংলায় বলল, আমরা তিন পুরুষ বাংলা দেশে; কলকাতায়। আমার বাবার কয়লার ব্যবসা ছিল কলকাতায়। এখনও আছে—বলে অস্ফুটে থেমে গেল।

ঝুমরুর তাড়ির নেশা মারের চোটে কেটে গেলেও, সিদ্ধি খেয়ে আবার নেশার মতো হয়েছিল। কিংবা মৃত্যুভয়ে ওরকম করছিল কিনা জানি না। কিন্তু সে যে কারণেই হোক, সুরাতীয়াকে বাংলায় কথা বলতে দেখে, ওর আর সহ্য করার ক্ষমতা রইল না। এত বিস্ময় এক জীবনে অসহ্য। হা রাম! বলে সে চৌপায়ায় প্রায় অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়ল।

সুরাতীয়াকে বললাম, বসো বসো। তোমার নামটি তো বেশ।

কথা না বলে সুরাতীয়া মাথা নিচু করে হাসতে লাগল।

সুগান সিং বলল, ও নাম আমি দিয়েছি। ওর আসল নাম ছিল আরতি। আমাদের ঝুমুরের গানের সুরে মিলিয়ে আমি ওর নাম দিয়েছি। শোনেননি সে গান?

"তু কেহরো?
কচমচ ছাতি?
তোরা সুরত দেখি মোরা
বসল নজারীয়া, হো বসল নজারীয়া।

হো তন কৈসানা দিনা।
দেখব নজারীয়া হো; দেখব নজারীয়া।"

তার সঙ্গে মিলিয়ে সুরাতীয়া। ভাল হয়নি?

সুরাতীয়া খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। সুগান সিং-কে কপট ধমক দিয়ে বলল, ধেৎ। আমি হেসে উঠলাম। মৃত্যুভয় থাকা সত্ত্বেও। তারপর বললাম, চমৎকার হয়েছে। তুমি তো রীতিমতো কবি হে সুগান।

সুগান উত্তর না দিয়ে বলল, আপলোগ গপ সপ কিজিয়ে সাহাব। ইতনা রোজ বাদ শ্বশুরালকা আদমী আয়ে হেঁ। ম্যায় চলে মোরগা পাকানে—চলরে রামরিচ, বলে লোকটিকে ডেকে নিয়ে চলে গেল সুগান সিং। যাবার সময় আমরা রাইফেল এবং ওর রাইফেল দুটোই আমার জিম্মায় রেখে গেল।

এ আচ্ছা ডাকাতের পাল্লায় পড়া গেল যা হোক।

আরতি আস্তে আস্তে কথা বলছিল।

ওদের বাড়ির পাশেই, গোয়ালাদের খুব বড় বাথান ছিল। সে গোয়ালা সুগানের কীরকম আত্মীয় হত। বুড়ো মাহাতোকে খুন করে সুগান কলকাতায় গেছিল গা-ঢাকা দেবার জন্যে। আরতি তখন ক্লাস নাইনে পড়ত। একটু বেশি বয়সেই। আরতি কোনওদিন সুগানকে লক্ষ করেনি। গোয়ালাদের কাছে কত দেশোয়ালীই তো আসত-যেত।

একদিন শীতকালের বিকেলে, স্কুল থেকে বন্ধুর বাড়ি গেছিল পড়া দেখতে। ফিরতে রাত হয়ে গেছিল। টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছিল। খুব শীত। গলির মোড়ে, দুধ বইবার বন্ধ ঘোড়ার গাড়িতে সুগান সিং এবং ওর দুজন সাকরেদ ওকে জোর করে উঠিয়ে নিয়েছিল। সেখান থেকে হাওড়া স্টেশান এবং সেখান থেকে এখানে।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল আরতি।

বুঝলাম, সেইসব প্রথম দিকের অনভ্যস্ত ও ক্লান্ত দিনগুলোর কথা ওর মনে পড়ছে।

আরতি বলল, প্রথম প্রথম অনেক কাঁদতাম, এই বর্বরের পাল্লায় পড়ে। আমার বুড়ো বাবার কথা মনে হত। আর তো আমার কেউ নেই। প্রায় তিন বছর হতে চলল, এসেছি। জানি না, বাবা বেঁচে আছেন কিনা। এখন ফিরে যাবার কোনও উপায়ও আর নেই। সুগান হয়তো ছেড়ে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে নেবে কে? আপনাকে আমার বাবার ঠিকানা দেব। আপনি একটু খোঁজ করে আমায় জানাবেন, উনি কেমন আছেন? আমি যে বেঁচে আছি, একথা আবার বলবেন না যেন। বাবার কথা জানতে ইচ্ছা করে।

দেখলাম আরতির দু চোখে দু ফোঁটা জল চিকচিক করছে।

ওকে শুধোলাম, সুগান সিং তোমাকে খুব ভালবাসে, না?

আরতি লজ্জা পেল। তারপর লজ্জায় মাথা নোয়াল। বলল, লোকটা বড় ভাল। একেবারে ছেলেমানুষ। আমাকে ধরে নিয়ে এসে ও যে অন্যায় করেছে, তা ও সবসময় বলে। বলে, ওর জীবনের এটাই নাকি সবচেয়ে হীন অপরাধ। ও বড় দুঃখী। ওর সত্যিই কেউ নেই। পৃথিবীজোড়া ভয় আছে, বিপদ আছে, সন্দেহ আছে, আর থাকবার মধ্যে এক আমি আছি। তবে আমি মানিয়ে নিয়েছি। এখন আর তেমন খারাপ লাগে না। কেবল এই ভয়টা ছাড়া আর সব কিছুই ভাল লাগে।

শুধোলাম, তোমাদের কোনও সন্তান নেই সুরাতীয়া?

ও বলল, সন্তান হয়েই মারা গেছে। এইখানেই। দেড় বছর আগে। আমিও মরতে পারতাম। ডাক্তার ডাকার উপায় ছিল না। তারপর হঠাৎ কী মনে হওয়াতে বলল, আপনি একটু বসুন, আমি দেখে আসি ওরা রান্নার কী করল।

সুরতীয়া চলে যেতেই ঝুমরু বলল, চালিয়ে সাহাব, অব ভাগ যায়। দোনো রাইফেলভি তো আপকা পাসই হ্যায়।

আমি বললাম, মোরগার ঝোল না খেয়ে আমি এক পাও নড়ছি না। বড় পরিশ্রম হয়েছে।

ঝুমরু প্রথমে আমার কথা বিশ্বাস করল না। তারপর অবিশ্বাস করার মতো মনের জোর সংগ্রহ করতে না পেরে আবার শুয়ে পড়ল।

আমি বললাম, ব্যথা কেমন? এখনও রক্ত পড়ছে? ও বলল, না। ব্যথাও নেই, রক্তও পড়ছে না। এ সরবৎ-এ কোন দাওয়াই ছিল।

সুরাতীয়ার কথা ভাবছিলাম। আমি যদি সুরাতীয়ার মতো কোনও সুগন্ধি মেয়ে হতাম, তাহলে আমি এই জীবনকে ঈর্ষা করতাম। কলকাতার থেকে কী হত জানি না। কলকাতায় একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিনতার গ্লানির জীবনে ও এর চেয়ে কী এমন বেশি পেত, ওই জানে।

সে রাতে অনেক খেলাম। পরম তৃপ্তিভরে। রোটি, মোরগার ঝোল এবং লেবুর আচার।

বিদায় নিয়ে যাবার সময় আরতি কেঁদে ফেলল। ওর বাবার ঠিকানা দিল। আর বার বার বলল, কাউকে যেন বলবেন না যে, আমি বেঁচে আছি।

সুগান সিং আমাদের লুকুইয়া-নাল্‌হা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে বলল। বারণ করলাম, শুনল না। বলল, চিনে যেতে পারবেন না; কেউই পারে না।

এক-আকাশ চাঁদের নীচে শহুরে আরতি, যে ডাকাইত সুগান সিং-এর 'সুরাতীয়া' হয়ে গেছে,—সে আমাদের পথের দিকে চেয়ে রইল। ওর কাছে অনেকদিন পর ওর শৈশব আর কৈশোরের কলকাতা এসেছিল, আবার ফিরে চলল; আমার সঙ্গে।

লুকুয়াই-নালহার মুখে এসে যখন পৌঁছালাম, তখন রাত প্রায় দুটো। পাহাড়তলিতে রাতচরা পাখি ডেকে ফিরছে।

সুগান সিং আমার হাত ধরে বলল, আব বিসওয়াস কিঁয়ে হ্যায় তো সাহাব, যো ম্যায় ডাকাইত নহী হুঁ?

ওর কাঁধে হাত রেখে আমি বললাম, তুমি ডাকাত কেন হতে যাবে সুগান সিং?

সুগান সিং কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রাইফেলে হাত রেখে। ঝুমরুকে বলল, মুঝপর গোসসা না হো ভাই। তুম মুঝে কুত্তা বোলাথা উস লিয়ে তুমনে জেরাসা শিখলায়া। কুত্তা পহ্‌চান্তে পহ্‌চান্তে জিন্দাগী বরবাদ হো চুকা। মুঝে কুত্তা না কহো ইয়ার, কুত্তা না কহো। কভ্‌ভী না কহো।

তারপর আমাদের পিছনে সুগান সিং-এর ছিপ্‌ছিপে চেহারা টিটি পাখির ডাকের সঙ্গে চাঁদের সায়ান্ধকার বনে হারিয়ে গেল।

এই অবধি বলে যশোয়ন্ত থামল। এক চুমুকে খেয়ে নতুন করে একটা চুট্টা ধরাল। ওর গল্প শেষ হতেই ঝিঝিদের ঝুমঝুমি আবার প্রখর হল।

আমি বললাম, আর কখনও দেখা হয়নি সুরাতীয়া বা সুগান সিং-এর সঙ্গে?

যশোয়ন্ত বলল, সুগান সিং-এর মৃতদেহ দেখেছিলাম। রক্তাক্ত, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রায় দেড় বছর বাদে।

ডালটনগঞ্জ থেকে পুলিশ ফোর্স এসেছিল। চারজন পুলিশও মারা গেছিল গুলিতে।

আর সুরাতীয়া?

সুরাতীয়ার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তবে শুনেছিলাম, ডালটনগঞ্জের চমনলালবাবু ওকে এনে নিজের বাড়িতে মেয়েদের সঙ্গে রেখেছিলেন সমস্ত শুনে। ও নাকি ঠিক করেছিলো, প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাটাও দেবে। কিন্তু সমাজের শিরোমণি রায় দিয়েছিলেন যে, অমন ডাকাতের বউকে ভদ্রলোকের বাড়িতে রাখা মোটেই ভদ্রজনোচিত কাজ নয়। চমনলালবাবুর নামে ওরা সকলে চতুর্দিকে নানারকম কুৎসাও রটাচ্ছিল। উনি নাকি নিজের লালসা চরিতার্থ করার জন্যে বুনো ময়না এনে নিজের খাঁচায় পুষেছেন।

অবশেষে যা হয়ে থাকে, তাই হল। সুরাতীয়াকে একদিন চমনলালের বাড়ির শেষ আশ্রয়ও ত্যাগ করতে হল। কলকাতায় সত্যি সে আর ফিরে যায়নি। এখনও ডালটনগঞ্জেই আছে। ডালটনগঞ্জের পাড়া-বিশেষে তার বিশেষ কদরও হয়েছে। ইংরেজি-জানা দেহপসারিণী সে পাড়ায় তখনও অচেনা ছিল। তারপর থেকে সুরাতীয়া বিকিকিনি শরীরিণী হয়ে গেছে।

গল্প বলা শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে যশোয়ন্ত বলল, মাঝে মাঝে সুগান সিং-এর উপর রাগ হয়। সেদিন চাঁদনি রাতে সুরাতীয়ার গল্প শুনতে শুনতে সুগান সিংকে যে বীরপুরুষের আসনে মনে মনে বসিয়েছিলাম, তাকে সে আসনে এখন আর বসাতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কী লালসাহেব, দু-একটা শারীরিক বীরত্বের নিদর্শন রাখলেই বীর হওয়া যায় না। সুরাতীয়ার যে শাস্তি, তা সুগানের অপরিণামদর্শিতার জন্যেই। সুগান সিং-এর মতো লোকের, নিজের জীবনের সঙ্গে কোনও ভাল মেয়ের জীবন জড়ানো ঠিক হয়নি। সুগান সিং-এর দৃষ্টান্ত দেখে আমি নিজে অনেক শিখেছি।

কেন বলছ ও কথা?—আমি বললাম।

এ অঞ্চলের লোকেরা আমাকে একটা মস্ত সাহসী বীর বলেই জানে। কই, সব কিছু জেনেও, চমনলালবাবুর আশ্রয় হারানোর পর সুরাতীয়াকে তো আমিও আশ্রয় দিতে পারিনি! যত বড় বীরই ওই মূর্খ লোকগুলো আমাকে বলুক না কেন, আমার সাহসের প্রচুর অভাব আছে। ভিতরে ভিতরে আমরা সবাই ভীরু।

সমাজের প্রতীক বাজপাখিটা যখন আকাশে উঠে তুক্ষ্ণ সুরে ডাকতে ডাকতে আমাদের মাথার উপর ঘোরে, তখন আমাদের মতো অনেক সাহসী লোকই মেঠো ইঁদুরের মতো চুঁইচুঁই করতে করতে গর্তে ঢোকে। যদি কোনওদিন ওই বাজপাখিটাকে মারতে পারি লালসাহেব, সেদিন জানব, আমার রাইফেল ধরা সার্থক হয়েছিল।

জুম্মান এসে উড ডাক-এর রোস্টটা সামনে ট্রেতে রেখে গেল।

যশোয়ন্ত একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলেছে। এখন কথা বলছে না। চুট্টার আলোয় বারান্দার সায়ান্ধকারে ওর চোখ দুটো চকচক করে উঠছে।



বারো

শুতে শুতে বেশ রাত হয়েছিল। শোবার আগে সুগান সিং আর সুরাতীয়ার কথা মাথা মধ্যে কেবলই ঘুরছিল।

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আকাশের মেঘ কেটে গেছে। ভিজে বন পাহাড়ে চাঁদের আলো পিছলে পিছলে যাচ্ছে। একটানা ঝিঝির ডাক মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল প্রচণ্ড শব্দে, শুনে মনে হল রাইফেলের শব্দ। একসঙ্গে বোধ পয়, পাঁচ-ছটা গুলি হল। আমার হঠাৎ মনে হল, যশোয়ন্তের সুগান সিং-এক সঙ্গে বুঝি আবার পুলিশি ফৌজের লড়াই শুরু হয়েছে। তারপরই ভুল বুঝতে পারলাম। সুগান সিং তো কবে মরে গেছে।

পরমুহূর্তেই দরজায় জোর ধাক্কা পড়ল। লালসাহেব! লালসাহেব!

যশোয়ন্ত ডাকছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলতেই যশোয়ন্ত উত্তেজিত গলায় শুধোল, তোমার জিপে তেল আছে?

ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। ঘুমের ঘোরেই বললাম, হ্যাঁ।

ও বলল, চাবিটা দাও। তোমার বন্দুকটাও নাও। শিগগির চলো। এই বলে পায়জামার উপরে হাতকাটা গেঞ্জি পরা অবস্থাতেই যশোয়ন্ত রাইফেল হাতে দৌড়ে গিয়ে জিপের স্টিয়ারিং-এ বসল। যন্ত্র-চালিতের মতো আমিও বন্দুকটা নিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসলাম। যশোয়ন্ত ঘর থেকে বেরুবার সময় আমার পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা নিয়ে গিয়েছিল হাতে।

অত জোর জিপ চালাতে যশোয়ন্তকে আমি কোনওদিন দেখিনি। ওকে যেন নিশিতে ডেকেছে।

গুলির আওয়াজ এসেছিল বাগেচম্পার ঢালের রাস্তায় বাংলোর কাছ থেকেই। সে দিক পানে আঁকাবাঁকা পথে প্রায় পঞ্চাশ মাইল বেগে জিপ ছোটাল যশোয়ন্ত। এখন রাত কত তা কে জানে। এখন চাঁদটা একেবারে মেঘে ঢাকা। জোরে হাওয়া লাগছে। জিপের পরদাটা ফ্রেমের লোহার রডের সঙ্গে পত্‌পত্‌ শব্দ করে আছড়াচ্ছে। হাওয়াটা ভীষণ ঠাণ্ডা। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে শুয়েছিলাম। ওই অবস্থাতেই চলে এসেছি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড় কনকন করছে।

মিনিট কয়েক যাবার পরই চোখে পড়ল আমাদের সামনে পাহাড়ের উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা পথে একটি জিপ তীব্রগতিতে ছুটছে সামনে-সামনে। হেডলাইটের আলোটা বিদ্যুতের মতো জঙ্গল-পাহাড় চিরে চিরে চলেছে।

যশোয়ন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আমার রাইফেলটা ভাল করে ধরো, আছাড় না খায়।

তারপর দশ-পনেরো মিনিট হুঁশ ছিল না। আমরা যে কেন খাদে পড়িনি, গাছে ও পাথরে ধাক্কা খেয়ে ওইখানেই যে কেন মরিনি, পাহাড়ি নালার উপরের ভেজা কাঠের সাঁকোর উপর থেকে পিছলে কেন যে নদীতে জিপসুদ্ধ উল্টে যাইনি, তা এক ভগবানই জানেন।

সামনেই চেকনাকা। প্রতি চেকনাকায় তালা দেওয়া থাকে। এক একজন করে ফরেস্ট গার্ড প্রতি চেকনাকায় থাকে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের 'পাস' দেখে কাঠের ট্রাক, বাঁশের ট্রাক ছাড়ে তারা। যাতে কেউ বে-আইনি শিকার করতে না পারে তার জন্যেও গেটে তালা লাগানো থাকে। সামনের জিপটা ওই চেকনাকায় গিয়ে আটকে গেল। বোধ হয় গেট বন্ধ।

অনুমান করতে চেষ্টা করছিলাম, এই সামনের জিপের আরোহীরা কারা? কী এদের উদ্দেশ্য? কোথাও ডাকাতি করতে এসেছিল কি? কিছুই জানি না। অনেক সময় এ অঞ্চলে শুনতে পাই, পথ-চলতি একলা মেয়েদের এমন জোর করে জিপে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায় লোকে। শুনি নাকি, অনেক লেখাপড়া জানা নেতা হর্তাকর্তা; লোকেরাও এমন করেন। কিন্তু রাতে? এ কী ব্যাপার? কেন এরা এসেছে? কেনই বা এরা গুলি ছুঁড়ল? কেনই বা এরা এত জোরে পালাচ্ছিল আমাদের দেখে, কিছুই বুঝতে পারছি না।

ততক্ষণে যশোয়ন্ত আমার জিপটা নিয়ে একেবারে চেকনাকার সামনে ওই জিপের পাশে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

অদ্ভুত যাত্রীদের দেখে অবাক হলাম। জিপটির হুড খোলা। সামনে তিনজন লোক। পেছনে এদিক ওদিক মিলিয়ে চারজন লোক। প্রত্যেকের পরনে ট্রাউজার। কারও গায়ে জারকিন, কারও গায়ে ফুলহাতা গরম সোয়েটার। দু'জনের মাথায় বাঁদুরে টুপি। প্রত্যেকের হাতে হয় বন্দুক, না হয় রাইফেল। জিপের চাকায় ওড়া লাল ধুলো মেখে সকলে ভূত। ওই মাঝরাতে, ওই জংলি পরিবেশে, সমস্ত ঘ্যাপারটাই যেন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে বলে মনে হচ্ছিল।

যশোয়ন্ত জিপ থেকে নেমে গিয়ে, ড্রাইভারের পাশে যে জাঁদরেল মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসেছিলেন, তাঁকে হিন্দিতে শুধোল, আপনারা শিকার করছেন যে, পারমিট আছে?

ভদ্রলোক ইংরিজিতে জবাব দিলেন, হু দি ডেভিল আর য়্যু?

ততক্ষণে ফরেস্ট গার্ড তার কুঁড়ে ছেড়ে, লণ্ঠন হাতে করে এসে দাঁড়িয়েছে। যশোয়ন্তকে দেখেই সে বলল, সেলাম হুজৌর। ফরেস্ট রার্ড সেলাম করাতে লোকগুলো একটু ঘাবড়ে গেল।

যশোয়ন্ত তখন ইংরিজিতেই বলল যে, সে এখানকার রেঞ্জার।

তখন সেই ভদ্রলোক বিনয়ের সঙ্গে জারকিনের পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করলেন।

যশোয়ন্ত বলল, এ যে দেখছি চানোয়া ব্লকের রিজার্ভেশন। আপনারা একানে শিকার করছেন কেন? তা ছাড়া গাড়ি থেকে আলো ফেলে শিকার করা বে-আইনি তা জানেন না?

ভদ্রলোক বললেন, আমরা সে ব্লকেই যাচ্ছি। এখানে শিকার করিনি, করবার ইচ্ছেও নেই। লাত থেকে আসছি, যাব চানোয়া।

যশোয়ন্ত বলল। একটু আগে গুলি করেছিলেন কেন? শিকার করছেন না তো কেন গুলি চালিয়েছিলেন?

জিপের পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, য়্যু শাট আপ সোয়াইন। উই ডিড নট শুট অ্যাট এনিথিং।

যশোয়ন্ত চকিতে মুখ তুলে লোকটাকে ভাল করে একবার দেখল। তারপর সেই জাঁদরেল ভদ্রলোককে ইংরিজিতে বলল, আপনার সঙ্গীকে ভদ্রভাবে কথা বলতে বলুন, নইলে পরিণাম খারাপ হবে।

এ কথা বলতেই পেছনে বসা সেই লোকটি দাঁড়িয়ে উঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, তোমার মতো অনেক রেঞ্জার আমার দেখা আছে, শালা।

যশোয়ন্ত কোনও উত্তর দিল না।

ওদের জিপের বনেটের নিচ দিয়ে একটা তার এসে মিলিয়ে গেছে দেখলাম পেছনের সিটে। কোনও কথা না বলে যশোয়ন্ত এক টানে সেই তারটা গাড়ির ব্যাটারি থেকে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, শিকার না করলে স্পটলাইটের কী প্রয়োজন? খুলে ফেলুন!

লোকগুলো আগুনের মতো চোখ করে চেয়ে রইল যশোয়ন্তের দিকে, আগেকার দিন হলে যশোয়ন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যেত। ভ্রূক্ষেপ না করে যশোয়ন্ত নিচু হয়ে মাটিতে কী যেন দেখতে লাগল। তারপর টর্চ ফেলে দেখল। আমিও দেখতে পেলাম জিপের চাকার দাগ। ওই পাশ থেকে এসেছে চেকনাকা পেরিয়ে।

যশোয়ন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আপলোগ লাত সে আ রহা হ্যায়? ওরা সমস্বরে বলল, জী হাঁ।

যশোয়ন্ত বিড় বিড় করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ঠিক হ্যায়, যাইয়ে। মগর আপলোগোকো অ্যায়সা শিখলায়েগা এক রোজ, আপলোগ জিন্দাগী ভর ইয়াদ করেঙ্গে।

জাঁদরেল ভদ্রলোক চমকে উঠে ইংরিজিতে বললেন, কাম অন।

পেছন থেকে সেই বাঁদরের মতো লোকটা বলল, শাট আপ।

জিপটা যেন যশোয়ন্তকে মিথ্যেবাদী এবং আমাকে মিথ্যেবাদীর সাকরেদ প্রতিপন্ন করেই আমাদের মুখে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

যশোয়ন্ত ফরেস্ট গার্ডকে ডাকল। লোকটা কাছে আসতেই যশোয়ন্ত বাঘের মতো তার উপরে পড়ে, ঘাড়ে ধরে তাকে ওইদিক থেকে জিপ ঢোকার দাগ দেখাল। বুঝলাম যে, ফরেস্ট গার্ডই ওই জিপটাকে ঢুকতে দিয়েছিল। চানোয়ার পারমিট হয়তো ছিল, কিন্তু সেটা ছুতোমাত্র। বড় বড় ভদ্রলোক, দামি দামি বন্দুক-রাইফেল কাঁধে করে এমন দামি দামি মিথ্যে কথা যে কী করে বলেন তাই ভাবছিলাম।

এমন সময় যশোয়ন্ত ফরেস্ট গার্ডটাকে এমন মার মারতে আরম্ভ করল যে, কী বলব।

লোকটা তাড়ি খেয়েছিল। কিন্তু কপালের পাশে দুটো ঘুসি পড়তেই তার নেশা-টেশা উবে গেল। মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল লোকটা। তার কান্না শুনে তার বউ ঘর থেকে ঘোমটা মাথায় দৌড়ে এল, হাতে কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে। কোনওক্রমে যশোয়ন্তকে ছাড়িয়ে দিলাম। যশোয়ন্ত একটা লাথি মেরে বলল, শূয়ারকা বাচ্চা। মুঝে তুম ঝুট বোল রহা হ্যায়!

লোকটা মাটিতে পড়েই রইল। ওর বউ এসে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

যশোয়ন্ত জিপটা ঘুরিয়ে নিল। আমি শুধোলাম, ওদের যেতে দিলে কেন?

যশোয়ন্ত বলল, আটকাব কী করে? সঙ্গে শিকার থাকলে আটকাতে পারতাম। তা ছাড়া ওদের ভাল করে শিক্ষা দেওয়া দরকার। কেস করলে ওদের কী হবে? দু-পাঁচশো টাকা ফাইন দিলে ওদের শিক্ষা কিছুই হবে না। ওদের যাতে মালুম হয় তেমন শিক্ষা দেব। আমি শুধোলাম, ওদের তুমি চেনো নাকি? যশোয়ন্ত বলল, বিলক্ষণ চিনি। ওঁরা ডালটনগঞ্জেই থাকেন। ওঁরা এই কর্মই করে বেড়ান। সঙ্গে কলকাতার বন্ধুবান্ধবও ছিলেন। তারপর একটু থেমে বলল, সবই শর্টকাট মেথড। একরাত শিকার করবে, যা চোখে পড়বে তাই মারবে। জিপ থেকে স্পট ফেলে মারবে, ভয়ের কোনও কারণই নেই। হরিণ হলেও মারবে, বাঘ হয় তো তাও মারবে। হরিণের গায়ে গুল লাগে তো নেমে তেড়ে গিয়ে মারবে। বাঘের গায়ে গুলি লাগে তো সটকে যাবে। তারপর শহরের ড্রইংরুমে বসে পাঙাস মাছের মতো চোখওয়ালা মেয়েদের কাছে বড় মুখ করে নিজেদের ডেয়ারিং একস্‌পিরিয়েন্সের গল্প করবে। এদের আমি ভাল করে চিনি লালসাহেব। বাগে পাচ্ছি না একবারও। যশোয়ন্ত বোস কাকে বলে তা একবার এদের সমঝে দেব। এদের এই পাশবিক যাত্রাপার্টির সঙ্গে সত্যিকারের শিকারের কোনও মিল নেই, তা বুঝিয়ে দেব।

ফেরার পথে যশোয়ন্ত খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল, পথের ধুলোয় কী যেন দেখতে দেখতে চলছিল।

হঠাৎ জিপ একদম থামিয়ে দিল যশোয়ন্ত। ভাল করে চেয়ে দেখি, পথের ভেজা ধুলোয় জিপের চাকার অনেক দাগ। এগোনোর, পেছোনোর, জিপ ঘুরানোর।

যশোয়ন্ত স্টার্ট বন্ধ করে দিল। হেডলাইট নিবিয়ে দিল। তারপর আমাকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলল, চুপ!

চুপ করে বসে রইলাম।

চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মেঘে চাঁদটা ঢেকে গেছে। পাতায় পাতায় সরসরানি তুলে একটা ভেজা হাওয়া বইছে। এখানে ঝিঁঝি নেই, আর কোনও শব্দ নেই। মনে হচ্ছে, এখানে এখনই কোনও দারুণ নাটকের অভিনয় হবে। অন্ধকারে রাস্তাটাও ভাল করে ঠাহর হচ্ছে না।

প্রায় পাঁচ মিনিট আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। বেশ শীত করছে হাওয়াটাতে। এমন সময় পথের ডানদিক থেকে ঘ্বাক ঘ্বাক করে দু' বার আওয়াজ হল।

যশোয়ন্ত ফিসফিস করে বলল, যা ভেবেছিলাম।

আমার টর্চটা নিয়ে ও জিপ থেকে নামল। আমাকে বলল, বন্দুকটা নাও। বন্দুকটা নিয়ে পেছনে পেছনে এস। টর্চ জ্বালিয়ে যশোয়ন্ত আগে আগে চলল। ওর রাইফেল জিপেই পড়ে রইল।

জঙ্গলের বড় বড় ভেজা ঘাস। এদিকে জঙ্গলের বড় গাছ সব কপিসিং ফেলিং হয়েছে। মধ্যে মধ্যে কেবল কিছু বড় গাছ রয়ে গেছে। যশোয়ন্তের কানে কানে নিচু গলায় শুধোলাম। অমন করে ডাকল, ও কী জানোয়ার?

যশোয়ন্ত চাপা গলায় বলল, শম্বর। এখন কোনও কথা বোলো না।

আমরা আর একটু এগোতেই কতগুলো জানোয়ারের ভারী পায়ের শব্দ আমাদের বিপরীত দিকে পাহাড় বেয়ে খাদে মিলিয়ে গেল। যশোয়ন্ত যেন আলোটা দিয়ে

এদিক-ওদিক করে কী খুঁজছিল। একটা উঁচু ঢিপির মতো জায়গায় আমরা চুপ করে আলো নিবিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই, আমাদের প্রায় গায়ের কাছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ হল। অমন দীর্ঘশ্বাস জীবনে শুনিনি। বড় জোর ও বড় দীর্ঘস্থায়ী দীর্ঘশ্বাস। তার সঙ্গে একটা উৎকট গন্ধও পেলাম। যশোয়ন্ত অ্যালশেসিয়ান কুকুরের মতো নাক উঁচু করে হাওয়ায় দু' বার কীসের যেন গন্ধ শুঁকল। তারপরই আওয়াজটা যেদিক থেকে এল, সেদিকে টর্চ ফেলে এগোল।

ততক্ষণে আলোটা ছড়িয়ে পড়েছে। একটু এগোতেই দেখি, একটি বিরাট শম্বর মাটিতে বসে আছে। আমরা কাছে যেতেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পারল না। গলাটা উঁচু করে শুয়ে শুয়ে আমাদের দেখতে লাগল। চোখ দুটো সবুজ হয়ে জ্বলতে লাগল। বড় বড় টানা টানা চোখের কোণায় দু'ফোঁটা জল জমেছিল। এতক্ষণে বুঝলাম, ওরই শরীর থেকে সেই দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। কাছে যেতেই দেখি, চাপ চাপ জমাট-বাঁধা রক্ত, পেটে গুলি লেগেছে। মাদী শম্বর। ভাগ্যিস গর্ভিণী নয়। এতক্ষণ যে দুর্গন্ধটা পাচ্ছিলাম, সে রক্তের গন্ধ। শম্বরের রক্তে বড় বদ গন্ধ। জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে রক্ত।

যশোয়ন্ত কী যেন স্বগতোক্তি করল। কী যেন বিড়-বিড় করল। বলল, ওদের শিক্ষা দেব ভাল করে, লালসাহেব। তুমি দেখে নিয়ো।

তারপর শম্বরটাকে চারিদিক দিয়ে প্রদক্ষিণ করে হঠাৎ আমাকে বলল, গলাতে বন্দুকের নলটা বসিয়ে গুলি করে দাও তো, কষ্ট শেষ হবে। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। শম্বরটার পেটে রাইফেলের গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেছে। নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে শালের চারায় আটকে আছে। এ-দৃশ্য দেখা যায় না। আমি গুলি করতে পারলাম না। যশোয়ন্ত ধমকে আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে মাথা উঁচু করা শম্বরটার কানের কাছে নলটা ঠেকিয়েই গুলি করে দিল।

এল জি পোরা ছিল। উঁচু মাথাটা ধপাস করে সোজা মাটিতে আছড়ে পড়ল। চোখের যে দু'ফোঁটা জল এতক্ষণ কীসের অজানা প্রতীক্ষায় যেন অপেক্ষমাণ ছিল, সেই জল দু' ফোঁটা গড়িয়ে গেল, এবং একটা শেষ দীর্ঘনিশ্বাস বেরুল অদ্ভুত শব্দ করে। কানের পাশ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল।

যশোয়ন্ত বলল, চলো এবার ফেরা যাক।

জিপ নিয়ে যখন আমরা রুমান্ডির বাংলোয় ঢুকলাম, তখন রাত পৌনে তিনটে।

সুহাগীর গ্রামের কুকুরগুলো নির্জনতা খান-খান করে ভৌ ভৌ করে ডেকে উঠল।

আমরা গিয়ে শুয়ে পড়লাম। এর পরও ঘুমুবার আশায়!



তেরো

বারান্দার ইজি-চেয়ারে বসে মোড়ার উপর পা তুলে মারিয়ানার বাড়ি থেকে যে ক'টি বই এনেছিলাম, তারই একটা পড়ছি। বোদলেয়ারের কবিতার বই। ইংরেজি অনুবাদ। ফ্লাওয়ারস অব ইভিল।

কবিতা পড়তে হলে আমার রুমান্ডির মতো জায়গা আর হয় না বোধ হয়। বিভোর হয়ে কবিতার পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় একটি জিপ ধুলো উড়িয়ে এসে বাংলোর হাতায় ঢুকল। আশ্চর্য! ঘোষদা জিপ চালাচ্ছেন—আর মারিয়ানা পাশে বসে আছে।

ওঁদের অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে উঠে দাঁড়াতেই এত ক্লান্ত লাগল যে কী বলব। জ্বরের পর শরীরটা বড় খারাপ যাচ্ছে। কাল আবার জ্বর এসেছিল।

ঘোষদা বললেন, আচ্ছা লোক যা হোক তুমি। এমনভাবে একা একা অসুস্থ হয়ে পড়ে রইলে, একটা খবর পর্যন্ত দিলে না। এমন বে-আক্কেলে লোকও দেখিনি।

আমি কাঁচুমাচু মুখ করে বললাম, তেমন মারাত্মক কিছু তো হয়নি। আপনাদের সব্বাইকে তুচ্ছ ব্যাপারে বিরক্ত করতে চাইনি।

মারিয়ানা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, তা কেন? কিছু একটা হলে তারপর খবর পাঠাতেন, আর লোকে আমাদের গায়ে থুথু দিত। বলত, ছিঃ ছিঃ এতগুলো লোক থাকতে ছেলেটা বেঘোরে...।

আমি বললাম, আজ্ঞে না, দিব্যি ঘোরে ছিলাম। সেইজন্যেই খবর পাঠাইনি।

ঘোষদা বললেন, তোমার বউদিকে তো কলকাতা চালান করেছি। হঠাৎ-ই। ওঁর মার শরীর খারাপ হল, ট্রাঙ্ককল পেয়ে তাই পাঠালাম। এখন ওখানে গিয়ে মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসেছেন। বর্ষাকালটা কাবার করেই আসবেন।

আমি হেসে বললাম, ভালই তো। তবে আপনার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।

ঘোষদা জিপে উঠতে উঠতে বললেন, না, না, কষ্ট কী? কষ্টের কী আছে। তারপর মারিয়ানার দিকে ফিরে বললেন, তাহলে মারিয়ানা, আমি কিন্তু সন্ধে লাগার সঙ্গে সঙ্গে আসছি। তৈরি হয়ে থেকো।

জিপটা স্টার্ট করে আমায় বললেন,—মারিয়ানা সারাদিন তোমার তত্ত্ব-তল্লাশ করবে, আমি যাচ্ছি গাড়ুর রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করতে। রাস্তা বানানো নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। ফেরার পথে মারিয়ানাকে তুলে নেব। ভাল করে আদর-যত্ন করে খাইও মেয়েটাকে। এতদূর এসেছে শুধু তোমার অসুস্থতার খবর শুনে।

কী বলে যে মারিয়ানাকে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না। এই ভদ্রতা, শুধু ভদ্রতাই বা একে বলি কেন, এই বন্ধুত্ব, এর দাম দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

মেয়েরা যাদের ভালবাসে, তাদের সঙ্গে বোধ হয় সত্যিকারের বন্ধুত্ব করতে পারে না, কারণ তাদের সত্তা সব সময় সেই পুরুষের ব্যক্তিত্বে পরিব্যাপ্ত থাকে, সব সময় ওরা ভয় পায়; পাছে ধরা পড়ে। ফলে ওরা সেই পুরুষের কাছে সব সময় উচ্চমন্যতা দেখায় বা হীনম্মন্যতায় ভোগে। মনে মনে মরে থাকে বলে।

আমি ওর বন্ধু মাত্র। অন্য কিছুই নই। তবু কী করে অস্বীকার করি যে, মাঝে মাঝে আমারও যন্ত্রণা হয়। শুধুমাত্র ইনটেলেকচুয়াল বন্ধুতে মন ভরতে চায় না। এই জঙ্গল পাহাড়ের নির্জনতা, এই পুটুস ফুলের উগ্র গন্ধ, এই বনস্থলীর বর্ণচ্ছটা, এই সমস্ত কিছু আমাকেও কখনও কখনও কাঙাল করে তোলে।

দিনে দিনে শরীর এসে মনের উপর জবরদখল নিচ্ছে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এই একটা বড় অভিশাপ। একে অস্বীকার করার উপায় নেই। শপরের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে নিজের আদিম সত্তার উপর যে মেকি আস্তরণটি জমিয়েছিলাম এতদিন, মেয়েদের মেক-আপের মতো, প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাতে চিড় ধরেছে—ফেটে পড়ছে তা। সাধারণ আদিম, প্রাকৃত 'আমি' বেরিয়ে পড়ছে।

দিনে দিনে বড়ই অসভ্য হয়ে উঠছি। তবে এখনও পুরোপুরি হারিনি। উত্তাল তরঙ্গে এখনও কোনওক্রমে হাল ধরে বসে আছি। তবে যে-কোনও মুহূর্তেই তরণী ডুবতে পারে। সভ্যতার সমুদ্রের পরপারে পৌঁছানো এ-জন্মে হবে বলে মনে হচ্ছে না। এই রুমান্ডির চাকরি আর যশোয়ন্তের দোস্তি আমার ব্যক্তিগত সভ্যতার রাজপথে কালাপাহাড়ের মতো পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যজগত আমাকে আর ফিরিয়ে নেবে না। সুরাতীয়ার যেমন ডালটনগঞ্জে নির্বাসন হয়েছে, আমারও তেমনই রুমান্ডিতে নির্বাসন হবে।

এলোমেলো ভাবনার ঘোর কাটিয়ে উঠে বললাম, ওকি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

মারিয়ানা বলল, বসছি, বসছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

চেয়ার টেনে বসল মারিয়ানা।

একেবারে সাদা পোশাকে এসেছে ও আজকে। কুমারী মেয়েরা সাদা পোশাক পরলে আমার বড় ভয় করে। ঠাকুর ঘরের মতো একটা ফুলের গন্ধমাখা পবিত্রতা তখন ওদের ওপর আরোপিত হয়। তখন মনে মনে, এমনকী চোখ দিয়ে আদর করতেও ভয় করে।

জ্বর আছে নাকি?

মারিয়ানা শুধোল।

না। জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে। তবে বড় দুর্বল করেছে শরীর। হাঁটা-চলা করতে পারি না মোটে। হাঁটুতে খুব ব্যথা। মাথাটা ঝিমঝিম করে। কথা বললে শরীর অস্থির লাগে।

মারিয়ানা চুপ করে চোখের দিকে চেয়ে বসে রইল।

বলল, কী খাবেন আজকে?

জুম্মান যা রেঁধে দেবে।

তারপর একটু ভেবে বললাম, কী খাওয়া উচিত?

ও বলল, আজ আমিই আপনাকে রান্না করে খাওয়াব।

বাঃ! বেশ বলেছেন। এই প্রথম এলেন আমার রুমান্ডিতে, আর প্রথম দিনই হেঁসেলে।

বা রে, তাতে কী হল? বন্ধুর কাছে আবার ফর্মালিটি কেন অত? বলে ভুরু নাচাল।

একটা হলুদ-বসন্ত পাখি এসে সজনের ডালে বসল। দুবার লেজ নাচাল। কুর-কুর করে গদগদ গলায় কী যেন স্বগতোক্তি করল, তারপরই ডানা মেলে উড়ে গেল নীল, ঘন নীল আকাশে।

বর্ষাকাল শেষ হয়ে এসেছে, রোদ্দুরে পুজো-পুজো রঙ লেগেছে। শিউলির দিন এল।

মারিয়ানা বলল, শিরিনবুরুতে সেই মেয়েটিকে দেখে এলেন না? যশোয়ন্তবাবুর সঙ্গে নেচেছিল? মেয়েটা সেদিন মারা গেল।

আমি চমকে উঠে বললাম, সেকি? কী হয়েছিল?

মারিয়ানা মুখ নিচু করে পায়ের গোলাপি নখ দিয়ে চটিতে দাগ কাটতে কাটতে বলল, খুব খারাপ অসুখ, গনোরিয়া।

ইস্। ভাবা যায় না।

আমার সেই রাতের মাদী শম্বরটার কথা মনে হল। পেটে গুলি লেগেছে। চোখ দিয়ে জল ঝরছে। ভাবা যায় না।

এ-রোগে কি অমন হঠাৎ করে মানুষ মরে?

মারুয়ানা বলল, আমি তো ডাক্তার নই। তবে অসুখে মরেনি। আত্মহত্যা করেছিল।

মোষের গলার কাঠের ঘণ্টার রেশ ভেসে আসছিল রোদভরা শালবন থেকে। কী মিষ্টি সকালটা। অসুখের পর এই সকালটা ভারী ভাল লাগছে। বাঁচতে ইচ্ছা করছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন কোন মুঘল যুগের বাদশা। অভাব বলে কোনও কথা আমার অভিধানে লেখা নেই। এত তীব্রভাবে বাঁচার ইচ্ছা বহুদিন মনে জাগেনি।

কিন্তু ইস্! সেই সুন্দরী মেয়েটা সত্যিই মরে গেল!

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলাম।

বললাম, চা খাবেন না? সঙ্গে কী খাবেন বলুন?

মারিয়ানা আস্তে হাসল, বলল, জুম্মান যা খাওয়াবে।

হাসিটা এত ভাল লাগল যে কী বলব। ভাবলাম, পরের জন্মে আমি মারিয়ানার মতো কোন মেয়ে হয়ে জন্মাব। অন্যকে অনুপ্রেরণা জোগানোর মতো সার্থকতা আর কী থাকতে পারে? পুরুষরা বড় স্বার্থপর জাত। মেয়েদের যোগ্য সম্মান কোনওদিন করতে শিখল না।

বললাম, এখন এ-বারান্দায় রোদ এসে যাবে। তেতে উঠবে। চলুন আমরা পেছনে গিয়ে খাদের ধার ঘেঁষে ফলসা গাছের তলায় বসি। সেখানে চা খাওয়া খুব জমবে।

মারিয়ানা হুইসলিং টিলের মতো আমুদে গলায় বলল, চলুন।

জুম্মান আর রামধানীয়া চেয়ারগুলো পৌঁছে দিল।

এ-দিকটায় আমি একা একা আসি না বড়। ফলসা গাছ অনেকগুলো। নিবিড় ছায়া হয়ে থাকে। এখান থেকে নীচের পুরো উপত্যকাটা চোখে পড়ে। সেই বহুদূরের রুপোলি জলের ফালিটুকু, গালচের মতো ধান; এতদিন কচি কলাপাতা সবুজ ছিল, এখন গাঢ় সবুজ হয়েছে। আরও কিছুদিন গেলে হয়তো সোনালি হয়ে উঠবে।

ভারী ভাল তো জায়গাটা। মারিয়ানা বলল।

আমি বললাম, বলুন, সুন্দর না? সুন্দর জায়গায় বসেও কিন্তু আজ আমি কথা বলতে পারব না। আমার এখনও কষ্ট হয় কথা বলতে। আপনি আজ সারাদিন কথা বলবেন। আমি শুনব।

মারিয়ানা বলল, আমার বলার মতো কথাই নেই। বুঝলেন, বলার মতো আমার কিছুই নেই।

বললাম, বলার মতো কথা নেই এমন লোক আছে নাকি? আমি তো টাবড়ের কথা শুনে দশ বছর কাটাতে পারি। আর আপনার শোনানোর মতো একবেলার কথাও নেই? আমার কিন্তু মনে হয় আপনার বলার মতো অনেক কথা আছে। হয়তো শোনাবার মতো লোক নেই। অথবা ইচ্ছে নেই বলার।

মারিয়ানা নিমেষে মুখ ঘুরিয়ে ওর সুন্দর মাধবপাশা দিঘির মতো চোখ দুটো আমার চোখে রাখল, চিকচিক করে উঠল জলভারে। অনেকক্ষণ চুপ করে আমার চোখে চেয়ে রইল। তারপর মুখ নিচু করে নিল।

মাঝে মাঝে আমার অমন হয়। আমার মতো নির্বোধ মানুষও বিক্রমাদিত্যের মাটি-ঢাকা রাজসিংহাসনে বসার মতো হঠাৎ করে বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। মারাত্মক ভাল সাইকো-অ্যানালিস্ট হয়ে ওঠে। তখন আমার সামনে তিষ্ঠোয় কার সাধ্যি!

জুম্মান চিঁড়ের পোলাও বানিয়ে নিয়ে এল। তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

মারিয়ানা অবাক এবং কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে বলল, ওমা, এই বাইরে বসে খাবান? খাবার ঘর?

আমি বললাম, করব না কেন, করি, তবে খুবই কম। বাইরে বসে খাওয়ার মতো মজা আছে? এই যে আপনি খাবেন, কাঠবিড়ালিটা চেরিগাছের ডাল থেকে চেয়ে দেখবে। পেঁপে গাছের পাতার ছায়ায় গিরগিটিটা সুড়সুড় করে লোভে জিভ বের করবে। ছাতার পাখিগুলো আপনার এ হেন ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তি দেখে সমস্বরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ করবে, আর আপনি উপত্যকার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে খাবেন। কী মেজাজ বলুন তো!

মারিয়ানা প্লেটটা হাতে তুলতে তুলতে বলল, আপনি একটি বদ্ধ পাগল। আপনার দোষ নেই। যশোয়ন্তবাবুর চেলা হয়েছেন তো, আপনার উন্মাদ হতেও দেরি নেই।

জুম্মান টি-কোজিতে মুড়ে ট্রে-তে বসিয়ে চা নিয়ে এল।

মারিয়ানা শুধোল, সুজি আছে জুম্মান?

জুম্মান মাথা নাড়িয়ে সায় দিল।

মারিয়ানা বলল, আমি সাহেবের জন্য দুপুরে সুজির খিচুড়ি রাঁধব। তুমি কিছু রেঁধো না।

আমি বললাম, আর মারিয়ানা মেমসাহেবের জন্য তুমি ভাল করে ফ্রায়েড রাইস আর মোরগা বানাও তো জুম্মান। মেমসাহেবের তকলিফ যেন না হয়। একটু বেশি করে করো। যাতে ঘোষদার জন্যেও থাকে।

দুপুরে সুজির খিচুড়িটা যা রেঁধেছিল মারিয়ানা, কী বলব। অমন খিচুড়ি বহু বহু বছর খাইনি। সেই ঠাকুমা বেঁচে থাকতে বোধহয় খেয়েছিলাম। তারপর আর খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

মারিয়ানা স্নান করল গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। আমি ফলসা গাছের তলায় বসে বসে ওর গুনগুনানি শুনলাম। আমার বাথরুম আজ কতদিন পরে যেন ধন্য হল। সাবানের সুগন্ধি ফেনা কেটে কেটে নর্দমা দিয়ে, জবা গাছের গোড়ার পাশ দিয়ে, ঘাসগুলোর মধ্যে দিয়ে বিলি কেটে এসে পেছনের মাঠে ছড়িয়ে গেল। মারিয়ানার শরীরের সুগন্ধি মাদকতায় ভরে গেল আমার রুমাল্ডি।

খাবার ঘরে গল্প করতে করতে খেলাম আমরা দুজনে।

যে যাই বলুক, যশোয়ন্ত মুখে যতই বাতেল্লা করুক; যেখানেই হোক, সে নির্জন বাংলোয়, অথবা ভিড় গিজগিজে শহুরে ফ্ল্যাটে, একজন নরম মেয়ে না থাকলে সমস্ত অস্তিত্বটাই কেমন জোলো-জোলো লাগে। আমার নির্জন-বাসে আজকে মারিয়ানা এসেছে বলে বুঝতে পেলাম, আমাদের জীবনের কত বড় শূন্যতা পূরণ করে মেয়েরা। প্রত্যেক পুরুষের জীবনের।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বারান্দার চেয়ারে বসে রইলাম। একদল হলুদ-ঠোঁট শালিক এসে সভা বসাল বাংলোর হাতায়। অনেকক্ষণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলল, হাত-পা নাড়ল। তারপর যখন বুঝলে মামলা নিষ্পত্তি হবার নয়, তখন ধুত্তোর বলে কিচিরমিচির করতে করতে সুহাগী বস্তির দিকে উড়ে গেল। একটু পরে এক ঝাঁক বুনো টিয়া এসে সামনের চেরি গাছটা ছেয়ে বসল। গাছটা ওদের সবুজ ভারে নুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ নাচানাচি করে ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ করতে করতে ওরা উড়ে পালাল।

একটা নীলকণ্ঠ পাখিকে রোজ এই সময় এসে জ্যাকারান্ডা গাছটাতে বসতে দেখি। সে কোনও কথা বলে না। বোধহয় মারিয়ানার মতোই, বলার লোকের অভাবে ওর কথা বলা হয়ে উঠছে না। এ-ডাল থেকে ও-ডালে সাবধানী বুড়োর মতো কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে সে-ও উড়ে চলে গেল।

মনটা যখন খুব নির্লিপ্ত থাকে, তখন হোধ হয় কারওই কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তখন চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করে।

মারিয়ানা চুপ করে সুহাগী নদীর দিকে তাকিয়ে বসেছিল।

বেলা পড়ে আসছে। পাহাড়িবাজ আর শঙ্খচিলগুলো ঘুরতে ঘুরতে অনেক উপরে উঠেছিল। এখন নেমে আসছে। সুগাহী বস্তিতে বিচিত্র ও বিভিন্ন শব্দ উচ্চগ্রামে বাজছে। সুহাগীর পরের বস্তি যবটুলিয়াতে বেশ ক'দিন হল একটি গম-ভাঙা মেশিন বসেছে। কীসে চলে জানি না। বিকেল হলেই সেটার আওয়াজ শোনা যায় পাহাড় পেরিয়ে। পুপ-পুপ-পুপ-পুপ করে একটি অতিকায় খাপু পাখির মতো সকালে চার ঘণ্টা ও বিকেলে দু'ঘণ্টা সে ডাকে। পড়ন্ত রোদ্দুরে একা একা রুমান্ডিতে বসে সেই পুপ-পুপানি শুনতে ভারী ভাল লাগে।

দেখতে দেখতে বিকেল গড়াল।

জুম্মান কফি দিয়ে গেল। সঙ্গে ডালটনগঞ্জ থেকে আনানো ইদরখ দেওয়া বিস্কিট। কফি খেয়ে মারিয়ানা ঘরে গিয়ে চুল বেঁধে শাড়ি পালটে এল। ব্যাগ খুলে একটি পাতলা শাল নিয়ে এল।

সকাল-সন্ধ্যায় বেশ ঠাণ্ডা লাগে। শীত আসতে তো দেরি নেই বেশি। বনে পাহাড়ে নাকি শরৎ-হেমন্ত-শীতে বড় একটা প্রভেদ নেই শুনেছি। এবার স্বচক্ষে দেখা যাবে।

ছায়াগুলো বেশ বড় বড় হয়েছে। ঝুঁকে পড়েছে। শেষ বিকেলে উদার সূর্যের আঁজলাভরা আলো বনের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে গেছে। কোন এক অদৃশ্য সেতারি হাওয়ার মেজরাপ পরে, রোদের আঙুলে, বনের তারে তারে হংসধ্বনি রাগে আলাপ করছেন। সে কী মীড়! ভাল লাগায় বুকের মধ্যেটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে।

মারিয়ানা আস্তে আস্তে বলল, আমি যেমন এলাম, তেমন আমার কাছে গিয়েও একদিন কাটিয়ে আসবেন। বেশিদিন থাকলে তো আরও মজা হয়। শরীরটা একেবারে ভাল করে নিন তাড়াতাড়ি।

মনে হয়, মারিয়ানার বড় একা একা লাগে মাঝে মাঝে। আমার মতোই। ওর এবং আমার সমস্যা অনেকটা একরকম। অসুবিধার কথা এই যে, সমাধানটা বা সমাধানের পথটা এক নয়। এবং আদৌ সমাধান আছে কিনা তাও অজানা। তবু এতবড় নির্দয় পৃথিবীতে আমরা দুজন যদি দুজনের একাকিত্বের শৈত্যটা বন্ধুত্বের উষ্ণতা দিয়ে ভরিয়ে রাখতে পারি, সেটাই বা কম লাভ কী? সেটা তো মস্ত লাভ। প্রেম ছাড়া বন্ধুত্বের মতো মহান অনুভূতি আর কী আছে?

এই এক বেলায় মারিয়ানার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা যেন অনেকখানি এগিয়ে গেল। এতদিন যেন ক্লাচ টিপে টপ গিয়ারে জিপ চালাচ্ছিলাম, আজ কোন মন্ত্রবলে সেই ক্লাচ থেকে পা-টা সরে গেছে। এক দমকে অনেকদূরই এগিয়ে গেছি!

দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল।

মারিয়ানাকে বললাম, আপনার বইগুলোর প্রায় সবকটিই পড়ে ফেলেছি। আজ নিয়ে যাবেন কিন্তু। আপনার কাছে দিয়ে কিংবা কারওকে দিয়ে আরও ক'টা বই আনিয়ে নেব।

মারিয়ানা শুধোল, আজ সকালে বারান্দায় বসে বসে বোদলেয়ারের বইটি পড়ছিলেন বুঝি?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনি লক্ষ করেছেন দেখছি!

হঠাৎ মারিয়ানা বলল, আপনার কাছে কলম আছে? আমি উঠতে উঠতে বললাম, আছে। ঘরে, টেবিলের ওপর আছে, এনে দিচ্ছি।

মারিয়ানা আমাকে হাত দিয়ে উঠতে মানা করে বলল, আপনি উঠবেন না, আমি নিয়ে আসছি।

ঘর থেকে, টেবিলের পরে বসানো লণ্ঠনের আলোর রেখা বারান্দার থামে এসে পড়েছিল। সেই আলোর রেখায় একটি ছায়া পড়ল। তারপর অজন্তার দেয়ালে আলো হাতে করে ঢুকলে, নিখুঁত সুন্দরীদের ছায়া যেমন করে কাঁপে; বাংলোর থামে মারিয়ানার ছায়া তেমনি করে কাঁপতে লাগল।

একটু পরে বোদলেয়ারের বইটা নিয়ে ফিরে এল মারিয়ানা। বলল, বইটা আপনাকে দিলাম।

আপত্তি করে বললাম, এ কেন করলেন? আপনার কাছে থাকলে পড়তে তো পেতামই। মালিকানাস্বত্ব দেবার কী ছিল?

মারিয়ানা আমার ইজিচেয়ারের মাথার কাছে এসে বইটির প্রথম পাতা খুলে দুহাতে বইটি আমার মুখের সামনে মেলে ধরলে।

পড়লাম। সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখেছে : 'রুমান্ডির সন্ধ্যার স্মারক—মারিয়ানা'।



চোদ্দ

গোটা এলাকাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। লোকের মুখে মুখে ঘুরছে তখন একটি বাইসনের কীর্তিকলাপ। একের পর এক মানুষকে জখম করেই চলেছে এই জানোয়ারটা। কিন্তু কেউই বাগে আনতে পারছে না।

বেতলার রেঞ্জার সাহেব বাইসনটাকে 'রোগ' বলে ঘোষণা করে গেছেন। যে মারতে পারবে, সে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাবে বনবিভাগ থেকে।

সেই পাঁচশো টাকার লোভে স্থানীয় একজন ফরেস্ট গার্ড ওর একনলা বন্দুক নিয়ে কিছুদিন ধরে তাকে মারবার চেষ্টা করে বেড়াচ্ছিল। গতকাল ভরদুপুরে কোয়েলের পাশে সে লোকটিকেও একটি সেগুন গাছের গায়ে থেঁতলে দিয়ে উধাও হয়ে গেছে বাইসনটা।

লোকটি কপাল লক্ষ করে গুলিও করেছিল, কিন্তু কোথায় লেগেছিল কেউ জানে না, গুলিতে নাকি মরেনি বাইসনটা। বাইসনের গায়ে বন্দুকের গুলি বেশি দূর অবধি সেঁধোয় এমন তাগদ কোনও বন্দুকের নেই। বড় রাইফেল হলে অন্য কথা ছিল। তাতেই এই বিপত্তি।

শুনেছি, যশোয়ন্তকে খবর দেওয়া হয়েছে পাটনায়। কাজ সেরে যত শিগগির সম্ভব ফিরে আসতে। কারণ ওই বাইসন গুলি খাওয়ার পর আরও সাংঘাতিক হয়ে গেছে। কুলিদের ধাওড়া, ঠিকাদারের বাংলো সব ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। ঠিকাদারের একটি অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল, সেটা ওকে ধাওয়া করাতে তাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। ও জঙ্গলে কাজ একেবারে বন্ধ। ওই বাইসন যতক্ষণ মারা না পড়ে, বাগেচম্পার পথও খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। লোকে হাট করতে যেতে পারছে না, ডাক নিয়েও যেতে পারছে না ডাক-হরকরা।

এতদিন রুমান্ডির বাংলো থেকে সুহাগীর বর্ষাবিধুর চেহারা তেমন খেয়াল করে নজর করিনি। কিশোরী এখন যৌবনবতী হয়েছে। ঘনঘোরে চল্‌কে চল্‌কে চলেছে লাল শাড়িতে। একদিন ইচ্ছে হল, যশোয়ন্তের সেই পাথরটায় গিয়ে বসি। গ্রীষ্মের ক্ষীণা শরীরে এখন কত প্রাণোচ্ছ্বাস, একবার দেখে আসে। কিন্তু টাবড় বলল, কে পাথর এখন ডুবে গেছে। জল তার আরও উপরে। তবা পাহাড়ি নদী, সব সময়ই যে বেশি জল রয়েছে তা নয়। পাহাড়ে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার অব্যাহতি পরেই গিয়ে দেখতে হয় জলের তোড়।

আমাদের সুহাগীতেও অনেক মাছ ধরা পড়েছে এ কদিন। আজকাল যে সব মাছ আমি খাচ্ছি, তার অর্ধেক সুহাগীর, অর্ধেক কোয়েলের। পাহাড়ি পুঁটি, বাটা, আড়-ট্যাংরা ইত্যাদি।

এ এক নতুন আবিষ্কার। শখ হয়, একদিন গিয়ে মাছ ধরি। কিন্তু ওই ইচ্ছে পর্যন্তই। আমি বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে কল্পনা করতে পারি। কল্পনায় বাঘ মারি, মাছ ধরি; আরও অনেক কিছু করি। কিন্তু যতক্ষণ যশোয়ন্তের মতো কেউ এসে হাত ধরে আমাকে না তোলে, ইজি-চেয়ারেই বসে থাকি।

বসে বসে আর ভাল লাগে না। কাজকর্ম ছাড়া কাঁহাতক আর ভাল লাগতে পারে। অবশ্য আর মাসখানেক পরেই পুজো। পুজোর পরেই আবার জঙ্গলের পথঘাট ট্রাক যাবার উপযুক্ত হবে। বাঁশ-কাটা, কাঠ-কাটা শুরু হবে। দলে দলে গয়া জেলার লোকেরা খয়ের বানাবে জঙ্গলে জঙ্গলে। মাঠে মাঠে পাহাড়ের ঢালে ঢালে যে সব ভাদুই শস্য সবুজ থেকে হলুদে রূপান্তরিত হচ্ছে, তাদের ওঠানো হবে। ধান, বাজরা, বুট, আরও কতশত ফসল। সমস্ত জঙ্গল পাহাড় অ-পালিত নবান্ন উৎসবে হেসে উঠবে। ভরন্ত ফসলের গন্ধে ম-ম করবে পাহাড়ি হাওয়া।

এ ফসল উঠে গেলে ক্ষেতে ক্ষেতে কুর্থী লাগবে, গেঁহু লাগবে, কাড়ুয়া লাগবে, শরগুজা লাগবে। হলুদে হলুদে ছেয়ে যাবে চষামাঠ আর অসমান পাহাড়ের ঢাল। সন্ধে হতে না হতেই চারিদিক থেকে মাদলের শব্দ আর গানের সুর ঝুম্ ঝুম্ করবে।

শীতকালে প্রচণ্ড শীত হলে কি হয়, জঙ্গলে পাহাড়ে শীতকালটাই নাকি সব থেকে সুখের সময়। বনবিভাগের বাংলোয় বাংলোয় শিকারির দল আসবেন কলকাতা, পাটনা এবং আরও কত বড় বড় জায়গা থেকে। গ্রামের গরিব লোকেরা কূপ কাটার ফাঁকে ফাঁকে এক-দুদিন সাহেবদের জন্যে ছুলোয়া করে নেবে। আধুলিটা টাকাটা যা পাবে তা পাবে, তাছাড়া শিকার কিছু হলে তার অর্ধেক মাংসের ভাগ। সেটাই আসল লাভ। মাংসকে ওরা বলে 'শিকার'।

একদিন ভোরে যশোয়ন্ত এসে হাজির হল। অনেকদিন পর ভয়ংকরের চিঁ-হা-হ্— চিঁ-হা—হ্ আওয়াজে রুমান্ডির বাংলা সরগরম হয়ে উঠল।

যশোয়ন্ত বলল, কনসার্ভেটর সাহেবের চিঠিটা পেয়েছ লালসাহেব?

পেলাম তো। কেস উঠবে কবে?

কেন, উঠবে হয়তো শিগগিরই, কিন্তু তুমি একটু সাবধানে থেকো।

শুধোলাম, একথা বলছ কেন?

বলছি, কারণ, জগদীশ পাণ্ডে সাংঘাতিক লোক। আমার চেয়েও সাংঘাতিক। করতে পারে না এমন কাজ নেই। তুমি আমার একমাত্র সাক্ষী। হয়তো ও দিলে তোমাকে খুন করিয়ে, লাশ গুম করে দেওয়া তো এই জঙ্গলে পাহাড়ে কিছুই নয়। বাচ্চোকা কাম।

আমি চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বললাম, তাহলে কী হবে?

যশোয়ন্ত হেসে বলল, আরে হবে আবার কী? ওরা আমাকেও চেনে। তোমার গায়ে একবার হাত দিয়ে দেখুকই না। তবে সাবধানের মার নেই। বাংলো থেকে যখনই বেরোবে, তখনই বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে বেরোবে। কোনও কিছু বেগতিক দেখলে, কোনও অচেনা লোককে অস্বাভাবিক অন্তরঙ্গতা করতে দেখলেই পাশ কাটাবে। আর সে রকম দেখলে, গুলি চালিয়ে খুপড়ি উড়িয়ে দেবে।

আমি বললাম, বললে বেশ। গুলি চালিয়ে খুপড়ি উড়িয়ে দিলে, তারপর ফাঁসিতে লটকাবে কে?

তুমিও যেমন। গুলি চালালেই যদি ফাঁসিতে লট্‌কাতে হত, তাহলে তো বেতলা থেকে রুমাণ্ডি অবধি প্রতি গাছে আমি একবার করে ঝুলে থাকতাম। এসব তোমার কলকাতা নয়। জোর যার মুলুক তার। এখন অবধি তাই আছে। পরে কী হবে জানি না। তা ছাড়া দারোগা সাহেব ভি বড়া জবরদস্ত ইমানদার লোক আছেন। উসব কিতাবী আইনের ধার ধারেন না। ঠাণ্ডা মাথায় গোঁফে পাক দিতে দিতে সবটা শোনেন। শুনে, যে সত্যি সত্যি অন্যায় করেছে বোঝেন, সঙ্গে সঙ্গে তার পশ্চাৎদেশে হানটারের বাড়ি। পইলে ডাণ্ডা পিছে বাত ইয়ার। শালা লোগোঁকো হাম শিখলায়েগা ঠিকসে।

যশোয়ন্ত রাইফেলটা খুলে তেল লাগিয়ে আবার লক-স্টক ব্যারেল জোড়া লাগিয়ে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। দাঁড় করিয়ে রাখবার আগে সাইট-প্রটেক্টরটা ফ্রন্ট সাইটে লাগিয়ে নিল। এই রাইফেলটাতে একটি পিপ-সাইট ফিট করা আছে। এমনিতেই যশোয়ন্তের হাত সোনা দিয়ে বাঁধানো। তারপর পিপ-সাইট ফিট করা থাকাতে এই রাইফেলটা দিয়ে যশোয়ন্ত মোক্ষম মার মারে। জানোয়ার তার চাঁদবদন একবার দেখালে হয়। তারপর সে বাইসনই হোক আর বাঘই হোক, পালায় কোথায় দেখা যাবে। আর চোটও বসায় রাইফেলটা। ভীমের গদার মতো। টাবড় নাম দিয়েছে গদ্দাম। ওজনও সেরকম! কাঁধে নিয়ে মাইল দুয়েক হেঁটে এলে, কলার-বোন 'কে রে? কে রে?' করে ওঠে।

টাবড়কেও খবর পাঠিয়েছিল যশোয়ন্ত। টাবড় এসে হাজির ওর টোপিওয়ালা বারুদী বন্দুক নিয়ে। টাবড়ের বন্দুকটা দেখলেই আমার বুয়োর ওয়ার-এর কথা মনে পড়ে যায়।

বন্দুক রাইফেল থেকে একটা গন্ধ বেরোয়, তেলের গন্ধ, বারুদের গন্ধ, টোটার গন্ধ। সব মিলিয়ে গন্ধটাকে কেমন পুরুষালী-পুরুষালী বলে মনে হয়। কসমেটিকসের গন্ধের সঙ্গে যেমন মেয়েদের ভাবনা জড়ানো থাকে; বন্দুক-রাইফেলের গন্ধের সঙ্গে তেমনই ছেলেদের ভাবনা জড়ানো থাকে। ভারী ভাল লাগে। এই গন্ধ নাকে গেলেই আমার কতগুলো উৎসাহিত-প্রাণ বেহিসাবী, যৌবনমত্ত পুরুষের কথা মনে হয়, যারা সবুজ বনে দু'হাত তুলে লাফাতে লাফাতে গান গায় নবযৌবনের দলের মতো—'ঘূর্ণি হওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্য তারাকে। আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, ক্ষেপিয়ে বেড়ায়, ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে।'

আমরা জিপেই রওনা হলাম। যে জায়গায় গিয়ে নামলাম, সেটা—যেখানে হুইটলি সাহেবরা বাঘ মেরেছিলেন, তার কাছাকাছি।

সকালের রোদ্দুর বনের পাহাড়ে ঝলমল করছে। প্রায় মাথা-সমান উঁচু বর্ষার জল পাওয়া সতেজ গাঢ় সবুজ ঘাসের বন, রোদে জেল্লা দিচ্ছে। তার মাঝ দিয়ে একটা পায়ে-চলা শুঁড়িপথ, গাড়ি যাওয়ার প্রধান সড়ক থেকে নেমে কোয়েলের দিকে চলে গেছে। আমরা জিপটাকে বাঘ মারার সময় যেমন রেখেছিলাম, তেমনই প্রধান রাস্তার উপরে একটা বড় গাছের নীচে বাঁদিক করে পার্ক করিয়ে রাখলাম।

যশোয়ন্ত সাইট-প্রটেক্টরটা খুলে পকেটে রাখল। রাইফেলে গুলি ভরল। আমাকে বন্দুকের দু ব্যারেলেই বুলেট ভরতে বলল। টাবড় তার গাদা বন্দুকে তিন-অংগলি বারুদ কষ্‌কে ঠেসে এসেছে। সামনে একটি হুঁৎকো-মার্কা সীসার তাল। যে ভাগ্যবানের গায়ে ঠেকবে, তিনি পরজন্মে গিয়েও আশীর্বাদ করবেন।

যশোয়ন্ত আগে রাস্তা ছেড়ে শুঁড়িপথে ঢুকল। আমাকে ওদের দুজনের মাঝখানে নিল। পেছনে টাবড়। টাবড়কে ফিসফিসিয়ে বলল পেছনে দেখতে। আমাকে বলল ডাইনে-বাঁয়ে দেখতে। আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম।

যেখানে ঘাসীবন, সেখানে বড় গাছ বেশি নেই। এমন কিছু জঙ্গলও নেই। তবে ঘাসীবনের ফালিটা সেখানে বোধহয় তিনশো গজ চওড়া ও এক হাজার গজ লম্বা হবে। তার দু-পাশেই গভীর বন। ডান দিক থেকে খুব ঘন ঘন ময়ূরের ডাক ভেসে আসছে। ওপাশে বেশ বড় এক ঝাঁক ময়ূর রয়েছে।

বেশ কিছুদূর সাবধানে এগোনোর পর আমরা কোয়েলের শব্দ শুনতে পেলাম। একটানা ঘরঘর শব্দ। ঘোলা জল বেগে বয়ে চলেছে। এ পর্যন্ত জলের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ছাড়া আর কিছুই কর্ণগোচর হল না। এগোতে এগোতে আমরা প্রায় নদীর ধার অবধি গিয়ে পৌঁছালাম। অথচ বাইসনের সাড়াশব্দ নেই। নদীর পারে পৌঁছে যশোয়ন্ত টাবড়কে একটা গাছে উঠে চারদিক দেখতে বলল। টাবড় গাছে অর্ধেকটা উঠেছে, এমন সময় কুকুরের ডাকের মতো একটা ডাক শুনতে পেলাম ঘাসীবনের ভেতরে আমাদের বাঁ দিক থেকে। অমনি টাবড় তরতরিয়ে নেমে এসে বিস্ফারিত চোখে বলল, মুন্নি কোঁয়া হুজৌর, মুন্নি কোঁয়া উস্‌কো পিছে পড়া হ্যায়।

আমি কিছু বুঝতে পারলাম না।

যশোয়ন্তকে খুব উত্তেজিত দেখাল। ও টাবড়কে বলল, আমার বন্দুকটা নিয়ে নিতে। টাবড়কে আরও চারটে গুলি দিতে বলল। গুলি দিলাম। তারপর ওদের পেছনে পেছনে অদৃষ্টপূর্ব, অভূতপূর্ব মুন্নি-কোঁয়ার দর্শনাভিলাষে দুরু দুরু বুকে এগোলাম। টাবড়ের প্রাগৈতিহাসিক বন্দুকের বাহক হয়ে।

ঘাস ঠেলে সাবধানে এগোতেই চোখে পড়ল ঘাসবনের মাঝখানে একটা একলা খয়ের গাছ। সেই গাছের নীচে একটা অতিকায় বাইসন দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিকে মুখ করে। তার গলায় একটা দগদগে রক্তাক্ত ক্ষত। সেটা পোকায় থকথক করছে। প্রকাণ্ড মাথাটা নিচু করে আছে, শিং দুটো পিঠের উপর শুয়ে আছে, মুখ উঁচু করা। কপালের মধ্যেটা সাদা। দু হাঁটুর কাছে মোজার মতো সাদা লোম। আমার মনে হয়, আমাদের আক্রমণ করার জন্যে বুঝি তৈরি হচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে যশোয়ন্ত বাইসনটার দিকে রাইফেল তুলল, এবং আমাকে হতবাক করে দিয়ে টাবড়ও সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে বন্দুক তুলল। রাইফেল ও বন্দুকের যুগপৎ বজ্র নির্ঘোষে সকালের কোয়েলের অববাহিকা গমগম করে উঠল। ওই বড় রাইফেলের গুলি বাইসনের কপালের মধ্যে দিয়ে কুড়ুলের মতো ঢুকে গেল এবং বড় গাছ কেটে ফেলবার সময় যেমন শব্দ হয়, তেমনই শব্দ করে বাইসনটা পড়ে গেল হুড়মুড় করে মাটিতে।

কিন্তু টাবড় যেদিকে গুলি করল, সেদিকে কিছু দেখতে পেলাম না। বাইসনটা পড়ে যেতেই টাবড় আর যশোয়ন্ত বাইসন যেদিকে পড়ে রইল সেদিকে না গিয়ে, যেদিকে টাবড় গুলি করেছিল সেদিকে দৌড়ল। ওদের পেছনে পেছনে আমিও বোকার মতো দৌড়ে গেলাম। একটু যেতেই দেখি, একটা অদ্ভুত জানোয়ার মরে পড়ে আছে। দেখতে কুকুরের মতো, গায়ের রং ম্যাটমেটে লাল, মুখটা কালো, লেজটা কালো, লেজের ডগাটা বেশি কালো।

ততক্ষণে আরও তিন-চারটি গুলির আওয়াজ পেলাম। এবং হঠাৎ প্রায় আমার গায়ের উপর দিয়ে একটা ওই রকম কুকুর পালাতে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে টাবড়ের যন্তরখানি তুলে যন্ত্রচালিতের মতো সেদিকে ঘুরিয়ে ঘোড়া টিপে দিলাম। কুকুরটার গায়ে যেন কামানের গোলা লাগল। একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় খেয়ে পড়ে গেল যেন।

অগত্যা নিজেই নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু যখন সংবিত

ফিরে এল, তখন মনে হল, আমার ডান হাতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গাদা বন্দুকের সে যে কী ধাক্কা, তা বলে বোঝানো যায় না।

ইতিমধ্যে দু-পাশ থেকে আরও দু'-একটি গুলি হয়ে গেছে।

টাবড়ের বন্দুকটা গাছে হেলান দিয়ে রেখে কাঁধে হাত বোলাতে বোলাতে আমি বাইসন দেখতে লাগলাম। দেখার মতো জানোয়ার বটে। ঘাড়টা দেখলে ভক্তি হয়। এমন জানোয়ার থাকতে লোক বৃষস্কন্ধদের প্রশংসা কেন করে জানি না। ঘাড়ের রং চকচকে, গাঢ় কালো। বড় বড় মোটা মোটা লোম। পায়ের খুরগুলো সাধারণ গৃহপালিত গরু-মোষের চেয়ে চারগুণ বড়। আর শিং দুটোও দেখবার মতো। শিং-এর গোড়ায় অনেক থেঁতলানো দাগ। জানি না গাছে গাছে ঘষেছে কিনা। ডান-দিকের শিং-টার ডগাটা চল্টা ওঠা। পেটের কাছে আর একটা ক্ষত দেখলাম। আড়াআড়িভাবে যেন ছুরি দিয়ে কেউ চিরে দিয়েছে। অন্তত দু ইঞ্চি চওড়া ও এক ফুট লম্বা।

ততক্ষণে ওরা ফিরে এসেছে। আমার মরা কুকুরটা দেখে যশোয়ন্ত বলল, আরে ইয়ার তুম ভি মার দিয়া একঠো। সাব্বাস।

আমি শুধোলাম, ওগুলো কী জানোয়ার? যশোয়ন্ত বলল, জঙ্গলে এর চেয়ে সাংঘাতিক কোনও জানোয়ার নেই। এরা জংলি কুকুর। এর চেয়ে বড়ও আছে এক জাতের, তাদের এখানে বলে রাজকোঁয়া। এরা যে জঙ্গলে ঢোকে, সে জঙ্গলে শম্বর হরিণ, শুয়োর, কারও নিস্তার নেই। এমনকী বাঘও এদের এড়িয়ে চলে।

সচরাচর বাইসনের কাছে এরা ঘেঁষে না। কিন্তু যেই দেখেছে যে বাইসনটা ধুঁকছে, যে কোনও মুহূর্তে মরতে পারে, অমনি ওর কাছে ঘুরছিল। উত্যক্ত করে মৃত্যুটা যাতে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই চেষ্টা করছিল।

শুধোলাম, একসঙ্গে ওরা দল বেঁধে থাকে কেন?

ও বলল, দল বেঁধে থাকে, কারণ, এমনিতে তো একলা একলা ছোট জানোয়ারই। শম্বরের পেছনের পায়ের একটা চাঁট খেলে চিতাবাঘেরই মাথার খুলি ফেটে যায়, তো ওদের! সেই জন্যই দল বেঁধে ঘোরে। এবং এক সঙ্গে কোনও বড় জানোয়ারকে চারদিক থেকে আক্রমণ করে। জানোয়ার প্রাণভয়ে পালাতে থাকে আর ওরা সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে চলে, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গতিস্মান জানোয়ারের গা থেকে মাংস খুবলে খুবলে খায়। তারপর যখন সে জানোয়ারের চলবার মতো আর শক্তি থাকে না, তখন সে মুখ থুবড়ে পড়ে এবং মুন্নিকোঁয়া কি রাজকোঁয়ারা তাকে তিলে তিলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। বনে জঙ্গলে এর চেয়ে বীভৎস মৃত্যু আর হয় না।

আমি বললাম, আশ্চর্য! বাইসনটা আমাদের দেখল, অথচ তেড়ে এল না কেন যশোয়ন্ত?

ওর তেড়ে আসবার ক্ষমতা থাকলে আমরা ওকে দেখার অনেক আগেই স্টিম এঞ্জিনের মতো রে-রে করে ঘাসবন ভেঙে এসে ঘাড়ে পড়ত। কখন তেড়ে এল, তা বোঝবার সময় পর্যন্ত দিত না। আসলে ফরেস্ট গার্ডের গুলিটা বেশ জব্বর হয়েছিল। গুলি কপালে না লেগে গলাতে লেগেছিল। নেহাত বন্দুকের গুলি। বেশি দূর ভেতরে ঢুকতে পারেনি, কিন্তু ওর অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছিল। দেখলে না, নড়তে পর্যন্ত চাইল না আমাদের দেখে। মৃত্যুর আগে সবাই একটু শান্তি চায়। তাই ও এই নদীর পাড়ের নিরিবিলি খয়ের গাছের নীচে দেহরক্ষা করবে বলে এখানে দাঁড়িয়ে ধুঁকছিল, আর কোথা থেকে মুন্নি-কোঁয়ারা খবর পেয়ে এসে হাজির।



পনেরো

কিছু জিনিস কেনাকাটার ছিল। তার মধ্যে জামা-কাপড়ই প্রধান। এখানে আসার পর থেকে জামা-কাপড় বানানো হয়নি। তা ছাড়া এই বনেজঙ্গলে যে রকম জামা-কাপড়ের প্রয়োজন, তারও অভাব ছিল আমার। সামনে শীত আসছে। শীতের প্রলয়ংকারী রূপের যা বর্ণনা শুনছি, তাতে তো আগে থাকতেই দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। কিছু গরম কাপড়-চোপড় বানানো দরকার।

ডালটনগঞ্জে গেলাম একদিন। রুমান্ডি থেকে প্রায় তিরিশ মাইল পথ। কিছুদুর অবধি রাস্তা চেনা ছিল, তারপর থেকে অচেনা রাস্তা। ঘোষদার বাড়িই দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করব বলে ঠিক ছিল।

ডালটনগঞ্জ থেকে একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে লাতেহার হয়ে চাঁদোয়াটোরী, সেখান থেকে বাঁয়ে চলে গেছে চাতরার রাস্তা জাবরা বা বাঘরা মোড় হয়ে। বাঘরা মোড় থেকে ডাইনে ঘুরে গেলে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সীমারীয়া-টুটিলাওয়া হয়ে হাজারিবাগ শহর। যশোয়ন্ত এই পথেই হাজারিবাগ যায়। চাঁদোয়া-টোরী থেকে অন্য রাস্তাটা চলে গেছে আমঝারিয়া হয়ে কুরু, কুরু থেকে রাঁচী, উল্টোদিকে গেলে লোহারডাগা। সেখান থেকে বানারী হয়ে নেতারহাট। আর একটা রাস্তা ডালটনগঞ্জ থেকে চলে গেছে ঔরঙ্গাবাদ—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে।

এই সমস্ত জায়গায়ই শুধু পাহাড় আর পাহাড়। জঙ্গল আর জঙ্গল। আদিগন্ত।

ডালটনগঞ্জ বেশ জমজমাট মফস্বল শহর। সিনেমা আছে, কোর্ট-কাছারি ইনকামট্যাক্স অফিস সবই আছে। বাঁশ, কাঠ, গালা ইত্যাদির বেশ বড় বড় ব্যবসাদার আছেন। আমাদের রামদেও সিংহের বাড়িও এখানে।

ঘোষদার বাড়ি পৌঁছে একটু বিশ্রাম নিয়ে ঘোষদার সঙ্গেই বাজারে বেরোলাম। দোকানপত্তর সব ঘোষদার জানাশুনো। কাপড় পছন্দ করে মাপ দিতে সময় লাগল না বেশি। খাকি ট্রাউজার আর বুশসার্ট বানাতে দিলাম দুটি করে। টুইডের একটি কোট। ফ্লানেলের শার্ট একটি—এইসব আর কী।

ডালটনগঞ্জ বাজারে হঠাৎ টাবড়ের ছেলের সঙ্গে দেখা। আমাদের দেখে সেলাম করে বলল, ওর বোন-ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি বললাম, আমি তো আজই বিকেলে ফিরছি—আমার সঙ্গে চল। একাই তো ফিরব। টাবড়ের ছেলে আপত্তি জানাল। বলল, ওর নাকি আর একদিন থাকার ইচ্ছা।

স্টেশনারি দোকানে কিছু কেনাকাটার ছিল, জুম্মানের অর্ডার। চা-কফি ভিনিগার। চিলি-সস্‌, টোমাটো-সস্‌, মাখন, জেলি ইত্যাদি ইত্যাদি।

থলি বোঝাই করে দোকান থেকে বেরোচ্ছি, দেখি দোকানের সামনে একটি লাল অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির সামনের সিটে দুজন লোক, ড্রাইভারসুদ্ধ। টেরিলিনের জামা পরা। আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে। সুন্দরী নই যে, অমন করে তাকাবে! ব্যাপার বুঝলাম না।

ঘোষদার জিপ নিয়ে এসেছিলাম। জিপ ঘোষদাই চালাচ্ছিলেন। ডানদিকে ঘোষদার পাশে গিয়ে বসলাম। এমন সময় ওই লাল গাড়িটা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। হঠাৎ মনে হল, যে লোকটি ড্রাইভারের পাশে বসে আছে, তাকে যেন কোথায় দেখেছি। ভাবলাম, মনেরই ভুল হয়তো। কোথায়ই বা দেখব?

ঘোষদার বাড়ি ফেরার পথে রামদেওবাবুর ছেলের সঙ্গে দেখা। ভারী ভাল ছেলেটি। সে কিছুতেই ছাড়বে না। তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। বিরাট বাড়ি। সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। বহু লোক অফিসে গিসগিস করছে। রামদেওবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। ভারী অমায়িক সাদাসিধে লোক। পরনে ধুতি ও টুইলের সাদা ফুলহাতা শার্ট, কলার তোলা, মাথার চুল এলোমেলো। অনুক্ষণ সিগারেট খাচ্ছেন। বুকপকেটে একটি রুমাল বলের মতো পাকিয়ে রেখেছেন। আমাদের দারচিনি এলাচ দেওয়া চা খাওয়ালেন। বললেন, দুপুরে না খেয়ে গেলে খুব দুঃখিত হবেন। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ঘোষদা অনেক অনুনয়-বিনয় করায় তারপর আমাদের ছাড়লেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘোষদা বললেন, একটু জিরিয়ে নাও, তারপর তোমাকে এগিয়ে দেবখন। কেচকীতে গিয়ে চা খাওয়া যাবে। সেখানে কিছুক্ষণ বসে, চা খেয়ে তুমি তোমার পথ ধরবে, আমি ফিরে আসব ডালটনগঞ্জে।

যেতে যেতে তো তোমার রাত হয়ে যাবে বেশ, প্রায় ন'টা বাজবে। এতখানি পাহাড়ি রাস্তা, তোমার একা চলাফেরা করার অভ্যেস নেই। এক কাজ করো, সঙ্গে আমার একজন খালাসি নিয়ে যাও।

কথাটা আমার মনে হচ্ছিল। কিন্তু কেন যেন পৌরুষে লাগল; যশোয়ন্তের সঙ্গে থেকে আমারও বোধহয় পুরুষ হবার ইচ্ছে জেগেছে। তাছাড়া বন্দুকটা তো সঙ্গেই আছে।

একমাত্র জিপ খারাপ হবার ভয় রয়েছে। কারণ এ সময় জঙ্গলে কাজ বন্ধ থাকে বলে জঙ্গলের পথে ট্রাক চলাচলও সম্পূর্ণ বন্ধ। জিপ পথে খারাপ হলে ওখানেই পড়ে থাকতে হবে। আমার গুরুবাক্য স্মরণ করে ভাবলাম, যো-হোগা সো-হোগা। বললাম, না, না, কোনও দরকার নেই।

বিকেলে আমরা কেচকীতে গেলাম। যশোয়ন্ত ও সুমিতা বউদির কাছে অনেক গল্প শুনেছিলাম। কেচকী আজ চাক্ষুষ দেখলাম। ছবির মতো জায়গা। ন্যাশনাল পার্ক হয়ে যাবে শিগগিরই এ সমস্ত অঞ্চল।

ঔরঙ্গা আর কোয়েল এসে মিশেছে এখানে। এখন বর্ষাকাল। বেশ অনেকটা জায়গায় জল চলেছে—বালির সীমানা দখল করে। নদীর উপরে রেলের ব্রিজ।

ঘোষদা সঙ্গে আছেন, অতএব জল-খাবারের জন্যে দুজনের সঙ্গে যে পরিমাণ খাবার এসেছে, তাতে এক প্লেটুন সৈন্য ডিনার সারতে পারে। মারিয়ানা বলে, ঘোষদা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, The only way to the heart is through the stomach.

সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল, সে একটি শতরঞ্চি নিয়ে জলের ধারে পাতল। আমরা ইচ্ছে করলে বাংলোয় বসতে পারতাম। বাংলোটি বেশ উঁচু বলে সেখানে বসে চতুর্দিক ভারী সুন্দর দেখা যায়। বনবিভাগের বাংলো এটি। কিন্তু জলের পাশেই পরিষ্কার দেখে একটি জায়গায় আমরা বসলাম। টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি পর পর সামনে খোলা হল।

রোদ পড়ে গেলেই বেশ শীত শীত লাগে আজকাল। পুজোর আর দিন-কুড়ি বাকি।

একঝাঁক বুনো ময়না কোনাকুনি উড়ে গেল, ঔরঙ্গা আর কোয়েলের সঙ্গমস্থলের ঠিক উপর দিয়ে। একটা মালগাড়ি গেল গুম গুম করে ব্রিজ পেরিয়ে। নদীর বুকে এবং পাহাড়ে বনে প্রতিধ্বনি তুলে।

কাবাব খেতে খেতে ঘোষদা বললেন—তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি বহুদিন থেকে ভায়া, কিন্তু এতদিন সুযোগ-সুবিধে হয়নি। কথাটা হচ্ছে এই যে, যশোয়ন্তের সঙ্গে বন্ধুত্বটা একটু কমাও। ও এক ধরনের লোক এবং আমরা অন্য ধরনের। ওর শত্রুও অনেক; সংসারে থাকতে হলে যেসব নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, সে-সবের তোয়াক্কা ও করে না। বিয়ে-থাও করেনি, করবেও না কোনওদিন, কাউকে কোনও ব্যাপারে পরোয়া করার প্রয়োজনও মনে করে না। বড়লোকের ছেলে, ও তো জানেই যে, চাকরি ওর শখের চাকরি। কিন্তু আমার তোমার তো তা নয়। আজ চাকরি গেলে কাল করবে কী? বুঝলাম, না হয় বলবে যে, মফস্বলের কলেজে প্রফেসারি কি নিদেনপক্ষে একটা স্কুলমাস্টারিও কি জুটবে না? কিন্তু পাবে কত? এ-চাকরিতে যা প্রসপেক্ট, তা কি সেখানে আছে?

ভদ্রঘরের ছেলে, বিয়ে-থা করবে সংসারধর্ম করবে, সভ্য জীবনযাপন করবে, তা নয়; তুমি যেন নন্দী-ভৃঙ্গীর দলে দিনকে দিন নাম লেখাচ্ছ। ওই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পোচিং কেসে তোমাকে যে ওরা সাক্ষী করেছে, সে-খবর হুইটলি সাহেবের কানেও গেছে।

আমি চুপ করে থাকলাম।

জাবর কাটতে কাটতে হঠাৎ ঘোষদা বললেন, চুপ করে বসে কেন? খাও খাও, বলে চাপাটির বাটিটা এগিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই একদলা কাবাব মুখে ফেলে বললেন, প্র্যাকটিক্যাল হও বাবা, প্র্যাকটিক্যাল হও। ওই হুইটলি সাহেবই বলো আর যেই বলো, তাঁরা অবশ্য যশোয়ন্তকে ভালবাসেন। কিন্তু আসলে তাঁরা বোঝেন বিজনেস। টাকা কামাবার যন্ত্র হচ্ছি আমরা। আপাতদৃষ্টিতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হয়ে তুমি সাক্ষী দেবে; এতে আমরা যে তাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এটাই প্রমাণিত হবে। কিন্তু যতদূর পারো ওইসব ঝামেলা এড়িয়ে যাবে। বনে-জঙ্গলে বাস করতে হবে, একা একা। লোকের সঙ্গে খামোকা ঝগড়া করলে চলবে কেন? কে বেশি টিম্বার ফেলিং করল, কোন রেঞ্জার ক্যুপে মার্কা মারার সময় ঘুষ খেল, কে কোথায় মাদী শম্বর মারল, কে কোন কাহার ছুঁড়িকে গাড়িতে তুলে মজা লুঠল, এত সব খবরে তোমার আমার দরকার কী? এই জঙ্গল-পাহাড়ের লোকগুলো সব হাড়ে-হারামজাদা। আমরা শহুরে চিড়িয়া, আলগা আলগা থাকো। ধরি মাছ না-ছুঁই পানি, এই পলিসি নিয়ে চলো, দেখবে কোনওদিন বিপদ হবে না।

ঘোষদা যা বললেন, তার সবটুকুই মন দিয়ে শুনলাম। সুবোধ বালকের মতো মুগ্ধ হয়েই শুনলাম। কারণ যাঁরা উপদেশের মাধ্যমে তাবৎ জাগতিক প্রশ্নের টীকাসহকারে নিজেরাই উত্তর দিয়ে দেন, তাঁদের কাছে বলার কী থাকতে পারে? এবং উপদেশ হিসাবে খারাপ কিছুই বলেননি।

সূর্যের তেজ কমে আসছে। আগুনে শুকনো কাঠ গুঁজে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঘোষদার খিদ্‌মদগার চায়ের জল গরম করেছে। চা-ও হয়ে গেল। পর পর দু' কাপ চা আরাম করে খেয়ে আমার জিপে উঠে বসলাম।

ঘোষদা বললেন, আশা করি আমি যা বললাম, তা মনে রাখবে।

ঘোষদার চোখের দিকে চেয়ে আমার হঠাৎ মনে হল এটা যেন একটা আদেশ, একটা ওয়ার্নিং।

কোনও জবাব দিলাম না।

বন্দুকটা বাক্সে ভরে এনেছিলাম। বাক্স থেকে খুলে সামনের সিটে লম্বালম্বি করে পিঠের কাছে শুইয়ে রাখলাম। গুলির থলিটা সামনে পা রাখার জায়গায় ডানদিকে রাখলাম। বলা যায় না, বাঘ, হাতি কি বাইসন পথরোধ করতে পারে।

ঘোষদা বললেন—বাহাদুরি কোরো না, আস্তে চালিয়ে যাও। এই বেতলার জঙ্গলে হাতির বড় ভয়। হাতির সামনে পড়লে হর্ন-টর্ন যেন বাজিয়ো না, গুলিও কোরো না। চুপ করে হেড-লাইট জ্বেলে দাঁড়িয়ে থেকো। নিজেরাই সরে যাবে।

ঘোষদাও তাঁর জিপে উঠলেন। কেচকী পেরিয়ে এসে লেভেল ক্রসিংটা পেরিয়ে ঘোষদা বাঁদিকে মোড় নিলেন, আমি ডানদিকে।

অন্ধকার বেশ দ্রুত নেমে আসছে। দেখতে দেখতে পশ্চিমাকাশের লাল-বেগুনে আভাটা মিলিয়ে গেল।

তিরিশ পঁয়ত্রিশ মাইল জিপ চালাচ্ছি। ইঞ্জিনের একটানা স্বাস্থ্যবান গোঁ-গোঁ আওয়াজে নিস্তব্ধ বনপথ চমকে চমকে উঠছে।

ছিপাদোহরের কাছে রাস্তাটা বড়ই আঁকাবাঁকা ও খারাপ। ছিপাদোহরের পর রাস্তাটা কাঁচা হলেও অপেক্ষাকৃত ভাল এবং প্রায় সোজা।

হেডলাইটটা জ্বাললাম। ড্যাশবোর্ডের আলোটা জ্বলল। 'ডিমারে' দিয়ে চলেছি। কারণ, এইখানে রাস্তায় প্রতি সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বাঁক এবং ঘণ্টায় দশ-পনেরো মাইলের বেশি চালানো যায় না গাড়ি।

খারাপ রাস্তাটুকু পেরিয়ে এলাম। এবার একেবারে 'টিকিয়া উড়ান' চালাব।

প্রায় রাত আটটা বাজে। কেচকী থেকে অনেকখানি পথ এসে গেছি। হঠাৎই মনে পড়ে গেল, আসবার সময় একটা ডাইভার্শন দেখেছিলাম, একটা ব্রিজ মেরামত হচ্ছে। কাঠের বোর্ডে লেখা, Caution! Diversion Ahead!

ডাইভার্শনের কাছে গতি একেবারে কমিয়ে দিয়ে বাঁয়ে রাস্তা ছেড়ে নেমে গেলাম। বড় বড় পাথর পড়ে রয়েছে লালমাটির পথটিতে। আসবার সময় এগুলো লক্ষ করেছি বলে মনে হল না। সেগুলোকে কাটাতে গিয়ে, ব্রেক কষে, জিপ স্পেশ্যাল গিয়ারে দিয়ে যেমনি উপরে উঠতে যাব, অমনি একেবারে আমার কানের কাছে গুডুম করে একটা বন্দুকের আওয়াজ হল। এবং একটা বুলেট প্রায় কান ঘেঁষে হিস্‌-স্‌ করে বেরিয়ে গেল। কী ভয় যে পেলাম, কী বলব। প্রাণপণ চেষ্টায় যত জোরে পারি অ্যাক্‌সিলারেটরে চাপ দিলাম। গাড়ি এমনিতেই ফার্স্ট গিয়ারে ছিল, তাতে স্পেশ্যাল গিয়ারে চড়ানো! গাঁক গাঁক করে বড় রাস্তায় পড়ল জিপ, সেই অবস্থাতেই সেকেন্ড গিয়ারে ফেললাম, কিন্তু স্পেশ্যাল গিয়ার ছাড়িয়ে নিয়ে সেকেন্ড গিয়ারে দিতে যতটুকু সময় লেগেছিল তার মধ্যেই আর একটি গুলি আমার পেছন থেকে এসে আমার সিট থেকে দেড় ফুট দূরে উইন্ডস্ক্রিনে লাগল

এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝুরু-ঝুরু করে কাচ ঝরে ছিটকে আমার গায়ে পড়ল।

ততক্ষণে থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে পা-দুটো। মনে হচ্ছে পা-দুটো আমার নয়। ভাল করে ক্লাচ চাপব কি অ্যাকসিলারেটার চাপব, কোনও জোরই যেন পায়ে নেই। কিন্তু কী করে হল জানি না, জিপটা মনে হল একটা জেট প্লেন, গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে করতে মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। পলকে গিয়ার চেঞ্জ করলাম। মনে হল জিপ থেকে একটা রবার পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে, ক্লাচপ্লেট পুড়ে গেল কিনা ভগবান জানেন।

একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে বোধহয় মাইল পাঁচেক এসে জিপটা রাস্তার বাঁদিক করে দাঁড় করালাম। একটা খরগোশ দৌড়ে রাস্তা পার হল। কান পেতে শুনলাম কোনও গাড়ি আমার জিপকে ধাওয়া করে আসছে কিনা, কিন্তু হাওয়ায় শালপাতার ঝুরুঝুরু আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না।

আকাশে একফালি চাঁদ। আমার আতঙ্কগ্রস্ত মুখের দিকে চেয়ে নিষ্প্রাণ হাসল। ওয়াটার বট্‌ল বের করে ঢকঢক করে জল খেলাম, তারপর আর বেশি দেরি করা ঠিক নয় মনে করে তক্ষুনি স্টিয়ারিং-এ বসলাম। বন্দুকটা পাশেই পড়ে রইল। সে মুহূর্তে আমি হঠাৎ বুঝতে পেলাম যে, আমি আমিই; আর যশোয়ন্ত, যশোয়ন্ত।

যত জোরে পারি, তত জোরে চালিয়ে ছিপাদোহর পেরিয়ে যশোয়ন্তের নইহারে এসে পৌঁছালাম। আমার একা একা রুমান্ডিতে যেতে ভয় করছিল। পথে যদি আবার কোনও বিপদ ওঁৎ পেতে থাকে।

নইহার তখন গভীর ঘুমে। রাত প্রায় নটা বাজে। চায়ের দোকানটা বন্ধ। ফরেস্ট অফিস বন্ধ। তবে দেখা গেল যশোয়ন্তের বাংলোর দোতলার ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। একেবারে সোজা ওর বাংলোর হাতায় গাড়ি ঢুকিয়ে স্টিয়ারিং-এর উপর শুয়ে পড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে যশোয়ন্ত তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, ক্যা হুয়া? লালসাব, ক্যা হুয়া? আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না। আমার হাঁটুর সেই কাঁপুনিটা আবার ফিরে এল। থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। আমি যে মরিনি, আমি যে নইহারে যশোয়ন্তের কাছে জিপ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি, এইটে ভেবেই আমার চোখে জল এসে গেল। যখন গুলি এসে কাঁচে লেগেছিল, তখনকার ভয়টা আমার শিরদাঁড়ায় শিরশির করে কাঁপতে লাগল। আমি স্টিয়ারিং জড়িয়ে শুয়ে রইলাম। কিছু বলতে পারলাম না।

বলতে গেলে যশোয়ন্তই প্রায় আমাকে ধরে উপরে নিয়ে গেল। ওর বসবার ঘরের চৌপাইতে বসে ওকে সব বললাম। ফৌজদারী আদালতের উকিল যেমন করে সাক্ষীকে জেরা করে, তেমনি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ও সব আমার কাছে জিজ্ঞেস করল। কখন ডালটনগঞ্জে পৌঁছেছিলাম? আগে ঠিক ছিল কিনা সেখানে যাওয়া? সেখানে গিয়ে কার কার সঙ্গে কখন কখন দেখা হল? সব। সব বললাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

যশোয়ন্ত বলল, একটু ব্র্যান্ডি খাও লালসাহেব। তুমি খুব আপসেট হয়ে পড়েছ।

তখন আমার যা অবস্থা, তাতে আমার নিজের কোনও ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছিল না।

একটু গরম জলে বেশ খানিকটা ব্রান্ডি মিশিয়ে আমায় দিল যশোয়ন্ত। ঢক-ঢক করে গিলে ফেললাম। তারপর যশোয়ন্তের খাটটায় পা লম্বা করে শুলাম। একটু আরাম লাগল। যশোয়ন্ত ওর চাকরকে ডেকে আমার জন্যে খিচুড়ি চাপাতে বলল। তারপর আমায় বলল,

তুমি একটু আরাম করো, আমি নীচে থেকে আসছি। এই বলে একটা টর্চ নিয়ে ও নীচে চলে গেল। বুঝলাম জিপটাকে ও ভাল করে পরীক্ষা করছে। দেখছে, গুলি কোথায় লেগেছে। কীভাবে লেগেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল ও। এসে টর্চটা জায়গায় রাখতে রাখতে বলল, আজ তুমি নতুন জীবন পেলে লালসাহেব। আজকের রাতটা সেলিব্রেট করতে হবে। এই বলে চাকরকে ডেকে বলল, মোরগা পাকাও। যশোয়ন্তের চাকর কাঁচুমাচু মুখ করে বলল— মোরগা শেষ হয়ে গেছে কাল। যশোয়ন্ত বলল, লেগ-হর্ন কাটো। পোষা মুরগির ঘর থেকে বের করো। আজ রাতে মোরগা চাই-ই চাই—যে করে হোক।

আমি বললাম, তোমার এত আদরের পোষা মুরগি কাটবে কেন মিছিমিছি। ও ধমকে বলল, কথা বোলো না কোনও। তোমার জানটাও আমার কাছে কম আদরের নয়। সেটা গেছিলই। ফিরে পেয়েছি তার জন্যে মুরগির জান না হয় যাবেই।

আমার সামনে একটা চেয়ার টেনে চেয়ারের পিঠটা ওর বুকের কাছে নিয়ে দু' দিকে দুটি পা লম্বা করে ছড়িয়ে বসে যশোয়ন্ত বলল, আচ্ছা, ডালটনগঞ্জে বিশেষ কিছু দেখেছিলে? এমন কিছু, যা তোমার অস্বাভাবিক লেগেছিল? এমন কোনও লোক, যাকে তুমি চেনো, অথচ চিনতে পারোনি।

হঠাৎ ডালটনগঞ্জে মনিহারী দোকানের সামনের সেই লাল অ্যাম্বাসাডরটার কথা আমার মনে হল। ওকে বললাম সেই লোকটি, যে গাড়িতে বসেছিল, তার কথাও বললাম।

যশোয়ন্ত লাফিয়ে উঠে বলল, লোকটির কী বড় বড় জুলপি ছিল?

আমি চমকে উঠে বসলাম, কী করে জানলে? হ্যাঁ, ছিল।

যশোয়ন্ত বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে ঘুষি মেরে বলল, বুঝেছি।

আমি বললাম, তা তো বুঝেছ, এখন চলো পুলিশে একটা ডায়েরি করে আসি।

ও বলল, পাগল নাকি? এই রাত্তিরে আবার ডালটনগঞ্জে ফিরতে গিয়ে মরি আর কী! ডাইরি-ফাইরি করব না। ডাইরি করলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। বদলা নেওয়া যাবে না। তুমি কি মনে করো, ওদের ছেড়ে দেব আমি লালসাহেব? যারা একজন নির্দোষ লোককে কাপুরুষের মতো আড়াল থেকে গুলি করে মারতে চায়, তাদের শিক্ষা যা হওয়া উচিত, তাই আমি দেব।

আমি বললাম, যশোয়ন্ত, তা তুমি বলছ বটে, কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার আগে তোমাকেও তো ওরা এমনি করে মেরে ফেলতে পারে?

যশোয়ন্ত কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়ে ভাবল। তারপর বলল, তা পারে। কিন্তু একবার চেষ্টা করেই দেখুক। আমি তো আর তোমার মতো মাখনবাবু নই যে, ওদের অত সহজে ছেড়ে দিয়ে আসব!

যশোয়ন্তের লোক গরম জল করে এনে বাথরুমে দিয়ে গেল। যশোয়ন্ত দেওয়াল-আলমারি খুলে একটা তোয়ালে বের করে দিল। বলল, যাও, স্নান করে এসো। আরাম লাগবে।

স্নান সেরে বেরিয়ে দেখি, যশোয়ন্ত ওর পিস্তলটা পরিষ্কার করছে। তেল দিতে দিতে বলল, অনেকদিন ব্যবহার করা হয় না। শিকারে তো আর পিস্তলের তেমন দরকার হয় না। মানুষ মারতেই বেশি কাজের। বুঝলে লালসাহেব, কাল ভোরে, যে জায়গায় তোমার

উপর গুলি চালিয়েছিল ওরা, সেখানে যাব। সে জায়গাটা আমি নিজে দেখব। তারপর ঠিক করব ডায়েরি করব কি করব না পুলিশে।

আমি বললাম, যা ভাল বোঝো। প্রাণ একবার গেলে আর তা ফেরত হবে না।

যশোয়ন্ত সে রাতে প্রচুর মদ গিলল। সেই হুইট্‌লি সাহেবরা শিকারে আসার পর একসঙ্গে ওকে এত মদ কখনও খেতে দেখিনি। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে একটা হুইস্কির বোতল প্রায় শেষ করে আনল। তারপর আমার সঙ্গে আবার খিচুড়ি আর মুরগির রোস্ট খেল।

ব্রান্ডি খাওয়ার জন্যেই হোক, কি ভয়জনিত ক্লান্তির জন্যেই হোক, ঘুমটা খুব ভাল হয়েছিল সে রাতে।

ঘুম ভেঙে উঠে এক কাপ চা খেয়ে আমরা জিপ নিয়ে সেই গুলির জায়গায় গিয়ে পৌঁছালাম। যশোয়ন্তের পেছনে পেছনে গিয়ে দেখলাম—যে একটা জিপ ডাইভার্সনে নেমে, বাঁদিকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে এবং সেখান থেকে বেরিয়েছেও যে, তার চাকার দাগ স্পষ্ট।

জিপটা জঙ্গলে ঢোকার দাগ ওখানকার ঝুরঝুরে শুকনো লাল মাটিতে কাল রাতেও নিশ্চয়ই ছিল। কাল চোখ খুলে গাড়ি চালালে আমার নজরে নিশ্চয়ই পড়ত।

আমাকে গালাগালি করল যশোয়ন্ত, কালকে তা নজর করিনি বলে।

জিপের চাকার দাগ ধরে জঙ্গলের মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ হাত গিয়ে বোঝা গেল, যে জিপটা যেখানে দাঁড় করানো ছিল, সেই জায়গাটায় ঘন ঝোপ থাকায় জিপটা সহজেই লুকিয়ে রাখা যায় সেখানে। পুটুস-ঝোপের পাশে একটি বড় কালো পাথর। সেই পাথরের পেছনের মাটি বেশ পরিষ্কার করা। পাতা, শুকনো ডালপালা, ইত্যাদি সাফ করা। যশোয়ন্ত ভাল করে লক্ষ করল জায়গাটা। এবং পরক্ষণেই একটি গোল্ডফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট কুড়িয়ে পেল। আমায় বলল, ভাল করে খোঁজ তো, খালি কার্তুজ পাও কিনা।

খালি কার্তুজ পেলাম না, কিন্তু একটা ঠোঙা কুড়িয়ে পেলাম। ঠোঙাটা দেখেই যশোয়ন্ত বলল, ডালটনগঞ্জের বিখ্যাত চাটের দোকানের ঠোঙা। বাবুরা চাট কিনে এনে এখানে বসে মাল খেয়েছিলেন। নইলে কি আর কুড়ি হাত দূর থেকে তোমার তাক্ করা গুলি ফসকাত? তোমার খুপরি ফাঁক হয়ে যেত। খুদাহ যা করবেন, তাই তো হবে।

পর্যবেক্ষণ শেষ করে যশোয়ন্ত বলল, চলো লালসাহেব, ডাইরি-ফাইরি করব না। আমি ওদের শিখলাব। অনেকদিন হয়ে গেল কাউকে ভাল করে রগড়াই না। হাতে-পায়ে মরচে ধরে গেল। জগদীশ পাণ্ডে কতবড় রংবাজ হয়েছে আমি দেখতে চাই। এ ব্যাপারের ফয়সালা আমার উপরই ছেড়ে দাও।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, কি? তুমি ওদের খুন করবে নাকি?

যশোয়ন্ত হেসে বলল, প্রায় সেইরকমই। কী করি, তা দেখতেই পাবে।



ষোলো

রামদেও বাবুদের কর্মচারী সেই রমেনবাবু—বেঁটে-খাটো, গাট্টা-গোট্টা চেহারা, অনর্গল সিগারেট খান; সেদিন আমার বাংলোর সামনের পথ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যবটুলিয়াতে যাচ্ছিলেন। সেখানে নাকি বিঘা দশেক জমি কিনেছেন। ভাগে দেওয়া আছে, গেঁহু কেমন হল, তাই তদারক করতে যাচ্ছিলেন।

বাঁশ-কাটা কাজের সময় একসঙ্গে আমাদের দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে হয়েছে। ভারী মজার লোক। এই এক-ধরনের মানুষ। এঁদের পিছুটান বলে যে কিছু আছে, তা বোঝার উপায় নেই এঁদের দেখলে। হয়তো সত্যিই নেই। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও এঁদের অদ্ভুত। এই রকম লোকই জঙ্গলে-পাহাড়ে এই ধরনের কাজ তদারক করতে সক্ষম। মুখে হাসি লেগেই আছে। পথচলতি দেহাতি ছেলে-মেয়ে-বুড়োর সঙ্গে দেখা হল তো দু-একটা হাসি-মশকরার কথা বলছেন, তারা দুলে দুলে হাসছে, রমেনবাবু আবার সাইকেল চালিয়ে চলেছেন। এঁদের তুলনায় সত্যিই আমরা মাখনবাবু। অসম্ভব কষ্টসহিষ্ণু এই রমেনবাবু। রোদে জলে গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেছে।

রমেনবাবুকে বললাম, ফেরবার সময় দুপুরে আসবেন কিন্তু। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করবেন।

ভরপেট খেয়ে কি সাইকেল চালিয়ে এতদূর যেতে পারব মশাই?

আজ যে যেতেই হবে এমন কথাও তো নেই। এসেছেন তো জমিদারী দেখতে।

উনি হেসে বললেন, তা যা বলেছেন। জমিদারীই বটে!

বেশ ভাল খেতে পারেন ভদ্রলোক। প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম, পাহাড়ের স্বাস্থ্য-প্রদায়িনী জলবায়ু এসব মিলে বেশি না খাবার কথা নয়। আমিই আজকাল যা খাই, শহুরে লোকে দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

আমার রামধানীয়া রমেনবাবুকে দেখেই দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বলল, সেলাম পালোয়ানবাবু।

মানে বুঝলাম না।

শুধোলাম, আপনার নাম আবার পালোয়ান হল কবে থেকে?

রমেনবাবু মুখে ভাত দিয়েছিলেন, হাসতে হাসতে ভাত ছিটকে পড়ল।

বললেন, সে আর বলবেন না মশাই—সে এক ইতিহাস।

তারপর উনি খেতে খেতে পালোয়ান হবার গল্প বলতে লাগলেন।

ডালটনগঞ্জে প্রথম চাকরি নিয়ে এসেছি। মাইনে বেশি পাই না। টাকা-পয়সার বড়ই টানাটানি। টাকা পয়সা রোজগারের শর্টকাট মেথডগুলো তখনও রপ্ত হয়নি। একটা লং মেথড মাথায় এল।

আমি বললাম, মানে?

বাঁশ-কাটা কুলিদের দলে দুজন রং-রুট ছিল। একজনের বাড়ি দ্বারভাঙা জেলা, অন্যজনের ছাপরা। দুজনেরই চেহারা একেবারে দশাসই। দেখলেই মনে হয় প্রফেশনাল কুস্তিগীর। ওরা দুজনেই, রাম সিং আর দাশরথ, নতুন এসেছিল। বাইরের লোক দূরে থাকুক, আমাদের কুলিরাই ওদের ভাল করে চেনে না। একদিন ওদের দুজনকে পাঠিয়ে দিলাম ছিপাদোহর। সেখানে তখন মালদেও বাবুর কাজ হচ্ছিল। ছিপাদোহর হয়ে রেল লাইনটা ডালটনগঞ্জ এসেছে। ছিপাদোহর থেকে সামান্যই রাস্তা। তখন ফার্স্ট ক্লাসেরই ভাড়া ছিল বোধ হয় এক টাকা।

দাশরথ আর রাম সিংহকে ছিপাদোহরে পাঠিয়ে দিয়ে লাল-নীল ব্যাঙ্ক পেপারে প্যামপ্লেট ছাপিয়ে দিলাম দুজন পালোয়ানের ছবি দিয়ে। প্যামপ্লেটে বলা হল যে, পালোয়ান রাম সিং ও পালোয়ান দাশরথ সিং, ভীষণ এক জীবন-মরণ কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে—দশদিন পর হাটীয়ার পাশের বড় মাঠে। টিকিট দু-আনা মাত্র। আশ্চর্য! প্রথম তিন দিনে দেড় হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়ে গেল। তারপরও যখন টিকিট বিক্রি হতে লাগল, তখন আমার ভয় করতে লাগল।

এদিকে রাম সিং আর দাশরথ সিং ছিপাদোহরের বাবুদের মোকামের কুয়োতলার পাশে, নরম মাটি, নিমপাতা আর হলুদের গুঁড়ো মেশানো আখড়ায় চটাপট ফটাফট করে মহড়া দিয়ে চলেছে। ওদের কাছে এক শো টাকা ক'রে প্রাইজ, একজোড়া করে নাগরা জুতে , একজোড়া ধুতি এবং এক হাঁড়ি করে হাঁড়িয়া কবুল করেছিলাম। তারা দিনরাত 'জয় বজরঙ বলী কা জয়' বলে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ধাই-ধপ্পর করে কুস্তির আখড়া সরগরম করে রাখল।

এদিকে প্রতিযোগিতার দিন আসন্ন। আখড়া তৈরি হয়েছে। চারপাশে বেড়া দেওয়া হয়েছে। বেড়ার গায়ে গায়ে কচি শালপাতার ফেস্টুন লাগানো হয়োছে। মহাবীরের নিশান ওড়ানো হয়েছে আখড়ায়, একটা লম্বা বাঁশের ডগায়। এখন পালোয়ানেরা এসে পড়লেই হয়।

ডালটনগঞ্জ স্টেশনে কী ভিড়। ফার্স্ট ক্লাসের দরজায় দাশরথ সিং আর রাম সিং দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু হাসছে। আসবার আগে ওদের দুজনের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে এখানের লোকেরা চিনতে না পারে। সে হই-হই ব্যাপার। কাঠ-বওয়া ট্রাকের মাথায় তাদের দুজনকে বসিয়ে 'জয় বজরঙবলী কা জয়' ধ্বনি দিতে দিতে পৃষ্ঠপোষকেরা ওদের নিয়ে সোজা আখড়ায়। আমি হলাম রেফারি। একটা নীল রঙা সুইমিং ট্রাক ছিল অনেকদিনের পুরনো। হেদোতে সাঁতার কাটতাম। সেটা পরলাম আর রামলীলার মেক আপ ম্যানের কাছে গিয়ে ভাল করে মেক আপ নিলাম, ভূষোকালি, সাদা রং ইত্যাদি মেখে, যাতে আমাকে বুড়ো কুস্তিগীর বলে মনে হয়।

দর্শক তো সবই বাঁশ কিংবা কাঠ, গোলার কুলি। ভেবেছিলাম ধরতে পারবে না।

কুস্তি খুব জোর জমে উঠেছে। মাঝে মাঝে আমি হুইসেল দিচ্ছি। ঘন ঘন দর্শকবৃন্দ হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে ব্যাপার গুরুতর। রাম সিং একটা গুণ্ডা। ও

দাশরথকে ধরে এমন আছাড় মারতে আরম্ভ করল যে, কী বলব। দেখলাম, দাশরথ হাত নেড়ে রাম সিংকে কী বলল এবং আমাকেও যেন কী বলল। কিন্তু রাম সিং ছাড়ছে না মোটে। ধুপধাপ করে আছড়ে চলেছে। মেরে ফেলে আর কী। এমন সময় দাশরথ আখড়া ছেড়ে দৌড়ে পালিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলল, ঈ রমেনবাবু, আইসি বাত থোড়ী থা। হামকো নাগড়া না চাইয়ে, কুচ্ছু না চাইয়ে, আরে বাপ্পারে বাপ্পা , বলেই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

যেই না কথা, আর রমেনবাবু বলে আমাকে ডাকা, আমার কুলিদের মধ্যে জগদ্দল বলে যে একটা কুলি ছিল, ভারী সেয়ানা, সে সঙ্গে সঙ্গে মাল ক্যাচ করে ফেলল। চেঁচিয়ে আর সবাইকে বলল, আরে ঈ ত রমেনবাবু বা। ঔর হামারা দাশরথ ঔর রামসিং বা।

দৌড়, দৌড়, দৌড়। দৌড়ে গিয়ে ট্রাকে বসলাম, বসে সঙ্গে সঙ্গে একবারে স্টেশন। ভাগ্যক্রমে ট্রেন তক্ষুনি ছাড়ছিল, মানে ছেড়ে গেছিলই, সেই অবস্থায় দুজন লাল-নীল ভেলভেটের ল্যাঙোট পরিহিত অনুচর সঙ্গে নিয়ে লাফিয়ে উঠলাম গাড়িতে। ঘামে ততক্ষণে সব রঙ গলে গেছে। দাশরথ রাম সিংকে গালাগাল করছে আর রাম সিং দাশরথকে গালাগাল করছে।

গল্প শুনে হাসতে হাসতে মরি।

শুধোলাম, ফিরলেন কী করে তারপর আবার?

উনি বললেন, তক্ষুনি ফিরি! সাতদিন পরে অবস্থাটা শান্ত হলে ডালটনগঞ্জে ফিরলাম। ফিরেই মালদেওবাবুর পদতলে অনুচরদ্বয়সমেত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হলাম।

মালদেওবাবু খুব হাসতে লাগলেন। বললেন, 'এই রকম বুদ্ধি , ভাল দিকে লাগালে কী হত?'

সেইদিন থেকে পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়ে হেল আমার। অনুচরেরাও চাকরিতে পুনর্বহাল হল। আমিও মোটা নিট প্রফিট করলাম। অবশ্য কুস্তিগীরদেরও ঠকাইনি। সকলে খেতে চাইল। একদিন কেচকীতে পিকনিক হল। সব খরচা আমি দিলাম।

এ রকম গল্প-গুজব করতে করতে খাওয়া হল। রমেনবাবুর স্টকে আরও গল্প ছিল। তার প্রতিটি গল্প এমনই মজার। হাসতে-হাসতে পেট ফাটে শুনে।

প্রায় দুপুর দুটো অবধি রইলেন রমেনবাবু। তারপর আবার সাইকেলে চড়ে পাহাড়ি পথে বাঁ হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে, আর ডান হাত নেড়ে নেড়ে, 'পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেঁধে আমায়, খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর'—গান গাইতে গাইতে পাড়ি জমালেন।



সতেরো

মারিয়ানার কাছ থেকে গোটা চারেক বই আনিয়েছিলাম লোক মারফত। একটি বই নিয়ে বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে মোড়ায় পা তুলে দেখতে লাগলাম। আমি কোনও বিশেষ বই চাইনি। কারণ মারিয়ানার কাছে কোন বই আছে, কোন বই নেই তা আমার জানার কথা নয়। মারিয়ানা তিন লাইনের সুন্দর একটি চিঠি পাঠিয়েছে বইগুলির সঙ্গে। আমাকে শিরিণবুরু যাবার নেমন্তন্ন জানিয়ে।

জার্মান কবি রিলকের 'সনেটস টু অরফ্যিয়ুস' খুলতে গিয়েই মারিয়ানার নাম লেখা দুটি সাদা খাম বইটি থেকে মাটিতে পড়ে গেল। খাম দুটিকে তুললাম। মারিয়ানাকে নিশ্চয়ই কেউ লিখেছিল। ও বইয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। আমাকে বই পাঠানোর আগে বের করে নিতে ভুলে গেছে।

চিঠি দুটি রীতিমত ভারী-ভারী ঠেকল। পরের চিঠি। ভদ্রতার সবরকম মাপকাঠিতেই অন্যের চিঠি পড়া গর্হিত অপরাধ। চিঠি দুটি বেতের টেবলের উপর তুলে রাখলাম।

তারপর রিলকের কবিতা পড়তে চেষ্টা করলাম। অন্য বইগুলো নাড়াচাড়া করলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন মন বসল না তখন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, আমার সমস্ত মন ওই চিঠি দুটির মধ্যে কি আছে তা জানার অসভ্য আগ্রহে অধীর। সাধে কি বলি যে, জংলি হয়ে গেছি।

সব বুঝি। সব বুঝি, তবু সুমিতাবউদি যেমন মুখ করে কুলের আচার খান, যশোয়ন্ত যেমন মুখ করে হুইস্কির বোতল খোলে, আমি বোধ হয় তেমনি মুখ করে চিঠি দুটি খুললাম।

হাতের লেখাটি ভাল না। বড্ড জড়ানো—খুব তাড়াতাড়ি লেখা। বড় প্যাডে লেখা চিঠি। প্রথম চিঠিটায় 'মারিয়ানা-সোনা' বলে সম্বোধন, 'সুগত' বলে সমাপ্তি।

কলকাতা
১৭/৮

আমার মারিয়ানা সোনা,

গতকাল মেট্রোতে একটি ছবি দেখলাম 'The Sandpipers' এলিজাবেথ টেলর ও রিচার্ড বার্টনের। এডওয়ার্ড বলে একটি চরিত্রে বার্টন অভিনয় করেছেন। সেই চরিত্রটি ও লিজ টেলরের মিস রেনোল্ডস বড় ভাল লাগল। তোমায় গল্পটি বলছি।

পাহাড় ও জঙ্গল-ঘেরা সমুদ্রের পাশে একটি সুন্দর দু-কামরা উঁচু বাড়ি। চারদিকে কাঁচের জানালা।

বাড়ির সামনে সারাদিন সি-গালেরা জলের উপর উড়ে বেড়ায়, ভেসে বেড়ায়, আর স্যান্ডপাইপার পাখিরা ঝাঁকে-ঝাঁকে বালুবেলায় ছড়িয়ে পড়েই আবার উড়ে যায়।

মিস রেনোল্ডস একা-একা থাকেন এই লোকালয়বর্জিত নির্জন স্থানে। একেবারে একা নয়। সঙ্গে বছর দশেকের ছেলে থাকে।

কৈশোরের শেষে, মানুষের কৌতূহল যখন অসীম থাকে, যে বয়সে ছেলেরা হামানদিস্তায় হাতঘড়ি গুঁড়িয়ে ঘড়ি কী করে চলে সেই তথ্য আবিষ্কার করতে চায়, ঠিক সেই বয়সে, শারীরিক সম্পর্কে মজাটা কোথায় তা বুঝতে গিয়ে মিস রেনোল্ডস অন্তঃসত্তা হয়। সমাজের মানুষ এবং বাবা-মা'র স্বাভাবিক কারণে তার শরীরের মুকুলিত অন্য শরীরটিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু মিস রেনোল্ডস তা না শুনে এবং পাছে বাবা-মায়ের কোনও অসম্মানের কারণ ঘটায়, সেই কনসিডারেশনে, নিজের দেশ ছেড়ে বহু দূরে এক অন্য রাজ্যে (আমেরিকাতেই) এসে এই পাহাড়-সমুদ্রের কোলে বাসা বাঁধে।

পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে মিস রেনোল্ডসের অনেকানেক অভিযোগ ছিল। যেমন তোমাদের অনেকেরই আছে। ওর বারো বছর বয়স থেকেই, যেহেতু ও দেখতে সুন্দরী ছিল, পুরুষেরা ওর কাছে ঘেঁষে, কাছে আসে, অন্তরঙ্গতা করতে চায়। কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসা যাকে বলে, তা ও কোনওদিন কোনও পুরুষের মধ্যে দেখেনি। ভালবাসার সংজ্ঞাও জানত না। ওর অন্তরের অভিধানে পুরুষের ভালবাসা অর্থবাহী হয়ে অন্য একটি জ্বলন্ত শব্দ লেখা হয়ে গিয়েছিল। যা কেবল দাহ বাড়ায়, দাহ নেবায় না।

প্রকৃতিকে সত্যি-সত্যি ভালবাসত মিস রেনোল্ডস। ছবি আঁকত, সারাদিন ছবি আঁকত। ডানা-ভাঙা স্যান্ডপাইপার পাখিকে বুকে তুলে ঘরে এনে যত্ন করত। স্বার্থপর ও নোংরা পুরুষ মানুষের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র নিশ্চিন্ত স্থান যে প্রকৃতি, তা সে বুঝেছিল।

কিন্তু একদিন তার জীবনে এডওয়ার্ড এল। এডওয়ার্ড বিবাহিত। স্ত্রীর সঙ্গেই সে থাকে। বিশ্বস্তা স্ত্রী। সুন্দরী স্ত্রী। স্ত্রী তাকে ভালবাসে, সেও স্ত্রীকে ভালবাসে। এডওয়ার্ড সুপুরুষ। বিখ্যাত মিশনারি স্কুলের কর্ণধার। নিষ্ঠায়, আদর্শে, পবিত্রতায় বিখ্যাত। মিস রেনোল্ডসের ছেলের স্কুলে ভর্তির ব্যাপার নিয়ে দুজনের প্রথম দেখা হল।

মিস রেনোল্ডস জীবনে এমন পুরুষ মানুষ দেখেনি আর আগে। সুপুরুষ তো বটেই। শিক্ষা আছে, কিন্তু দম্ভ নেই। চাওয়া আছে, কিন্তু চাতুর্য নেই। জ্বালা আছে কিন্তু সে জ্বালা বিকিরিত হয় না। নিজের বুকে ঝড় উঠলে নিজে নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে সে ঝড়কে সে প্রশমিত করে, সেই ঝড়কে কূল ছাপিয়ে অন্য মনে ঠেলে পাঠায় না।

এডওয়ার্ড বিবাহিত। অথচ সেও নতুন করে ভালবাসল। সমাজের চোখে এ বিষম অপরাধ। নিজের বিবেকের কাছে সে সব সময়েই ছোট হতে থাকল।

মাঝে-মাঝে এডওয়ার্ড এসে রাতে থাকত মিস রেনোল্ডস-এর স্বপ্নের মতো ঘরে। স্যান্ডপাইপারের ডানার গন্ধবাহী হাওয়ার বাস নিত বুক ভরে। সমুদ্রের ফেনোচ্ছ্বাসে নিজের সমাহিত উচ্ছ্বাসকে দিত ডুবিয়ে।

ধীরে-ধীরে ওদের অন্তরঙ্গতা যখন ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতম হয়ে উঠল, তখন একদিন বিবেকসম্পন্ন মূর্খ পুরুষ এডওয়ার্ড তার স্ত্রীকে জানাল তার নতুন ভালবাসার কথা।

মিস রেনোল্ডস যখন শুনল যে এডওয়ার্ড তার স্ত্রীকে তাদের সম্পর্কের কথা বলেছে, সে ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে কাঁদতে লাগল। কারণ সে সত্যিই নিজেকে প্রকৃতির কন্যা বলে মনে করত। সে বলল, এতে বলার মতো কী ছিল? পাপের কী ছিল? একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে গোপনীয় কোনও মধুর সম্পর্ক থাকা কি পাপ? কোন স্বীকৃত গোপনীয়তা দিয়ে কি এ সম্পর্ক ঢেকে রাখা যেত না? তোমার এ কেমন পাপবোধ? তোমার এ কেমন বিবেক? ন্যায়-অন্যায় চেনোনি?

কিন্তু মারিয়ানা, ন্যায়-অন্যায় বিচার আমার মতো, মিস রেনোল্ডসের মতে, দু-একজন পাগল লোকের মত-সাপেক্ষ নয়। তোমাদের বদ্ধমূল সংস্কার, তোমাদের বিবেক, তোমাদের সমাজ কিন্তু এডওয়ার্ড যে শাস্তি পাবার যোগ্য নয় তাকে সেই শাস্তিই দিল। মিস রেনোল্ডসও শাস্তি পেল। এডওয়ার্ডের স্ত্রীও সেই শাস্তি পেল। শাস্তি কোনও আদালতে হল না বটে, কিন্তু এডওয়ার্ড অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বিবেক-দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তার স্ত্রী এবং রেনোল্ডস দুজনকেই ছেড়ে চলে গেল। একজন স্বয়মারোপিত বিচ্ছেদ পেল; অন্যজন অন্যারোপিত বিচ্ছেদ। আর এডওয়ার্ড ধর্মপুস্তকের শুকনো পাতা খুঁড়ে-খুঁড়ে সোনা খুঁজতে খুঁজতে তার কবরের দিকে এগিয়ে চলল।

বুঝলে মারিয়ানা, তোমরা বড় খারাপ, তোমরা বড় খারাপ। তোমরা যাই চাও না কেন, তা ব্যক্তিগত মালিয়ানায় চাও। মানুষের মনকে যে লখীন্দরের বাসর ঘরের মতো পরিসরে আটকে রাখা যায় না, এবং গেলেও যে তাতে সাপের মতো সূক্ষ্ম শরীরে ভালবাসার প্রবেশ সম্ভব, তা তোমাদের কিছুতেই বোঝানো গেল না।

এডওয়ার্ড চলে গিয়ে হয়তো বেঁচেছিল, আমি চলে না যেতে পেরে মরছি। অনুক্ষণ মরছি। তুমি, আমি, মহুয়া, আমরা সবাই রেনোল্ডস, এডওয়ার্ড ও এডওয়ার্ডের স্ত্রীর ছায়া—অবিকল ছায়া নয়—বিকৃত ছায়া।

ছবিটি বড় ভাল লাগল। দেখতে-দেখতে তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল। আমার এই একতরফা, পরিণতিহীন, ভবিষ্যৎহীন ভালবাসার সমাপ্তি হয়তো কেবলমাত্র আমার মৃত্যুতে। একটা পাগল, অবুঝ মন নিয়ে জন্মেছিলাম—সেই অশান্ত, অতৃপ্ত মন নিয়েই পৃথিবী থেকে ফিরে যাব।

ভয় নেই। তোমার কোনও ভয় নেই। প্রেতাত্মা হয়ে তোমাকে ভয় দেখাব না; বরং স্বর্গ যদি থেকে থাকে, সে স্বর্গের দরজায় বসে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব—কবে তুমি জঙ্গলের গন্ধ মেখে রাধাচুড়োর পুষ্পস্তবকে সেজে, সেই দারুণ দরজায় এসে পৌঁছবে—তার দিন গুনব।

আদর জেনো

ইতি—তোমার সুগত

পরের চিঠিটা খুললাম, খুলেই পড়তে শুরু করলাম। আমার ভিতরে উত্তেজনা বাড়ছিল সঙ্গে ঔৎসুক্যও।

১৫/৯ কলকাতা

আমার মারিয়ানা,

কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোট করতে মন চায় না। তার চেয়ে কৃতজ্ঞতা জানানোই ভাল। কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে আছে।

তুমি আজ আমায় যা দিয়েছ তা তোমার কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়তো, কিন্তু আমার কাছে তার কী দাম, তুমি তা কোনও দিনও জানবে না। তোমার কাছে এই দানের কণামাত্র মূল্য থাকলে আমার গর্ব হত। তাহলে জানতাম, বরাবর তোমার কাছে শুধু চাইনি, বদলে কিছু দিতেও পেরেছি। জেনে আনন্দিত হতাম যে, আমার কাছ থেকেও তোমার কিছু নেওয়ার ছিল।

আমি জানি, জীবনের যে সব বড় বড় পাওয়া, সমস্ত শরীর মনকে এক স্বর্গীয় দ্যুতিতে ভর দিয়ে যায়, যার রোমাঞ্চ সমস্ত শরীর, সমস্ত সত্তা বারে বারে শিহরিত হয়, সেইসব অনুভূতির স্বীকৃতি একটি-দুটি গল্প লিখে দেওয়া যায় না। হয়তো তার স্বীকৃতি কিছু দিয়েই দেওয়া যায় না। তার চেয়ে নিজের মনে মনে, নিজের একাকিত্ব, নিজের শীতার্ত দিনগুলি সেই সব দুর্মূল্য মুহূর্তর উষ্ণতার স্মৃতি দিয়ে আজীবন ভরিয়ে রাখাই ভাল।

তোমাকে যতদিন দেখছি, তুমি বরাবর আমাকে বলে এলে, তুমি খারাপ, তুমি ভীষণ খারাপ। আমি জানি না, খারাপ বলতে তুমি কী বোঝো? আমার সর্বস্ব বিলানো ভালবাসাটাই কি খারাপত্বর নিদর্শন?

যেটা সত্যি, সেটা সত্যিই। সত্যির সূর্যটাকে, চোখের সামনে দু'হাত তুলে কি বেশিদিন আড়ালে রাখা যায়? এই সত্যিটাকে স্বীকার করা সম্বন্ধে বোধহয় তোমার কোনও কিছুই করণীয় নেই। এর জন্য তোমার কোনও দুঃখও নেই। শুধু মাঝে মাঝে আমাকে 'খারাপ' বলেই আমার প্রতি তোমার সব কর্তব্য শেষ।

দুঃখ যা পাবার তা আমাকে একাই পেতে হয়। এই সূর্যের মতো সত্যিটাকে অনুক্ষণ মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে নিজেকে আমি প্রতিমুহূর্তে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছি। অথচ তা তুমি কোনও দিনও চোখ দিয়ে দেখলে না।

তোমাকে বরাবর চিঠিতে বা অন্যভাবে যা বলেছি, আমার শারীরিক সত্তাও মাঝে মাঝে আবেগের সঙ্গে সে কথাই বলতে চায়। সেই সত্তারও একটা নিজস্ব ভাষা আছে। তোমাকে একমুহূর্ত বুকে জড়িয়ে ধরে সে যদি এতদিনের শীতল তপস্যার শৈত্যকে উষ্ণ করে নিতে পারে, তাতে তোমার এত তীব্র আপত্তি কেন?

মারিয়ানা, আমি জানি যে, তুমিও আমাকে ভালবাসো। এক বিশেষভাবে। আমি অন্তরে অন্তরে তা নিশ্চয়ই জানি। আমি যে জানি, সে কথা তুমিও জানো। যদি আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালই বাসি তবে একমুহূর্তের জন্যে আমার বুকে আসতে তোমার এত সংকোচ কীসের? ভয় কীসের? কীসের তোমার এই দুর্বোধ্য অপরাধবোধ?

আমি জানি না, তুমি কোনও দিন আমাকে বুঝবে কিনা; ভরসা নেই বুঝবে বলে। আজ অথবা কাল, শিগগিরই অথবা কিছুদিন বাদে তুমি কাউকে বিয়ে করবে—তখন আমার চোখের সামনে থেকে কতদূর চলে যাবে তুমি। রাতের অন্ধকারে চিৎকার করে কেঁদেও তোমার সাড়া পাব না—তুমি তখন তোমার স্বামীর বুকে শুয়ে থাকবে। তোমার স্বামীর সঙ্গে আমি কীরকম ব্যবহার করব আমি বুঝতে পারি না। আমায় হাসতে হবে, তার সঙ্গে মিশতে হবে, তার কাছে সব সময় গোপন থাকতে হবে, লুকিয়ে রাখতে হবে আমার এই রক্তক্ষরা বঞ্চিত হৃদয়টাকে। যে মারিয়ানা আমার সব কিছু, সেই মারিয়ানাই সে চিরদিনের মালিক হয়ে যাবে। তার শরীরের, তার মনের, তার যা কিছু আছে; সব কিছুর।

সে যে কে, তা আমি এখনও জানি না। সে তখন আমার সামনে ঘুরবে-ফিরবে, আস্ফালন করবে, বীরত্ব দেখাবে, আমারই সামনে বসে আমার সমস্ত সুখ চিবিয়ে চিবিয়ে

খাবে। অথচ আমি আমার রাইফেলে হাত ছোঁয়াতে পারব না। ভাবতে পারি না। জানি না, সে আমার চেয়ে কতগুণ ভাল হবে। এবং এ জন্মে কী করলে আমি তার মতো হতে পারতাম, তাও জানি না। আমি তো একজন সামান্য মানুষ। সে হয়তো অসামান্য হবে। আমার সমস্ত অসামান্যতা তো শুধু আমার এই অবিশ্বাস্য ভালবাসারই মধ্যে।

জানি না, বিয়ের পর পর সেই মানসিক ও শারীরিক আনন্দের মধ্যে আমার কথা হয়তো তোমার আর মনেই পড়বে না। তবু ভাবি, হয়তো ঘোর কেটে গেলে, দু'-এক বছর পেরিয়ে গেলে, তখন হয়তো তুমি বুঝতে পারবে যে, তোমার জীবনে সুগত বলে একজন অনেক দোষে দোষী, সাধারণ লোক এসেছিল, যাকে তুমি তোমার চোখের অনুপ্রেরণায় একজন মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে পারতে—তাকে একজন বড় লেখক করতে পারতে। তাকে তুমি বাঁচাতে পারতে। সে তোমাকে তার মা-বাবা, ভাই-বোন-স্ত্রী সকলের চাইতে বেশি ভালবেসেছিল। তাকে তুমি দু'হাত দিয়ে যতই মানা করো না কেন, তবু সে কালবৈশাখি ঝড়ের মতোই এক সময় তোমার জীবনে এসেছিল। সে তোমার সমস্ত শরীরে মনে স্বর্ণলতার মতো ভালবাসার নরম আঙুল ছুঁইয়েছিল। হয়তো এক দিন একথা তুমি বুঝতে পারবে। কিংবা জানি না, হয়তো এ কথা কোনওদিনও বুঝবে না।

তুমি যেদিন বিয়ে করবে, সেদিন আমি কী করব জানি না। সেদিন আমি এমন কিছু নিশ্চয় করব না যাতে তোমার আনন্দটা মাটি হয়, যাতে তোমার অসম্মান হয়, যাতে তুমি অপ্রতিভ হও। অন্তত তেমন কিছু আমার করা উচিত নয়। কিন্তু যখনই সে কথা ভাবি, এখন থেকেই কেমন অস্বস্তি লাগে।

সেদিনটির কথা ভাবতেও আমার দমবন্ধ হয়ে আসে।

কাল আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি। সারারাত কেবল সেই মুহূর্তটির কথা ভেবেছি আর ভাললাগায় ভরে গেছি। শুয়ে শুয়ে তোমার কথা ভেবেছি। আমি যে অনুভূতিকে আমার পরম সম্মান বলে মনে করেছি, তাকে তুমি তোমার অসম্মান বলে ভুল করোনি তো? ভেবেছি; আর ভয় পেয়েছি। আমি সজ্ঞানে কোনও দিন তোমাকে অসম্মান করার কথা ভাবতে পারি না—যদিও তুমি আমাকে কোনও দিনও সম্মান দাওনি—আমাকে বরাবর ভুলই বুঝেছ।

তুমি যা দিয়েছ আমাকে, তোমার যা হারিয়েছে; তা তোমার অসীম ভাণ্ডারের এক কণামাত্র। কিন্তু আমার শূন্য ভিক্ষাপাত্র সেই পরশ পাথরের এক কণায় সোনা হয়ে গেছে। সত্যিই সোনা হয়ে গেছে।

মারিয়ানা, আমার সকলকে শুনিয়ে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। আমাকে যে যাই বলুক, মারুক, বকুক, আমাকে অপমান করুক, অসম্মান করুক—সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াক; তবু আমি তোমাকে ভালবাসি।

তোমাকে আমি সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত ভালবাসা দিয়ে ভালবাসি।

প্রতিবারের নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমি তোমায় নতুন করে ভালবাসি।

ইতি—

তোমার সুগত

পুনঃ। তুমি শিরিণবুরু পৌঁছাবার আগেই হয়তো আমার এ চিঠি সেখানে পৌঁছে তোমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকবে।

চিঠি দুটি পড়া শেষ করে, বাংলোর হাতায় চেয়ে ভাবছিলাম যে, মনে মনে আমি আদৌ এই আকস্মিকতার জন্যে তৈরি ছিলাম না। যা শুনেছি, মারিয়ানার টুকরো-টুকরো কথায়, তাতে ভদ্রলোকের আপাতদৃষ্টিতে দুঃখ পাওয়ার মতো কিছুই নেই। শিক্ষা আছে, স্বাস্থ্য আছে, অর্থ আছে, যশ আছে, বিশ্বস্তা ও সুন্দরী স্ত্রী আছে, তবুও কেন দুঃখ, এত দুঃখ?

কে এর জবাব দেবে?



আঠারো

টোরী বস্তিতে ভাল দুর্গাপূজা হয়। রুমান্ডি থেকে জঙ্গলে জঙ্গলে একটা রাস্তা লাতেহার গিয়ে পৌঁছেছে। লাতেহার থেকে টোরী। জিপেও সে পথে অত্যন্ত কষ্ট করে যেতে হয়। সুমিতাবউদি ফিরে এসেছেন। তাই ঘোষদা অষ্টমী পুজোর দিন ভোরবেলা বউদিকে নিয়ে রুমান্ডিতে এলেন। যশোয়ন্তকে আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন বউদি। যশোয়ন্তও এসে হাজির হল। কলকাতা থেকে বউদি আমার এবং যশোয়ন্তের জন্যে ধুতি ও তসরের পাঞ্জাবি বানিয়ে এনেছেন।

বললেন, পরো শিগগিরি। চান করে এসে পরো—আজ সকালে বীরাষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যাব টোরীতে। চাঁদোয়া টোরী।

যশোয়ন্ত সম্বন্ধে আমার কাছে ঘোষদা যতই বুলি কপচান না কেন, বউদির কাছে একেবারে চুপ। ঘোষদা যেন স্ত্রৈণ, শুধুমাত্র সেই জন্যেই নয়। সুমিতাবউদির এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে, উনি যা করেছেন তা যে খারাপ কখনও হতে পারে, তা কারও পক্ষে মনে করাই অসম্ভব ছিল।

আমি আর যশোয়ন্ত জগাই-মাধাই দুই ভায়ের মতো চান করে ধুতি পাঞ্জাবি পরলাম।

যশোয়ন্ত বলল, আরে ইয়ার, ম্যায় চলনে নেই শেকতা ধোতি পেহেনকে। আজ হামারা নাকহি টুট যায়েগা।

বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু যশোয়ন্তকে। কাপালিক কাপালিক। ঋজু অর্জুন গাছের মতো শরীর। মাথায় লাল সিঁদুরের ফোঁটা। বউদি পরিয়ে দিয়েছিলেন। গতকালের ডালটনগঞ্জের পুজোর সিঁদুর।

সকালে আমরা শুধু এক কাপ করে চা খেলাম। বউদির নির্জলা উপবাস। অঞ্জলির আগ পর্যন্ত। যশোয়ন্ত ধুতি হাঁটুর উপর তুলে জিপের স্টিয়ারিং-এ বসল। জিপ ছাড়ার আগে আমার বন্দুকটা নিয়ে পেছনের সিটে আমার ও ঘোষদার মধ্যে দিল। বউদি সামনে বসলেন।

আমাকে যশোয়ন্ত আগে থাকতে বারণ করেছিল যে, ঘোষদা বউদিকে সেদিনের সেই গুলির ঘটনার কথা যেন না বলি।

ঘোষদা যশোয়ন্তকে বললেন, অঞ্জলি দিতে যাচ্ছ, আবার বন্দুক কীসের! মায়ের কাছে যাচ্ছ, তাও কি একটু শান্ত সভ্য হয়ে যেতে পারো না?

যশোয়ন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, আজ যে মহাষ্টমী ঘোষদা, মা যে শক্তিদায়িনী। আজ বীরের দিন—। মার কাছে যাচ্ছি বলেই তো বন্দুকটা নিলাম।

ভারী চমৎকার অঞ্জলি দিলাম টোরীতে।

অন্য এক কাগজ কোম্পানির ফরেস্ট অফিসার মিহিরবাবু ওখানেই থাকেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। অঞ্জলির পর তাঁর বাড়িতে চা-জলখাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না। ভারী ভাল লাগল এই পুজোর পরিবেশ। এই পুজো অনাড়ম্বর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। কলকাতার অ্যামপ্লিফায়ারের কর্কশ চিৎকার নেই, বিকারগ্রস্ত ও ন্যক্কারজনক কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি নেই। এখানে মা দশভূজা নিজের মহিমায় স্মিতহাস্যে ভক্তবৃন্দের সামনে আসীন।

লাতেহারে এসে কাছারির সামনে পণ্ডিতের দোকানে একপ্রস্থ মিষ্টি খাওয়া হল। তারপর আবার রুমান্ডি।

পথে সুমিতাবউদি বললেন, ফিরে হয়তো দেখব মারিয়ানা এসে গেছে। ওকে আনতে গেছে ড্রাইভার অনেকক্ষণ।

বউদি লুচি ভাজলেন। সকালের জলখাবার। সঙ্গে আলুর তরকারি ও আচার—এবং প্রসাদী সন্দেশ। আলু এই রুমান্ডিতে একটি দুষ্প্রাপ্য জিনিস। আলুর তরকারি একটা অতিবড় মুখরোচক খাওয়া এখানে। বাইরে বসে আমরা গল্প করতে করতে খেলাম।

রীতিমতো শীত পড়ে গেছে। কলকাতার ডিসেম্বরের চেয়েও বেশি। সবসময়ই প্রায় গরম জামা গায়ে পরে থাকতে হয়। রোদে বসে থাকতে ভারী আরাম। রোজ পেছনের কুয়োতলায় অন্তর্বাস পরে বসে রামধানিয়াকে দিয়ে সর্বাঙ্গে কাড়ুয়া তেল মর্দন করাই—তারপর ঝপঝপিয়ে বালতি বালতি ঠাণ্ডা কুয়োর জল ঢেলে দেয় রামধানিয়া ওইখানেই। কী আরাম যে লাগে, কী বলব। প্রথম প্রথম অমন বাইরে বসে খালি গায়ে তেল মাখতে লজ্জা করত খুব—লজ্জার চেয়েও বড় কথা, সংস্কারে বাধত। খালি গায়ে বাইরে খোলা আকাশের নীচে ফুরফুরে হাওয়া লাগলে, গায়ে সুড়সুড়ি লাগত। রোদ পড়লে গা চিড়-চিড় করত। যশোয়ন্তই বলে বলে এবং সবসময় আমার পেছনে লেগে লেগে খোলা জায়গায় চান করার অভ্যাস করিয়েছে।

যশোয়ন্ত ধমক দিয়ে বলেছে, তুমি কি মেয়েমানুষ? লোকের সামনে অথবা উদোম জায়গায় গা খুলতে পারো না?

যশোয়ন্ত নিজে নির্বিকার চওড়া পাথরের মতো বুকে একরাশ কোঁকড়া চুল—সরু কোমর—দীর্ঘ গ্রীবা—মাথাভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—সযত্নে বর্ধিত পাকানো গোঁফ—পা থেকে মাথা অবধি কোথাও কোনও খুঁত নেই। পুরুষের সংজ্ঞা যেন! ও কোনওরকম সংস্কারের বালাই নেই—তা ছাড়া অমন সুপুরুষ চেহারাতে ওকে সব-কিছু করাই মানায়।

যশোয়ন্ত বলছিল, কুটকুতে যাবে শিকারে। কুটকু ব্লকে চিফ-কনসার্ভেটর বাইরের কাউকে বড় একটা শিকার-টিকার করতে দেন না। যশোয়ন্ত পারমিট বের করবে ডিসেম্বরে। তখন মারিয়ানার বন্ধু সুগত শিকারে আসবেন। তাই মারিয়ানার অনুরোধে যশোয়ন্ত ওই সময় শিকারের বন্দোবস্ত করেছে। কুটকুতে।

মারিয়ানার কথা আলোচনা হচ্ছে। এমন সময়েই মারিয়ানা এসে পৌঁছাল।

সে এসেই ফিসফিস করে শুকনো মুখে আমার কানে কানে শুধাল, কোনও চিঠি পেয়েছেন আমার, আমার বইয়ের মধ্যে?

আমি যেন ভাল করে জানিইনা, এমনি ভান করে বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছিলাম বটে—তাতে যেন আপনারই নাম লেখা ছিল। থাকলে সেই বইয়ের মধ্যেই আছে। যেখানে ছিল।

মারিয়ানা উদ্বিগ্ন চোখে বলল, আছে?

ওর চোখ দেখে বুঝতে পারলাম, ও আমার মুখ দেখে বুঝতে চাইছে চিঠি দুটি আমি পড়েছি কিনা। আমি পাকা জোচ্চোরের মতো বললাম, ভয় নেই। চিঠি পড়িনি আমি। পরের চিঠি পড়ার কোনও অসভ্য কৌতূহল আমার নেই।

মনে হল, বিশ্বাস করল ও কথাটা। তারপর আমাদের কাছে না বসে সুমিতাবউদির কাছে যাবার ছুতোয় আমার ঘরের টেবিল হাতড়ে চিঠি দুটো বের করল। নিশ্চয়ই বইটার মধ্যে থেকেই। তারপর মানসচক্ষে দেখতে পেলাম ওর হাতব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল চিঠি দুটো।

বেশ কাটল অষ্টমীর দিনটি। হাসি, গান, হৈ-হুল্লোড়, তাস খেলা, দাবা খেলা, কোনও খেলাই বাকি রইল না।

সন্ধে নামতে না নামতেই বেশ হিম পড়তে লাগল। রামধানিয়াকে ডেকে যশোয়ন্ত বড় বড় শলাই গাছের গুঁড়ি এনে বাংলোর হাতায় জ্যাকারান্ডা গাছের গোড়ায় আগুন ধরাল। আমরা সকলে আগুনের চারপাশে বসলাম গোল হয়ে।

আমাদের পীড়াপীড়িতে মারিয়ানা গান শোনাতে রাজি হল। কিন্তু গান শুরু করার আগেই বাংলোর গেট দিয়ে গ্রামের একটা কুকুর প্রাণপণে দৌড়ে ভিতরে ঢুকল, এবং পেছন পেছন আর একটি কুকুর তার চেয়েও জোরে ধাওয়া করে ঢুকল। এবং দুজনেই আমাদের থেকে প্রায় পঁচাত্তর গজ দূর দিয়ে কোনাকুনিভাবে হাতাটাকে পেরিয়ে কাঁটাতারের বেড়া টপকে আবার বাংলোর বাইরে জঙ্গলে চলে গেল।

যশোয়ন্তকে দেখলাম, উঠে দাঁড়িয়েছে।

কুকুর দুটো অদৃশ্য হতেই বলল, শালার তো বড় সাহস।

ঘোষদা শুধোলেন, কোন শালার?

যশোয়ন্ত বলল, চিতাটার। একেবারে ভরসন্ধ্যায় বাংলোর সীমানায় ঢুকে কুকুর তাড়ায়!

আমরা সমস্বরে বললাম, পেছনেরটা চিতা নাকি? যশোয়ন্ত বলল, তা নয় তো কী? দৌড়ানোর ঢঙ দেখে বুঝতে পারলে না? চিতার চাল আলাদা।

চিতা আর কুকুরের উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গেটের কাছে দেহাতি চাদরে মাথা ঢাকা একটি মূর্তি এসে দাঁড়াল। শরীরের গড়ন দেখে মনে হয় চেনা চেনা। এমন সময় চিতাটা যেমন করে কুকুরটাকে তেড়ে গিয়েছিল, প্রায় অমন করেই যশোয়ন্ত লোকটার দিকে ধেয়ে গেল এবং তাকে ধাওয়া করতে দেখেই লোকটাও ঊর্ধ্বশ্বাসে সুহাগী গ্রামের দিকে দৌড়াল।

কিন্তু যশোয়ন্ত বোসের সঙ্গে দৌড়ে পারে এমন লোক এ তল্লাটে বেশি নেই। একটু গিয়েই যশোয়ন্ত মোড়ের মাথায় লোকটাকে ধরে ফেলল। তারপর চাদর মোড়া অবস্থায়ই তাকে রাস্তার ধুলোয় ফেলে লাথি কিল চড় ঘুসি মারতে লাগল। লোকটির আর্তস্বর শরতের রাতে বন-পাহাড় মথিত করে তুলল। গলার স্বর শুনে মনে হল ওই টাবড়ের ছেলে আশোয়া। কিন্তু হঠাৎ যশোয়ন্ত এমন করে মারছে কেন? আমি দৌড়ে গেলাম কিন্তু ফলে দু-একটা ঘুসি খেলাম মাত্র, তাকে থামাই আমার এমন সাধ্য কী?

এমন সময় সুমিতাবউদি এসে যশোয়ন্তকে প্রায় আক্ষরিকভাবে জড়িয়ে ধরলেন এবং সেই ফাঁকে আশোয়া মাটি থেকে উঠে চাদরটা কুড়িয়ে নিয়ে অলিম্পিক স্প্রিন্টারের গতিতে সুহাগী বস্তির দিকে পালাল।

সুমিতাবউদি বললেন, লোকটাকে অমন করে মারছিলে কেন?

যশোয়ন্তকে খুব উত্তেজিত দেখাল। ও বলল, বলব না! কারণ ছিল বলেই মারছিলাম।

আমাকে কিছু না বললেও বুঝলাম, সেদিনের সেই গুলি-ঘটিত ব্যাপারে ওরও কোন হাত ছিল না। ও হয়তো জগদীশ পাণ্ডেদের ইনফর্মার।

জুম্মান রাতে পোলাও রেঁধেছিল। পোলাও এবং পাঁঠার মাংসের লাব্বা। সঙ্গে তরুর। রায়তা বানিয়েছিলেন বউদি। জুম্মান সত্যিই অনেক পদ রাঁধতে জানে। খাসিরই যে কত পদ রাঁধে তার ইয়ত্তা নেই। চাঁব, চৌরী, লাব্বা, পায়া, কোর্মা, কাবাব, কলিজা, কবুরা—শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বিভিন্ন রান্না।

এই খাওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের মধ্যে নানারকম সংস্কার আছে। আমার বন্দুক কেনার পরে পরেই একটি বুড়ো ট্রাক ড্রাইভার, যার সঙ্গে আমার জানা-শোনা ছিল, এসে একদিন আমাকে বলল, 'হুজৌর আপ কভি ভাল্ মারনেসে উসকা কবুরা মুঝে দিজিয়েগা। গোস্তাফী মাফ কিজিয়েগা হুজৌর।' অর্থাৎ আমি যদি কখনও ভাল্লুক মারি তাহলে ভাল্লুকের শরীরের এক বিশেষ অংশ যেন তাকে দিই।

এ কেমন বেয়াদবি আবদার? আবদার শুনে বুঝলাম না, রাগ করব কি করব না। জুম্মান দেখি মুখ নিচু করে আছে। আমার মনে হল, ও হাসি চাপার চেষ্টা করছে। আমার সামনে হেসে ফেললে বেয়াদবি হবে বলে আপ্রাণ হাসি চাপার চেষ্টা করছে।

লোকটা চলে যেতে, আমি জুম্মানকে ডেকে শুধোলাম, লোকটি এমন অনুরোধ কেন করল? ভাল্লুকের কবুরা কি কোনও ওষুধে লাগে? জুম্মান মাথা নিচু করেই বলল, না হুজৌর, ভাল্লুকের কবুরা খেলে কমজোরী মানুষও একদম মস্ত্ হয়। এই ড্রাইভারের বয়স সত্তর, কিন্তু ছ'মাস হল তৃতীয় পক্ষের বউ ঘরে এনেছে। বউয়ের বয়স পঁচিশ।

সেদিন মনস্থ করেছিলাম একটা নিদারুণ পরোপকার করার জন্যেও আমার অন্তত একটি ভাল্লুক মারা দরকার।

আমরা দেখতে বসলাম। এখনও ফায়ার-প্লেসে আগুন লাগে না। সুমিতাবউদি বলছিলেন, নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির শেষ অবধি ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বালাতে হবে—নইলে অত্যন্ত কষ্ট পেতে হবে শীতে।

যশোয়ন্ত বলল, তোমাদের নিরেট মাথা বলে সারা ঘর গরম করার জন্যে মণ মণ কাঠ পোড়াও। তার চেয়ে আমার মতো দু আউন্স তরল জিনিস পেটে ঢালো, সারা রাত পেটের মধ্যে ফায়ার প্লেস নিয়ে বেড়াও—'ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, হুইস্কি-পানি পেটে আছে, শীত করবে কী?'

সুমিতাবউদি ওকে বড় বড় চোখ করে ধমকে বললেন, তোমাকে কতদিন বলেছি যে, তুমি আমাদের সামনে তোমার মদ খাওয়া নিয়ে বাহাদুরি করবে না নির্লজ্জর মতো। আবার তুমি অমন করছ!

সুমিতাবউদির বকুনি খেয়ে যশোয়ন্ত যেন হঠাৎ নিবে গেল।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর আমার ঘরে সুমিতাবউদি আর মারিয়ানা শুলেন। আর আমার পাশের ঘরে তিনটে পাশাপাশি ফেলা নেয়ারের চৌপায়াতে আমি, যশোয়ন্ত আর ঘোষদা।

শুয়ে শুয়ে বাবুর্চিখানার প্যানট্রিতে জুম্মানের কাঁচের বাসন ধোয়ার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। রামধানিয়া রোজকার মতো কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে দড়ির চৌপায়ায় বসে

তুলসীদাস পড়ছে গুন-গুন করে। 'সকল পদারথ্ হ্যায় জগ্‌মাহী, কর্মহীন নর্ পাওয়াত নাহী!'

এই সব শব্দ, এই সব ঘুমপাড়ানি সুর আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে চিতাবাঘ, কোটরা, কি চিতল হরিণের ডাক শুনে সুহাগী বস্তির কুকুরগুলো কেঁউ কেঁউ করে ডেকে উঠছে। এ পর্যন্ত কোনও রাতে বড় বাঘের ডাক শুনিনি। তবে লোকে বলে, নভেম্বর ও মে মাসে বাঘেদের মিলনকালে এখানে সে ডাক প্রায়ই শোনা যায়।

পাশের ঘর থেকে সুমিতাবউদি ও মারিয়ানার ফিসফিস করে মেয়েলি গল্পের গুঞ্জরন শুনতে পাচ্ছি। পাশ ফেরার শব্দ। চুড়ির রিনঠিন।

বাংলোর হাতায় শুকনো পাতার উপর গাছের পাতা থেকে টুপটুপিয়ে শিশির পড়ছে, তার শব্দ পেলাম। কখন যে চেতন থেকে অবচেতন এবং সেখান থেকে সুপ্তচেতন হয়েছি জানি না।

সে রাতে পোলাও মাংস বোধ হয় বেশি খাওয়া হয়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে কেমন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে। বুক থেকে কম্বলটাকে সরালাম। চোখটা মেলালাম। চেয়ে দেখি, আমার ঘরের দরজাটা খোলা। যশোয়ন্ত বাইরের বারান্দায় কম্বলমুড়ি দিয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে ইজিচেয়ারে বসে আছে একা-একা। ওরও নিশ্চয়ই শারীরিক অস্বস্তি হচ্ছে কোনও।

সদ্য ঘুম-ভাঙা শরীরে এমন একটা আমেজ যে, ওর সঙ্গে কথা বলে সেই আমেজটা নষ্ট করতে মন চাইছে না। শুয়ে শুয়ে বাইরের তারা-ভরা আকাশ দেখতে পাচ্ছি। রাত কত তা জানি না। অষ্টমীর চাঁদ উঠেছে এক ফালি। পাণ্ডুর শিশির ভেজা জ্যোৎস্নায় বারান্দাটা ভিজে রয়েছে। একটা খাপু পাখি ডাকছে সুহাগী নদীর দিক থেকে—খাপু-খাপু-খাপু-খাপু-খাপু-খাপু...। আর ঝিঁঝির একটানা গান।

দেখলাম যশোয়ন্ত কম্বলের পাটটা খুলে ভাল করে জড়াল কম্বলটাকে।

যে ঘরে মেয়েরা শুয়েছিলেন, হঠাৎ সে ঘরের বাইরের দিকের দরজা খোলার একটা আওয়াজ পেলাম খুট করে। দুটি ঘরের মাঝে যে দরজা, সেটি বউদিরা শোবার সময় ভেতর থেকে বন্ধ করেই দিয়েছিলেন। ঘোষদার নাক এখন বেশ জোর ডাকছে। ফঁরর-ফঁ-ফোঁস-ফঁরর-ফঁরর।

সুমিতাবউদির ভারী চাপা গলা শুনতে পেলাম। এই, তুমি এই ঠাণ্ডায় এখানে বসে আছ যে?

যশোয়ন্ত জবাব না দিয়ে বলল, আপনি এত রাতে বাইরে বেরুলেন যে একা! ভয় করল না?

আমার ভয় করে না। তা ছাড়া তোমার কাছে থাকলে তো করেই না।

যশোয়ন্ত বলল, বসুন। শুধু চাদর নিয়ে বাইরে এসেছেন? যান কম্বলটা নিয়ে আসুন।

আমার ঠাণ্ডা লাগবে না। তোমার কম্বল থেকে আমাকে একটু ভাগ দাও না? দেবে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যশোয়ন্ত ঘুরে বসে বলল, আচ্ছা আপনার কথা আমি সবসময় শুনি, আপনি আমার কোনও কথা কোনও সময় শোনেন না কেন? বলতে পারেন?

সুমিতাবউদি যশোয়ন্তের পাশের চেয়ারটায় বসলেন। কম্বলের কোণটা নিয়ে গায়ে দিলেন। বললেন তাই বুঝি? শুনি না? কখনওই শুনি না? তাহলে আমার কথা তুমি শোনো কেন? আমি তো তোমাকে আমার কথা শুনতেই হবে, এমন কথা বলিনি?

যশোয়ন্ত আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, আপনাকে ভালবাসি বলে শুনি।

আমাকে কেন ভালবাসে?

জানি না।

আমার কাছে তুমি কিছু কি চাও?

যশোয়ন্ত বলল, জানি না।

সুমিতাবউদি বললেন, তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। চাইলেই তো সব কিছু পাওয়া যায় না যশোয়ন্ত। আমিও কি মনে মনে কিছু চাই না কারও কাছে? আমিই জানি, আর ভগবানই জানেন। আমরা মেয়েরা আমাদের সব চাওয়া চোখের তারায় বয়ে বেড়াতে পারি, কিন্তু হয়তো ছেলেরা তা পারে না। তোমার মতো ছেলে তো তা পারেই না। আমি সব বুঝি, সবই বুঝি যশোয়ন্ত। কিন্তু কী করব বলো? ভগবানকে সব সময়ে বলি, ভগবান আমাকে জোর দাও, আমি যেন কারও কাছে ভিখারিণীর মতো কিছু চেয়ে না বসি।

থামুন তো। ভর্ৎসনার গলায় যশোয়ন্ত বলল। আমার সামনে আপনাদের ভগবানের কথা বলবেন না। শালাকে একদিন দেখতে পেলে হত, রাইফেলের তাক কাকে বলে দেখাতাম, শালাকে হার্ড নোজড বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিতাম। মেয়ে মাত্রই ন্যাকা। আপনিও। নিজেদের ঘুঘু পাখির মতো কলজে, নিজেরা পয়লা নম্বরী স্বার্থপর—আপনাদের পক্ষেই নিজেদের খুশিমতো ভগবানের নামে সব কিছু চালানো সম্ভব। এই আমি আপনার বুকে হাত রাখছি। বলুন তো, বলুন, এবারে আপনার বুকের মধ্যে আপনি কী শুনেছেন? রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করছে কিনা বলুন? এর মধ্যে ভগবান শালার কী করার আছে আমি জানি না। আপনারা ভারী ভণ্ড। মিথ্যুক আপনারা। একটা মেয়ের চেয়ে একটা মাদি চিতাবাঘকে আমি অনেক বেশি শ্রদ্ধা করি।

তুমি একটা আস্ত পাগল।

না। আমি পাগল নই।

তবে তুমি কী?

জানি না।

এ রকম করো কেন? আমার বুঝি কষ্ট হয় না?

হয় না। আপনার কিছুই হয় না। আপনি অদ্ভুত!

বেশ। তা হলে তাই। আমার প্রতি অবিচার কোরো না যশোয়ন্ত।

ঠিক আছে।

তারপর আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল দুজনে।

দুরগুম দুরগুম করে একটা পেঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে।

হঠাৎ সুমিতাবউদি যশোয়ন্তের মাথার একরাশ চুল হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে ওর গালের সঙ্গে গাল ছুঁইয়ে বসে রইলেন। আমার সেই সায়ান্ধকারেও মনে হল, যশোয়ন্তের সারা শরীরে যেন কেমন একটা শিহরন খেলে যেতে লাগল। যশোয়ন্ত বউদির হাত দুখানি একটানে নিয়ে নিজের হাতে মুঠি করে ধরল। তারপর হাতের তেলো দুটি ওর ঠোঁটে কয়েকবার ঘষল।

অনেকক্ষণ নিজের হাতে সুমিতাবউদির হাত দুটি ধরে রাখল যশোয়ন্ত। মনে হল, আর কখনও ছাড়বে না!

কেউ কোনও কথা বলল না। হঠাৎ সুমিতাবউদি বললেন, এই তুমি কাঁদছ?—এই বোকা! তুমি কাঁদছ? ছি-ছি-ছি, কি বোকা। তুমি কাঁদছ? এই বলতে বলতে বউদির গলার স্বরও কান্নায় বুজে এল।

বউদি যশোয়ন্তের মুঠো থেকে হাত দুখানি ছাড়িয়ে এবার যশোয়ন্তের মুখটি দুহাতে ধরলেন, তুমি খুব ভাল যশোয়ন্ত, তুমি খুব ভাল।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইল।

বউদি বললেন, আমি কী করব যশোয়ন্ত? আমি যে পারি না।

তারপর আরও অনেকক্ষণ চুপচাপ।

অনেকক্ষণ পর বউদি বললেন, কী করব বলো? লোকটার জন্যে মায়া হয়।

তারপর প্রায় জোর করে বউদি যশোয়ন্তকে ঘরে ঠেলে পাঠালেন। এবং নিজে গিয়ে দুয়ার দিলেন।

যশোয়ন্ত এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

পাছে আমি জেগে আছি জানতে পায় ও, তাই তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেললাম।

যশোয়ন্তের মতো ছেলেও কাঁদে! এবং এমনভাবে কাঁদে! ভাবা যায় না।

এখানে আসার পর থেকে কত কী শিখলাম, দেখলাম। আমার জীবন কোনওদিনও বৈচিত্র্যময় ছিল না। সাহিত্যে অনেকানেক নায়ক-নায়িকার দেখা পেয়েছি—পড়েছি। কিন্তু কখনও আগে বুঝতে পারিনি যে, নায়ক-নায়িকারা দূরের কি কল্পনার লোক নয়, তারা সকলেই আমাদের চেনা লোক। যাদের আমরা চোখ দিয়ে পরশ করি, হাত দিয়ে ছুঁই। প্রতিনিয়ত যাদের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি, যারা আমাদের নিজের নিজের নিজস্ব জগতের মধ্যেই বাস করে। শক্তিমান লেখকেরা এই নিত্যতার, দৈনন্দিনতার ডালি থেকেই যাদুকরের মতো তাদেরই কত অন্যভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করেন! প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই নিশ্চয়ই ঐশী ক্ষমতার অধিকারী!



উনিশ

রাংকার রামরিচ সিং-এর মাটির দেওয়াল, খাপরার- চালের ভাণ্ডার থেকে চতুর্দিকের উপত্যকা চোখে পড়ে। একটি নদী পাহাড়টাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ঘুঙুর পায়ে নেচে চলেছে। খেম্‌টার সুর বাজছে যেন পায়ে পায়ে। 'বল গোলাপ মোরে বল, তুই ফুটিবি সখী কবে। বল গোলাপ মোরে বল।'

আমরা যেদিন এসে পৌঁছলাম, তার আগের দিনই বাঘে মড়ি করেছে পাহাড়ের নীচে নদীর পাশে। এক ওঁরাও চাষার ফুটফুটে দুধ-সাদা দুধেল গাই মেরে দিয়েছে বাঘে।

আমরা পৌঁছেছিলাম সকাল ন'টা নাগাদ। পৌঁছানো মাত্র একবার মড়িটা দেখতে গেলাম। ভাণ্ডার থেকে প্রায় পনেরো মিনিটের পাকদণ্ডী পথ। ঝরনাটার কাছেই কতগুলো পুটুস ঝোপের আড়ালে গরুটা পড়ে রয়েছে কাত হয়ে। দুধের বাঁট দুটো খেয়ে নিয়েছে আর পেছনের নরম অংশ। গলার কাছে দুটি পরিষ্কার ফুটো। মনে হল কেউ যেন ড্রিলিং মেশিন দিয়ে ড্রিল করেছে। গরুটাকে ধরেছিল এখান থেকে কম করে চারশ' গজ দূরে; বিকেলে যখন চরে বেড়াচ্ছিল। সেখান থেকে এতদূর টেনে এনেছে। কোথাও ছ্যাঁচড়ানোর দাগ আছে, কোথাও তাও নেই।

যশোয়ন্ত চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করল ভাল করে।

কুলকুল করে ঝরনাটাতে এক চিলতে জল বয়ে চলেছে। এই রোদে-ভরা আকাশের নীচে দাঁড়িয়েও জায়গাটায় বেশ শীত শীত করছে। গরুটার কাছাকাছি বড় গাছ যা আছে, তাতে নীচের দিকে মোটেই মাচা বাঁধার উপযুক্ত ডাল নেই। যেখানে ডাল আছে, তা অনেক উঁচু।

যশোয়ন্ত আমাকে বলল, তোমার অত উঁচু থেকে গুলি করতে অসুবিধা হবে। তার চেয়ে মাটিতে বসব। মাটিতে বসে জানোয়ার দেখতে অনেক সুবিধা, গুলি লাগাতেও সুবিধা।

আমি বললাম, তা তো সুবিধা, কিন্তু প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ারও খুব সুবিধা।

যশোয়ন্ত বলল, প্রাণ বেরুনো অত সোজা নাকি?

আমি বললাম, তোমার জগদীশ ভাইয়ের গুলির হাত থেকে বেঁচেছি বলে কি বাঘের হাতেও বাঁচব?

যশোয়ন্ত বলল, এখানে কথা বোলো না—বাঘ তো বেশি দূরে যায়নি, ধারেকাছেই আছে। ঘুমুচ্ছে। বেশি চেঁচামেচি শুনে বিরক্ত হতে পারে।

গাছের নীচে ভিজে স্যাঁতসেতে মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ দেখলাম। আমারও হুইটলি সাহেবের বন্ধুর মতো 'মাঁই গঁড, হিঁ ইঁজ দ্যা ড্যাঁডি অঁব অঁল গ্র্যান্ড ড্যাঁডিজ' বলতে ইচ্ছে করল। বাঘের থাবার ছাপ দেখলেই মাখনবাবুর বুকের ভেতরটা কেমন করে।

নিরীক্ষণ করে বোঝা গেল যে, বাঘ নদী পেরোয়নি। নদীর যেদিকে গরু আছে, সেই দিকেই ফিরে গেছে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বাঘ যে-পথে গেছে, সে পথেই ফিরে আসবে।

বেশ বুদ্ধি করে নদীর পাশে যশোয়ন্ত একটা গর্ত খুঁড়ল। সেই ওঁরাও চাষা আর নিজে মিলে। আমাকে একটা ছুরি দিয়ে বলল, বেশ দূর থেকে কয়েকটা করৌঞ্জের ঝাঁকড়া ডাল কেটে আনতে। বলল, বন্দুক নিয়ে যাও। বাঘ কোথায় শুয়ে আছে কে জানে? ডাল কাটতে গিয়ে বাঘের নাকে কোপ বসিয়ো না। করৌঞ্জের ডাল কেন কাটতে বলল বুঝলাম। মড়ির চারপাশে করৌঞ্জের বন।

দশ-পনেরো মিনিট বাদে ডাল কেটে ফিরে এসে দেখি, নদীর খাড়া পাড়ে যেখানে এক রাশ করৌঞ্জের ডাল আছে তার ঠিক পাশেই যশোয়ন্ত গর্তটা সম্পূর্ণ করেছে। আমি পৌঁছাতে গর্তের সামনে যেখানে করৌঞ্জের গাছগুলো ছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে আমার কেটে-আনা ডালগুলো বসিয়ে দিল বালিতে। গরুটার কাছ থেকে এবং গরুটা যেদিকে আছে, সেদিক থেকে করৌঞ্জের ঝোপের আড়ালে গর্ততে বসে থাকলে বাঘ আমাদের মোটেই দেখতে পাবে না। অবশ্য যদি আমরা নড়া-চড়া বা শব্দ না করি।

মাটিতে বসে থাকব, আর অতবড় রয়্যাল টাইগার এসে আমাদের থেকে দশ পনেরো হাত দূরে গরুর হাড় কড়মড়িয়ে খাবে—এ দৃশ্য কতখানি ভয়াবহ জানি না, তবে এ দৃশ্যের কল্পনাও কম ভয়াবহ নয়। তা ছাড়া আমাদের পেছনে তো উদোম টাঁড়। মাত্র কুড়ি হাত চওড়া বালিময় নদী—যাতে এক চিলতে জল চলছে মাত্র। বাঘ যে পেছন দিক থেকে আসবে না, এমন গ্যারান্টি যশোয়ন্ত দিচ্ছে কী করে জানি না। অবশ্য বাঘের পায়ের দাগ দেখে যশোয়ন্ত যা সাব্যস্ত করেছে, সেটাই সম্ভাব্য ও ঠিক বলে মনে হল।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ এনামেল করা মগে এক কাপ করে গরম চা কৃপণের মতো রয়ে সয়ে খেয়ে, ভাল করে গরম জামা-কাপড় পরে এবং দুটো দেহাতি কম্বল এবং একটি ছোট নারকেলের দড়ির চারপাই নিয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম মড়ির কাছে।

সূর্যের তেজ কমে গেছে। বেলা পড়ে এসেছে। চৌপায়াটা নদীর বালুরেখার পাড় ঘেঁষে পেতে, তার উপর কম্বল দুটো বিছিয়ে আমরা বসলাম। রামরিচবাবুর চাকর এসেছিল সঙ্গে, তাকে বললাম, দেখ তো বাবা, ও পাশ থেকে আমাদের মাথা দেখা যাচ্ছে কি না? সে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি করে বলল, কুচ্ছো না দিখ্‌তা হো বাবু, একদম ঠিক্কে হ্যায়।

তারপর সে এবং তার সঙ্গী দু'জনে জোরে কথা বলতে বলতে চলে গেল বস্তির দিকে।

বেশ শীত। রোদের তেজটা যত কমে আসছে, তত মনে হচ্ছে, কার অদৃশ্য হিমেল দু-খানা হাত কাঁধের দু-পাশে চেপে বসছে। তা ছাড়া নদীতে বসেছি, ঠাণ্ডা যেন আরও বেশি বলে মনে হচ্ছে।

কাছেই জঙ্গলের মধ্যে কোনও ফাঁকা মাঠ আছে। তাতে যেন পাখিদের মেলা বসেছে। তিতির আর বটেরের ডাকে বন সরগরম। বন-মোরগ ডাকছে থেকে থেকে। ময়ূরের কেঁয়া-কেঁয়া রব চতুর্দিকে গোধূলিবেলার নিস্তরঙ্গতাকে ভেঙে খানখান করে দিচ্ছে।

আমাদের সামনের গাছে একটা সুন্দর, বড় নীল আর খয়েরিতে মেশা কাঠঠোকরা এসে বসল। বসে কাঠ ঠুকতে লাগল ঠকাঠক-ঠকাঠক করে।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে এল। কোজাগরী একাদশীর চাঁদ উঠতে লাগল।

গরুটার পা শক্ত দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল, যাতে বাঘ এসে টেনে এদিক-ওদিক নিয়ে না যায়— তা হলে আমাদের বসবার জায়গা থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। সাদা গরুটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এখনও পশ্চিমাকাশে বেগুনি-গোলাপিতে মেশা একটা আভা আছে। তবে জঙ্গলে, পাহাড়ের পাদদেশে এবং কোলে-কাঁখে অন্ধকার নেমে এসেছে।

আমরা উৎসুক হয়ে গরুর মড়ির দিকে চেয়ে বসে আছি। উৎকর্ণ হয়ে আওয়াজ শোনার চেষ্টা করছি—বড় জোড় পনেরো মিনিট হল চাঁদ উঠেছে; এমন সময় হঠাৎ আমাদের একেবারে সোজাসুজি পেছনে একটা নুড়ি গড়িয়ে নদীতে পড়ার শব্দ হল। যশোয়ন্ত ছিলাভাঙা ধনুকের মতো মুহূর্তে রাইফেলটা কাঁধে ঠেকিয়ে উল্টোদিকে ঘুরে বসল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নদীর ওপারে জঙ্গলের মধ্যে থেকে দু বার হাঁউ হাঁউ করে একটা চাপা গুরু গম্ভীর বিরক্তিসূচক আওয়াজ হল।

যশোয়ন্ত আমাকে ফিসফিসিয়ে বলল, টর্চটা নিয়ে আমার সঙ্গে এসো। আমার ডান কাঁধের উপর দিয়ে ব্যারেলের উপর আলো দেবে।

আমার বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে, তাড়াতাড়ি জল পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম যশোয়ন্তের সঙ্গে। পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো জঙ্গলময় আলোর বন্যা বইয়ে দিল। সেই আলোর কেন্দ্রে দেখলাম বিরাট ফিকে হলদে রঙা বাঘ আমাদের দিকে পেছন ফিরে হেলতে দুলতে চলেছে। পেটটা প্রায় মাটিতে ঠেকে গেছে। আলোটা গায়ে পড়তেই ভেবেছিলাম দৌড়ে পালিয়ে যাবে ভয়ে। অথবা আমাদের উল্টে আক্রমণ করবে; কিন্তু মনে হল, কাউকে ভয় করা বাঘের কুষ্ঠিতে লেখা নেই। বড় জোর এড়িয়ে চলতে চায়—ভাবটা, Leave and let alone.

চার কদম গিয়েই বাঘ দাঁড়িয়ে পড়ে মাথাটা নিরুদ্বেগে ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। একটা প্রকাণ্ড মুখ—হলদে-সাদায় মেশানো। কপালের কাছটা সাদা—ইয়া বড় বড় খানদানী গোঁফ। একবার মুখ তুলে তাকালেই বুকের রক্ত হিম হবার জোগাড়। আমি টর্চটা ধরে রইলাম এবং যশোয়ন্ত মুহূর্তের মধ্যে আমার উত্তোলিত ডান হাতের নীচে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েই ওর ফোর-ফিফটি-ফোর হাণ্ড্রেড ডাবল ব্যারেল দিয়ে গুলি করল। কী বলব, বাঘটা ওইখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সমস্ত শরীরটা কিছুক্ষণ থরথর করে কাঁপল। তারপর স্থির হয়ে গেল।

যশোয়ন্ত বলল, ভেবেছিলাম তোমাকে দিয়ে শিকার করাব। তা হল না। ব্যাটা আমাদের একদম বুদ্ধু বানিয়ে দিল। নদী টপকে একেবারে পেছন দিয়ে আসছিল। এ যদি মানুষখেকো বাঘ হত, তাহলে আর দেখতে হত না।

আমি বললাম, বাঘ কোন ঝুটঝামেলা না করে মরল কেন? তবে যে লোকে বাঘকে এত ভয় পায়?

যশোয়ন্ত বলল, গুলি করার আগে পর্যন্ত বাঘের মতো 'ডোন্টকেয়ার', 'আয়-না-দেখি', 'কুছ পরোয়া নেহী' গোছের জানোয়ার দুটি নেই। মানুষকে বাঘ এড়িয়ে চলতে চায় এ পর্যন্তই। কিন্তু কখনও মানুষকে ভয় করে না। ফলে বুক-ফুলিয়ে রাজার

মতো আস্তে আস্তে হেলে-দুলে চলে, থেমে দাঁড়ায়—মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। তাই মাথা ঠাণ্ডা করে মারতে পারলে বাঘ মারা সব শিকারের চেয়ে সোজা। আর এ যদি চিতা হত, তা হলে দেখতে আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কেমন লেজ তুলে দৌড়োয়। বাঘ ভাবতেই পারে না যে, তার সঙ্গে ইয়ারকি-মারনেওয়ালা কোনও জীব আছে দুনিয়ায়। সে কারণে আলো ফেলতেই আমাদের ধৃষ্টতা দেখে বাঘ অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

সফট-নোজড গুলিটা কাঁধে ঢুকে ঘাড় ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। চলো কাছে, দেখাব। তা না হয়ে যদি গুলি কোন বে-জায়গায় লাগত তা হলে দেখতে বাঘ কী জিনিস, আর মানুষ বাঘকে ভয় পায় কেন! ভয় পাওয়ার মতো জানোয়ার সে তো বটেই! আরও কিছুদিন জঙ্গলে থাকো, বাঘ যে কী জিনিস তা জানবার দুর্ভাগ্য নিশ্চয়ই হবে। প্রতিবারই কপিবুক শিকারের মতো বাঘ পাকা আমের মতো ধপ করে পড়ে গিয়ে আমাদের যে কৃতার্থ করে না, তা জানতে পারবে।

কতকগুলো পাথর ছুঁড়ে আমরা বাঘটার কাছে গেলাম। গুলি করেছিল যশোয়ন্ত প্রায় তিরিশ গজ দূর থেকে। বাঘের মতো বাঘ বটে। বনের রাজা যাকে বলে। বেচারির গরু খাওয়া হল না।

পরে আমরা মেপেছিলাম। ন' ফুট এগারো ইঞ্চি Between the pegs.

Between the pegs—মানে, বাঘকে লম্বা করে লেজ সমেত একটি সমান্তরাল রেখায় শুইয়ে, নাকের কাছে এবং লেজের কাছে দুটি খোঁটা পুঁতে সেই খোঁটা দুটির দূরত্ব যত হয়, তত।

গুলির শব্দ শুনেই রামরিচবাবু নিজেই লোকজন নিয়ে এসেছিলেন। তা না করলেও পারতেন। কারণ গুলিটা ছোঁড়ার কথা ছিল আমার। এবং আমি গুলি ছুঁড়লে, গুলি ঘাড়ে না লেগে লেজেও লাগতে পারত। এবং সেই অবস্থায় অতজন নিরস্ত্র লোকজন নিয়ে সেই জঙ্গলে ঢোকাটা নিতান্ত নির্বুদ্ধির কাজ হত।

পরদিন দুপুরে ফলাও করে মুরগি-তিতিরের কাবাব, বাজরার-রোটি এবং হরিণের মাংসের আচার দিয়ে খাওয়া সেরে কষে দিবানিদ্রা লাগালাম। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। বাঘের চামড়া ছাড়াতে ছাড়াতে প্রায় রাত দেড়টা হয়ে গেছিল, তারপর সকালে অনেক হাঁটাহাঁটি হয়েছে।

সারা দুপুর ঘুমিয়ে ক্লান্ত শরীরকে মেরামত করে বিকেলে রামরিচবাবুর ভাণ্ডারের সামনের উঠোনের আম গাছের নীচে বসে, ভয়সা দুধে ফোটান দারুচিনি-এলাচ দেওয়া চা খেলাম রসিয়ে রসিয়ে।

বেলাও পড়ে এল। এবার আমরা রওয়ানা হব রুমান্ডির দিকে। বাঘের চামড়াটা জিপের পিছনে রাখা হয়েছে। ভাঁজ করা চামড়াটাতে সিটটা প্রায় ভরে গেছে। নুন লাগানো হয়েছে পুরো চামড়াতে। নুনের গন্ধ, রক্তের গন্ধ; বাঘের লোমের গন্ধ সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা বদ গন্ধ বেরুচ্ছে।

রুমান্ডিতে ফিরে চামড়ার যত্ন-আত্তি করা যাবে।

আপাতত ওই অবস্থাতেই রাখা আছে। যশোয়ন্ত বলেছে, এ চামড়াটা কলকাতায় কাথবার্টসন অ্যান্ড হার্পারে পাঠাবে ট্যান করাতে।

যাত্রাকাল সমুপস্থিত, এমন সময় জিপে মবিল ঢালতে গিয়ে দেখা গেল, মবিলের টিন সুদ্ধ গায়েব।

এই অজগ্রামে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ওঁরাও-গঞ্জুরা কেরোসিন তেলই কিনতে পারে না। তাদের সে পয়সাও জোটে না। তাই চকচকে টিন-ভর্তি মবিল তেল কে চুরি করে নিয়েছে, কে জানে! কাড়ূয়া তেল ভেবেও চুরি করতে পারে। অথচ, মবিল গাড়িতে নেই-ই বলতে গেলে। চড়াই-এ উৎরাই-এ পাহাড়ি রাস্তায় সহইদূপ ঘাট হয়ে রুমান্ডি পৌঁছতে হবে, এ রাস্তায় মবিল না থাকলে ইঞ্জিন জ্বলে যাওয়া বিচিত্র নয়।

রামরিচবাবু তো খুবই লজ্জিত হলেন, বললেন, এখন কাকে ধরি বলুন তো? ছি ছি আপনারা সব মেহমান লোক আর আমার কাছে এসে আপনাদের এহেন হেনস্থা! রাগারাগি করতে আরম্ভ করলেন তিনি। সামনে যাকে পান, তাকেই গালাগালি করেন।

এমন সময়ে যশোয়ন্ত তাঁকে আড়ালে ডেকে বলল যে, রাগারাগি কাজ হবে না। কী করলে যে কাজ হবে তা আর বলল না। রামরিচবাবুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে কী সব ফিসফিস করতে লাগল ও।

আমি ভান্ডারে বিছানো চৌপাইয়ে আলোয়ান মুড়ে বসে বসে চাঁদ ওঠা দেখতে লাগলাম। আর কিছুদিন বাদেই লক্ষ্মী-পূর্ণিমা। নিষ্কলঙ্ক শরতকালে বন পাহাড়ে চাঁদের সে রূপ বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার নেই।

হঠাৎ রামরিচবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তারস্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডালটনগঞ্জী 'একরা-কেকরা' ভাষায় বলতে লাগলেন, যশোয়ন্তবাবু তন্ত্রমন্ত্র জানেন। তিনি ওই বাইরের ঘরে পুজোয় বসেছেন। কে মবিলের টিন নিয়েছে, তা উনি এক ঘণ্টার মধ্যে জেনে ফেলবেন। এবং তার আর নিস্তার নেই। তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু যে নিয়েছে, সে যদি টিনটি চুপি চুপি গোয়াল-ঘরের খড়ের গাদায় রেখে আসে, তবে যশোয়ন্তবাবু তার নাম কাউকে বলবেন না এবং তাকে ক্ষমাও করে দেবেন।

যশোয়ন্ত কালীভক্ত জানতাম। কিন্তু সে যে তন্ত্রমন্ত্রও জানে, তা জানা ছিল না।

সেই চুরালিয়া বস্তির লোকেদের, প্রথমে সেই সাংঘাতিক খবরে বিশেষ প্রত্যয় হল না, এবং আমারও হল না। কিন্তু দেখলাম, যে-ঘরে যশোয়ন্ত ধ্যানে বসেছে, সেই ঘরে দু-একজন লোক উঁকি মারতে লাগল একে-একে। এমনি করে ভিড় ক্রমশ বাড়তেই লাগল। ভাণ্ডারের চারপাশে গুজ-গুজ ফুস-ফুস শুরু হল।

এত লোককে এমন করতে দেখে আমরাও কিঞ্চিৎ সখ হল যে, যশোয়ন্ত কী প্রকার ধ্যান করছে, গিয়ে একবার দেখে আসি।

ঘরের সামনে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েই যা দেখলাম, তাতে প্রায় আঁতকে উঠলাম।

সে ঘরে আসবাবপত্র কিছু নেই। সেটি অনেকগুলি খাপরার চালের ঘরের একটি। মাটির মেঝেতে একটি কেরোসিনের কুলি জ্বলছে। যশোয়ন্ত দরজার দিকে পেছন ফিরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে হাত দুটো মাথার উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং সরল বাংলায় সুর করে জলদ গম্ভীর গলায় কেটে কেটে বলছে—

দুটো ঘুঘু পাখি,
দেখিয়ে আঁখি,
জাল ফেলেছে পদ্মার জলে,
দু'টো ছাগল এসে
হেসে হেসে,
খাচ্ছে চুমু বাঘের গালে।

এই লাইন ক'টিই বারংবার অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও পবিত্রতার সঙ্গে কেটে কেটে উচ্চারণ করছে। শুনে কাপালিকের মন্ত্র বলেই মনে হচ্ছে। যশোয়ন্তের চকচকে ময়াল সাপের মতো উদ্ধত উলঙ্গ মসৃণ শরীরে কেরোসিনের কুপির আলোটা ধেই-ধেই করে নাচছে। সে এক অকল্পনীয় দৃশ্য।

বলা বাহুল্য, ওইখানে যে-সব লোক ওই বীভৎস প্রক্রিয়ায় ধ্যান করা দেখছিল, তারা কেউই বাংলার ব-ও জানে না। তারা নিশ্চয়ই ভাবছে যে, কোনও সাংঘাতিক চোর ধরা মন্ত্র। রামরিচবাবু ব্যাপারটা জানতেন, কিন্তু সেই পরিবেশে উলঙ্গ যশোয়ন্তের মুখে ঘুঘু পাখির গান যে কেমন শোনাচ্ছিল, তা বোধহয় তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার লোক আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। হাসব না কাঁদব বুঝতে না পেরে পালিয়ে এসে আবার চৌপাইতে বসলাম।

একটু পরেই রামরিচবাবুর খাস চাকর 'একরা টিনা মিললই হো—একরা টিনা মিললই হো' বলতে বলতে মবিলের টিনটা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল। ওকে জেরা করতে ও বলল, একটা লোক এইমাত্র টিনটা গোয়ালঘরের খড়ের গাদায় রেখে দিয়ে পড়ি কি মরি করে দৌড়ে পালাল।

একটু পরে তান্ত্রিক যশোয়ন্ত ধ্যান ভেঙে জামা-কাপড় পরে বাইরে এসে দাঁড়াল। সমবেত ভক্তমণ্ডলী সমস্বরে বলল, বাপ্পারে বাপ্পা, তুহর গোড় লাগি বাপ্পা।



কুড়ি

শীতটা বেশ জোর পড়েছে। বনের পথে পথে আবার ট্রাকের একটানা গোঙানি শুরু হয়েছে। বাঁশ বোঝাই হয়ে, কাঠ বোঝাই হয়ে, দিনে রাতে ট্রাক চলেছে। দিনেই বেশি চলে। রাতে খুব একটা নয়। ফিকে লাল সিঁদুরের মতো ধুলোর আস্তরণ পড়েছে পথের দু'-পাশের গাছগুলিতে।

ভোরবেলা শিশিরে ভিজে থাকে চারদিক। রোজ বন্দুক হাতে করে প্রাতঃভ্রমণে বেরোই। আজকাল জন্তু-জানোয়ারের ভয় আগের মতোন করে না, তবে বন্দুক নিতে হয় যশোয়ন্তের সাবধানবাণী শুনে। যশোয়ন্তের জগদীশ-বন্ধুরা যে কখন কোন সুযোগ নিয়ে বসেন, তা কে জানে!

অন্য লোক হলে হয়তো এই ব্যাপারটা এত বড় করে দেখত না, কিন্তু নিজে একজন জঙ্গলের ঠিকাদার। বন-বিভাগের সঙ্গে কেসে হেরে গেলে তার এমনি যা শাস্তি হবে, হবেই; কিন্তু বিড়িপাতা, লাক্ষা এবং কাঠের যে প্রকাণ্ড ব্যবসা তার আছে এ অঞ্চলে, তা উঠে যাবে বললেই চলে। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না—তা সে জানে এবং সে কারণে যেন-তেন প্রকারেণ সে চেষ্টা করছে যাতে যশোয়ন্তকে শায়েস্তা করতে পারে। তা ছাড়া ওর এবং যশোয়ন্তের হাবভাব দেখে মনে হয়, ওদের দু'জনের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত বৈরিতা আছে।

ইতিমধ্যে কিন্তু আর একবারও তারা রাতের সহলে আসেনি। এলে অন্তত যশোয়ন্তের কাছে খবরটা পৌঁছাত।

সকালে পথের নরম পেলব পুরু ধুলোয় নানা জন্তু-জানোয়ারের রাতের পায়ের দাগ দেখি। আজ ভোরে বেরিয়ে দেখি, শম্বরের দল রাস্তা পার হয়েছে। দুটি নীল গাই পথের উপরেই বসেছিল অনেকক্ষণ; তার দাগ। একটি চিতা রাস্তা ধরে প্রায় আধ মাইল সোজা আমার বাংলো থেকে যবটুলিয়া বস্তির দিকে হেঁটে গেছে। আমার সামনেই একদল মোরগ-মুরগি রাস্তার উপর কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল, আমাকে আসতে দেখেই বাঁ-দিকের খাদে নেমে গেছে। তাদের পায়ের দাগ ধুলোর উপর টাটকা রয়েছে। কখনও কখনও বড় জাতের সাপ রাস্তা পার হয়েছে যে, তার চিহ্ন দেখি। টাবড় একদিন বলছিল, ওগুলো শঙ্খচূড়।

যবটুলিয়াতে ওরা সেদিন একটা শঙ্খচূড় সাপ মেরেছিল। বিরাট লম্বা। সবজে সবজে দেখতে, পেটের দিকটা হলদে। এ অঞ্চলের লোক এই সাপকে বড় ভয় পায়। শঙ্খচূড়

নাকি মানুষকে আধ মাইল তাড়া করে গিয়ে কামড়েছে, এমন ঘটনাও ওদের জানা আছে। লেজে ভর করে দাঁড়িয়ে উঠে বুকে, মুখে, মাথায় ছোবল দেয়। যাকে কামড়ায়, তার চোখে দিনের আলো প্রথমে হলদে হয়ে যায়; তারপর মিলিয়ে যায়। অব্যক্ত যন্ত্রণার সঙ্গে অন্ধকার নেমে আসে।

সুহাগী নদীর পাড়ে যে খাড়া পাহাড়টা উঠে গেছে—যার নাম বাগুং, সেখানে নাকি শঙ্খচূড়ের আড্ডা। ওদিকে বড় কেউ যায় না। এমনকী, গরমের সময় জঙ্গলের আনাচে-কানাচে গরিব লোকেরা শেষরাত থেকে মহুয়া কুড়িয়ে বেড়ায়, তখনও ওই পাহাড়কে ওরা এড়িয়ে চলে। আসলে আমার মনে হয়। সাপ সব পাহাড়েই আছে। কিন্তু ওই পাহাড়ে নাকি দুর্যাগিয়া দেওতার মতো কোনও বনদেওতা আছেন, তাই সাপেরা নাকি তাঁর ঠাঁই সব সময় ঘিরে থাকে। কেউ বনদেওতার থানের কাছাকাছি গেলেই তাকে তাড়া করে।

বেত্‌লার চেকনাকার পেত্নীর ঘটনা টাবড়ের কাছ থেকে শোনার পর থেকে এদের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভূততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শুধিয়েছিলাম। সে ভারী মজার।

ওরা বলল, 'দারহা' বলে এক রকমের ভূত নাকি অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাস্তার কেউ সন্ধের পর একলা যাচ্ছে—হঠাৎ পাহাড়ের নীচে দেখতে পেল, একটি ছোটখাটো দুবলা-পাতলা লোক আসছে। সে হঠাৎ সামনা-সামনি আসতেই পথ জড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল যে, তার সঙ্গে কুস্তি লড়তে হবে। কুস্তি সে লড়ল তো ভাল, না লড়লে সেই দারহা ভূত হঠাৎ শাল গাছের মতো লম্বা হয়ে যাবে আবার পরক্ষণেই লুমরীর মতো বেঁটে হয়ে যাবে। এমনই সার্কাস করতে থাকবে। এবং যার হৃদয় সবল নয়, সে তো সঙ্গে সঙ্গে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই মরবে, এবং যার হৃদয় সবল, সেও দরদর করে ঘামতে থাকবে।

এই রকম করে দারহা মিনিট পাঁচেক ভয় দেখিয়ে চামচিকে কি খাপু পাখির রূপ ধরে আকাশে উড়ে যাবে।

কতরকম গল্পই যে শুনি এদের কাছে, তার আর শেষ নেই। তার কিছু বিশ্বাস করি; কিছু করি না। আমার কাছে এ যেন এক আশ্চর্য, নতুন অনাবিল জগৎ। যবটুলিয়া বস্তির গম-ভাঙা কলের পুপপুপানি, বিকেলের বিষণ্ণ রোদের সান্ত্বনার আঙুল, রাতের বনের অতর্কিত হায়নার হাসি—এ-সব মিলিয়ে আমার মাঝে মাঝে নিজের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। এ ক'মাস শহুরে মনটাতে একটা অবিশ্বাস্য পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে। অনবধানে।

আমার কাজ আবার জোর কদমে শুরু হয়েছে।

কোনও বাঁশের ঝাড়ে আটটার কম বাঁশ থাকলে কাটা বারণ। তবুও কখনও সখনও কাটতে হয়। কিন্তু তাহলে আলকাতরা দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রাখতে হয় সে সব ঝাড়ের। সেই সব ঝাড়ের জন্যে আলাদা রেজিস্টার রাখতে হয়। যদি কোনও ঝাড়ে আটটার কম অথচ শুকনো, অপুষ্ট এবং বিকলাঙ্গ বাঁশ থাকে, তাহলে তাও কাটা যায়। প্রতি ঝাড়েরই বাইরের দিকের বাঁশ কাটতে হয়। কখনও-সখনও ঝাড়ও কাটা হয়। তখন বাঁশের কচি গোড়া এবং তার সঙ্গে একটি করে বাঁশ ছেড়ে যেতে হয়। এ অঞ্চলের বাঁশ সাধারণত পরিধিতে আধ ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চির মধ্যেই হয়। উচ্চতায় কুড়ি থেকে ষাট-সত্তর ফুট অবধি হয়। যেখানে বাঁশ হয়, সেখানে সাগুয়ান গাছ বড় বেশি দেখা যায় না—অন্যান্য রকমারি গাছের জঙ্গল হয় সেখানে।

এখন মাঝে মাঝেই জঙ্গলে যাই। পথে নানা ঠিকাদারের সঙ্গে দেখা হয়। কাঠের কাজ করছেন যাঁরা। কোন ক্যাপে ক্লিয়ার ফেলিং হচ্ছে, কোন ক্যাপে কপিসিং ফেলিং হচ্ছে। কোথাও হরজাই জঙ্গল কাটা হচ্ছে।

রমেনবাবু মাঝে মাঝেই বলেন, কী হবে চৌধুরী সাহেব পরের খিদ্‌মদগারি করে। চলুন, আমি আর আপনি মিলে একটা বিজনেস করি। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। আমি তো লেখাপড়া জানি না, কিন্তু বাঁশ এবং এই জঙ্গলকে ভাল করেই জানি। আমি জঙ্গল সামলাব আর আপনি সাহেব সামলাবেন। দেখবেন, কোয়েলের বানের মতো হুড়মুড়িয়ে টাকা আসছে।

আইডিয়াটা মন্দ না। রমেনবাবু নানাভাবে উপার্জন করে হাজার পনেরো টাকা জমিয়েছেনও শুনতে পাই, কিন্তু আমার যে এক পয়সাও পুঁজি নেই।

এ-রকম নানা প্ল্যানের কথা উনি বলেন। বসে বসে শুনতে ভাল লাগে, কল্পনা করতেও ভাল লাগে: আমার ব্যবসা আমার বাড়ি, আমার গাড়ি। ব্যস ওই পর্যন্তই। এ জীবনে কল্পনা করা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না। মোটামুটি খেয়ে পরে দিন কেটে গেলে এই কল্পনার জগতেই আমি সুখী—আর রুমান্ডির মতো এমন জায়গায় যদি বাকি জীবনটা কল্পনায় বুঁদ হয়ে কাটাতে পারি, তবে তো কথাই নেই।

দিনগুলি রাতগুলি কেটে যায়, কিন্তু মাঝে মাঝেই বড় একা একা লাগে। এত একা যে, কী বলব। নিজের বুকের ভিতরে একটি অতল গহ্বর অনুভব করি। শীতের সন্ধ্যায় সূর্য যখন হেলে পড়ে, হরতেলের ঝাঁক যখন ফল খেয়ে বট গাছের আশ্রয় ছেড়ে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যায়, সুহাগী বস্তির সব ক'টি গরু মোষ যখন কাঠের ঘণ্টার বিষণ্ণ আওয়াজ নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে, কূপ-কাটা কুলিরা যখন দিন শেষে টাঙ্গি কাঁধে ফিরে এসে সঙ্গিনীর সঙ্গে পা ছড়িয়ে বাজরার রুটি খেতে বসে, তখন নিজের মধ্যে একটা তীব্র একাকিত্বের বেদনা অনুভব করি।

শীতের সন্ধ্যার একটি আশ্চর্য হৃদয়স্পর্শী রূপ আছে। হলুদ আলোয় ক্রন্দনরতা শীতের বন থেকে, ঘাস থেকে, ফুল থেকে একটি করুণ শৈত্য উঠে আমার বুকে এসে বাসা বাঁধে। বুকের মধ্যে একটা অনামা রাগের, অনামা বাজনার বিচ্ছিন্ন আলাপ গুমরে গুমরে ওঠে।

কৃষ্ণচূড়ার নীচে, রামধানিয়া একটা চালাঘর বানিয়েছে। চারটে শালের খুঁটি পুঁতে এবং উপরে বাঁশের উপর শালপাতা বিছিয়ে। রাত হয়ে গেলে তার নীচে বসি। রোজ সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই সেখানে আগুন করা হয়। আগুনের পাশে বসে বই পড়ি, নতুবা ওরা যা গল্প করে শুনি, তখন ঘরের মধ্যে বড় একটা থাকি না। আগুনের পাশে বসে শরীর গরম করে নিয়ে, গরম গরম যা রান্না হয় খেয়ে শুয়ে পড়ি লেপের তলায়।

রামদেওবাবুদের পঞ্জাবি ট্রাক ড্রাইভার গুরবচন সিং মাঝে মাঝে রাতে আমার বাংলো পেরুবার সময় ট্রাক থামিয়ে আগুন পুইয়ে যায়—আঙুলগুলোকে টেনেটুনে ঠিক করে নেয়—কোনও কোনও দিন ওকে চা কিংবা গরম কফি খাওয়াই—বেচারা কুটকু থেকে ডালটনগঞ্জে যায় প্রতি রাতে। গুরবচনের পুরনো ট্রাকের জানালার কাঁচ মোটে ওঠে না—হু হু করে হাওয়া ঢোকে।

পথে কোন দিন কী জানোয়ার দেখল, তার গল্প করে গুরবচন। ও আজকাল আর পঞ্জাবি নেই, বিহারি হয়ে গেছে। যশোয়ন্তের মতো। বহু বছর থেকে এখানে আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফৌজে ছিল—বিদেশে যুদ্ধ করেছে। কোনও কোনও দিন তার গল্প করে। গুরবচন সিং এক জাঁদরেল ডাকসাইটে ব্রিগেডিয়ারের গল্প করে—তার মতো সিপাহি কেউ নাকি দেখেনি। শত্রুর স্পাই এক সুন্দরী মেয়েকে ভালবেসে সেই ব্রিগেডিয়ার নাকি নিজে মরেছিল। এবং অনেক সৈন্যকেও মেরেছিল।

আগুনে গুরবচন সিং-এর চোখ দুটো চকচক করত। ও গল্প করতে করতে আমায় শুধোত, বাহাদুর আদমি কি কমজৌরি কিস মে হ্যায়, জানতে হো বাবুজি?

আমি শুধোতাম, কিস মে?

গুরবচন সিং কনভিকশনের সঙ্গে বলতো, আওরৎ মে।

নানান গল্প হত। রামধানিয়া ওখানেই বসে রামায়ণ পড়ত গুনগুনিয়ে—সেই শীতার্ত রাতের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তারা-ভরা আকাশের নীচে বেশ লাগত সেই গুনগুনানি।

ইতিমধ্যে রাংকা থেকে ঘুরে এসে শিরিণবুরুতে গেছিলাম এক শনিবার বিকেলে। রাতটা থেকে আবার রবিবার রাতে ফিরে এসেছিলাম। মারিয়ানা সত্যিই খুশি হয়েছিল। মারিয়ানার স্বভাবে এমন একটা সহজিয়া স্বচ্ছতোয়া সুর আছে, যা সহজে যে কোনও লোককে আপন করে নিতে পারে। অনর্গল হাসে—হাসি লেগেই আছে ওর মুখে। চমৎকার কথা বলে—প্রতিটি পরিচিত, স্বল্প-পরিচিত এমনকী সদ্য-পরিচিত লোকের প্রতিও সুন্দর সপ্রতিভ ব্যবহার করে। ফলে, অনেক বোকা লোক সেই ব্যবহারকে অন্য কিছু ভেবে মনে মনে দুঃখ পেয়ে মরতে পারে। ভারী ইচ্ছে হয় মারিয়ানার বন্ধু সুগতকে দেখতে।

সেদিন বড় আদর-যত্ন করেছিল মারিয়ানা। আমরা কোথায়ও বেরুইনি। কোনও কাজ করিনি। যে ক' ঘণ্টা ছিলাম, কেবল রাতে শোবার সময় ছাড়া মুখোমুখি বসে খালি গল্প করেছি। আমাদের যে এত কথা বলার ও শোনার ছিল, ওখানে যাবার আগে তা বুঝতে পারিনি।

ও আমার কোনও নিত্য প্রয়োজনে আসেনি। আসবেও না কোনওদিন; তবু যে নীলকণ্ঠ পাখিটি রুমান্ডিতে রোজ সন্ধ্যার আগে এসে রাধাচুড়োর ডালে বসে দোল খায়—আর আমি বসে বসে তাকে দেখি, কেন জানি না তারই মতো মনে হয় মারিয়ানাকে। জাগতিক কারণে সেই পাখিটিকে আমার কোনও প্রয়োজন নেই—সে এলে, এসে বসলে, সুন্দর ঠোঁটে নিক্কণ তুলে রেশমি ডানা পরিষ্কার করলে আমার ভাল লাগে। সে উড়ে গেলেই রুমান্ডিতে রাত নেমে আসে।

টোরী-ডালটনগঞ্জের রাস্তায় জগলদহ কলিয়ারি বলে একটি কলিয়ারি আছে। সেই কলিয়ারির কাছে থাকতেন মিহিরবাবু, যিনি পুজোর সময় টোরিতে ছিলেন এবং আমাদের অষ্টমীর দিন সাদর আপ্যায়ণ করেছিলেন। গেলেই ভারী আদর যত্ন করেন ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা। খাওয়ান-দাওয়ান। গল্প-গুজব করেন। বলেন, এই জঙ্গলের সব ভাল, কেবল এই সঙ্গীর অভাব ছাড়া। ছেলেমেয়ে দুটো তো একরা-কেকরা হিন্দী শিখেছে—আমাদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে ওই ভাষায় কথা বলতে আসে। ধমক দিয়ে নিবৃত্ত করতে হয়।

ওখানে গেলেই ওঁরা ধরে পড়েন, তাস খেলুন। আমি লজ্জা পাই। কবে কোন ছোটবেলায় একবার পুজোমণ্ডপে বসে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে রঙ-মিলানো শিখেছিলাম, সেও ভুলে গেছি। তাই তাদের আড্ডা জমে না।

একদিন মিহিরবাবুর ওখান থেকে চা খেয়ে রুমান্ডিতে ফিরে আসছি, এমন সময় দেখি, সুহাগী বস্তির কয়েকটি মুখচেনা লোক একটি ডুলি কাঁধে হনহনিয়ে পাকদণ্ডী রাস্তা বেয়ে-লাতেহারের দিকে চলেছে।

জিপ থামিয়ে কী ব্যাপার শুধোতেই শুনি, শেষ বিকেলে গরু চরাচ্ছিল একটি ছেলে—সুহাগী নদীর পাশের সবুজ ঢালে। থোকা থোকা জংলি কুল পেকে ছিল মাঠময়। ছেলেটির এক হাতে পাচন, এক হাতে বাঁশি। পাচন আর বাঁশি এক হাতে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে কুল ঝোপ থেকে কুল পেড়ে খাচ্ছিল আর গরুগুলো তার চার পাশে গলার কাঠের ঘণ্টা দুলিয়ে চরে বেড়াচ্ছিল।

এমন সময়, ঝোপের অপর প্রান্ত থেকে বলা নেই, কওয়া নেই, এক বিরাট ভাল্লুক বেরিয়ে এসে ওকে আক্রমণ করে এবং বুক থেকে কোমর অবধি নখ দিয়ে সমস্ত মাংস নাড়ি-ভুঁড়ি সুদ্ধ চেঁছে ফেলার মতো করে টেনে নামায়। জংলি পাতার রস লাগিয়ে কোনওক্রমে ওরা নিয়ে যাচ্ছিল ওকে লাতেহারে!

ছেলেটির কোনও জ্ঞান ছিল না তখন।

ছেলেটির বাবা দাদা এবং আরও একজন মুরুব্বি গোছের লোককে জিপে তুলে নিলাম। ওরা ছেলেটিকে কোলে নিয়ে বসল। ডুলিতে ছেলেটির কমপক্ষে চারঘণ্টা লাগত লাতেহার পৌঁছতে। বাঁচবার আশা যদিও কিছু থেকে থাকে, তাও থাকবে না। বাকি লোকদের বললাম বস্তিতে ফিরে যেতে। তারপর যথাসম্ভব জোরে অথচ, ওর গায়ে ঝাঁকুনি না লাগে এমনি করে জিপ চালিয়ে লাতেহারে পৌঁছলাম।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবুও তখন একজন বাঙালি ছিলেন। চাটুজ্যে বাবু। আলাপ হল। অল্প বয়সী ভদ্রলোক। ছেলেটির জন্যে খুব যত্ন করে যা যা করণীয় করলেন এবং বললেন, আজ রাত না কাটলে কিছুই বলা যাচ্ছে না—তবে আমি যথাসাধ্য করছি আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

লাতেহার থেকে বেরুতে বেরুতে প্রায় আটটা হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু বললেন, কাল সকালে ছেলেটির আত্মীয়-স্বজনদের পাঠিয়ে দিতে। ছেলেটির বাবা ও দাদা লাতেহারেই রয়ে গেল। আমি দশটা টাকা দিয়ে এলাম ওদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি খরচ বাবদ। ভারী কৃতজ্ঞ হল ওরা। আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

মনে হয় আমাদের মতো আজন্ম শহরে-পালিত লোকেরা কৃতজ্ঞতা কী, তা ভুলে গেছি। অন্য লোকে যদি কিছু আমাদের জন্যে করেও, তাকে আমরা পাবার অধিকারে পাচ্ছি—করবে না তো কী? এই মনোভাবেই গ্রহণ করি। কৃতজ্ঞতার মতো মহৎ অনুভূতি আমাদের অভিধান থেকে বোধহয় উধাও হয়ে গেছে।

জোরে জিপ চালিয়ে ফিরে আসছিলাম। সঙ্গে সুহাগী গ্রামের অবশিষ্ট লোকটি। সে পেছনে বসে আছে।

রুমান্ডির কাছাকাছি চলে এসেছি—এমন সময়ে সুহাগী নদীর কিছু আগে পথটা যেখানে হঠাৎ একটা বাঁক নিয়েছে সেখানে গিয়ে জিপটা পৌঁছতেই জিপের আলোয় পথের পাশে একজোড়া বড় বড় সবুজ চোখ জ্বলে উঠেই দপ করে নিবে গেল—কারণ জিপের মুখটা আবার সোজা হয়ে গেল রাস্তা বরাবর। পেছনের লোকটি উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল, মারিয়ে হুজৌর ইয়ে ভালকো। বহত বড়া ভাল্। ঔর এ্যাহি জাগেমেই ত উ লেড়কাটা পাকড়াহিস থা—সায়েদ এহি ভালভি হোনে শেকতা।

ছেলেটাকে আমি দেখেছিলাম। একটি সুন্দর ওঁরাও কিশোর। চোখ দুটো বোজা। সারা শরীর থকথকে রক্তে ভেজা।

জিপটা থামালাম। বললাম, চলো দেঁখে উসকো। সামনের সিটে আমার পেছনে বন্দুকটা লম্বালম্বি করে শুইয়ে রেখেছিলাম। পকেট থেকে দুটি বুলেট বের করে পুরলাম।

লোকটি বলল, জিপোয়া কো স্টার্ট মতো বন্ধ কিজিয়ে হুজৌর।

কিন্তু জিপের স্টার্ট বন্ধ করেই দিলাম। তারপর টর্চটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, আও, বাত্তি দেখলাও গে ঠিকসে—ডান কাঁধের উপর দিয়ে কি করে আলো দেবে তা ওকে দেখিয়ে দিলাম। তারপরে বললাম, ডরনা মৎ।

এত পাঁয়তারা কষা সত্ত্বেও, ভাল্লুকটা পালাল না। রাস্তা ছেড়ে আমরা জঙ্গলে নেমে গেলাম। জায়গাটা ফাঁকা-ফাঁকাই। এখানে সেখানে কুল ঝোপ, মাঝে মাঝে পুটুসের ঝোপ। তা ছাড়া বড় বড় সেগুন গাছ। খুব সাবধানে ভাল্লুকটার যেদিকে যাওয়ার কথা, সেদিকে এগোতে লাগলাম।

একটু এগিয়ে আন্দাজ করে আলো ফেলতেই দেখি, ভাল্লুক যেখানে ছিল, সেখান থেকে একটু বাঁ-দিকে সরে গিয়েছে মাত্র। চোখ দুটো গাঢ় সবুজ—গায়ের কুচকুচে কালো লোম—আলোয় একেবারে জেল্লা দিচ্ছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে প্রায় চল্লিশ গজ হবে।

কী করব ভাবতে না ভাবতে অদ্ভুত ভঙ্গি করে একটি কালো অতিকায় ফুটবলের মতো ভাল্লুকটি আমাদের দিকে বিষম জোরে দৌড়ে এল। তার পরেই পেছনের দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

সঙ্গীটি যদি টর্চ নিয়ে পালাত, তবে অন্ধকারে আমার অবস্থা ওঁরাও ছেলেটির মতোই হত। কিন্তু বোধহয় ভগবানের ইচ্ছা নয় যে এত তাড়াতাড়ি মরি। সঙ্গী নির্ভয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে নিষ্কম্প হাতে আলো ধরে রইল আক্রমণকারী ভাল্লুকের উপরে। আমি লক্ষ স্থির করার যথাসম্ভব চেষ্টা করে বুক লক্ষ করে গুলি করলাম।

কী হল বুঝলাম না, কেবল একটি বন-কাঁপানো উঁক্ উঁক্ আওয়াজ করতে করতে ভাল্লুকটা আরও বেগে আমাদের দিকে এগিয়ে এল; আমরা দুজনে প্রায় একসঙ্গে ডানদিকে একটু ফাঁকা জায়গায় দৌড়ে গেলাম; ততক্ষণে আমাদের স্থান পরিবর্তন করতে দেখে ভাল্লুকটি আরও চটে গিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে আবারও দাঁড়াবার সময়ে একমাত্র অবশিষ্ট গুলিটি মহার্ঘ্য নিবেদনের মতো ভাল্লুকের বুক লক্ষ করে ঠুকে দিলাম।

ভাল্লুকটি ওইখানেই পড়ে গেল। এবং অবিকল মানুষের মতো চিৎকার করতে লাগল। সে চিৎকার কানে শোনা যায় না।

একটা জিনিস অনুভব করে ভাল লাগল যে, আমি একটুও ভয় পেলাম না। অবশ্য এর জন্য আমার নিজের কোনও বাহাদুরি নেই—সঙ্গী লোকটি ভয় পায়নি বলেই আমি ভয় পাইনি। পরিবেশে ভীরু মানুষও সাহসী হয়ে ওঠে।

কাছে গিয়ে দেখি, দুটো গুলিই লেগেছে। প্রথমটা বুকে লাগেনি, লেগেছে মাথার উপরে ঝাঁকড়া চুলে; গুলিটা চুলে বিলি কেটে সোজাসুজি চলে গেছে। পরের গুলিটা একেবারে গলার নীচে, বুকে লেগেছে। সেটিই মোক্ষম মার হয়েছে।

পরে যশোয়ন্তের কাছে শুনেছিলাম যে, বাঘ বা ভাল্লুককে কখনও মাথা লক্ষ করে মারতে নেই। ওদের খুলির আকার নাকি এমন—এবং খুলি নাকি এমন হেলানো যে,

অনেক সময় আমরা যেমন ফুটবলে হেড দিই, তেমনই হেড দিয়ে গুলি হটিয়ে দেয়। অর্থাৎ খুলির উপরের দিকে লাগলে গুলি পিছলে বেরিয়ে যায়।

দুজনে মিলে এতবড় ভাল্লুককে জিপে তোলা যাবে না। তাই আমরা সুহাগীতেই গেলাম। ওরা সবাই খুব খুশি। কেউ কেউ বলতে লাগল যে, এটাই সেই ভাল্লুক, যেটা ছেলেটাকে আক্রমণ করেছিল। ওরা এও বলল যে, খয়ের বানাতে যে মাল্লারা এসেছে গয়া জেলা থেকে, তারা একটি ভাল্লুকীর দুটি বাচ্চা ধরেছে দুদিন হল; কেউ কেউ বলল, এইটিই সেই ভাল্লুকী হতে পারে। বাচ্চা ধরাতে, খেপে উঠে এমন করে বেড়াচ্ছে।

ওরা যখন সকলে মিলে গিয়ে ভাল্লুকটাকে নিয়ে এল, তখন কিন্তু সত্যিই দেখা গেল যে সেটা একটা ভাল্লুকীই—ভাল্লুক নয়। এবং এইটিই যে সন্তানহারা ভাল্লুকী, তাও গাঁয়ের লোকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বলে দিল।

মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদ বোধ করলাম। ছেলেটির আক্রমণকারীর সঙ্গে যদি এই ভাল্লুকীর কোনও যোগ থেকে থাকে—এই ভেবে।

আমার এই আনন্দ আর একটু বেশি স্থায়ী হলে ভাল হত। কিন্তু পরদিন বেলা আটটা নাগাদ ছেলেটির দাদা এসে সুহাগীতে খবর দিল যে, ছেলেটি মারা গেছে শেষ রাতে। জ্ঞানই নাকি আর ফেরেনি।

ডাক্তারবাবু একটি ছোট চিঠি পাঠিয়েছেন ওর হাতে। 'যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না। তবে প্রথম থেকেই অজ্ঞান হয়েছিল—কাজেই নতুন করে কিছু কষ্ট পায়নি।'

খয়ের বানাতে যে মাল্লারা এসেছিল এবং ভাল্লুকীর বাচ্চা দুটি ধরেছিল, তাদের সঙ্গে দেখা করে বলব ভাবলাম যে, তাদের অপরিণামদর্শিতার জন্যই এমন কাণ্ড হল। ছেলেটির মুখটা বার বার মনে পড়ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

একদিন কাজকর্ম সেরে মৃত ওঁরাও ছেলেটির দাদাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের শুঁড়িপথে ঢুকে গেলাম। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট পাতার কুঁড়ে বানিয়ে মাল্লারা আছে। প্রায় মাইল তিনেক পায়ে-হাঁটা পথ।

সেখানে পৌঁছে ওদের সেই দুর্ঘটনার কথা বলতেই ওরা এত দুঃখ প্রকাশ করল ও অনুশোচনা জানাল যে, আর কিছু বলতে পারলাম না। মনের রাগ মনেই রইল। এমনকী, ছেলেটির দাদাও বলতে লাগল যে, তোমরা আর কী করবে ভাই? ওর কপালে ছিল, তাই অমনভাবে মরল। সবই কপালের লিখন।

ওরা আমাদের একটা শাল গাছের গুঁড়িতে বসতে দিল। গুঁড়িটা ওরা বসবার বেঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করছিল। দেহাতি আখি গুড়ের সঙ্গে পাহাড়ি-ঝরনার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জল শালপাতায় করে খেতে দিল। এইভাবে অতিথি আপ্যায়ন করল।

ওখানে বসে বসে ওরা কী করে খয়ের বানায়, তা দেখলাম—শুনলাম। দেখলাম ওরা তীর-ধনুক দিয়ে একটা চিতাবাঘকে মেরেছে কাল—সেটার চামড়াটাকে একটা বাঁশের খোঁটার সঙ্গে গেঁথে মাটিতে বাঁশটিকে পুঁতে রেখেছে। বাঘের লেজটা মাটি অবধি ঝুলে আছে।

মাল্লারা বলল যে, ওরা প্রথমে খয়ের গাছের ছাল ছাড়িয়ে নেয়, তারপর বাইরের দিকে যে সাদাটে অংশ থাকে গাছের গায়ে, তাও তুলে নেয়—তখন দগদগে ক্ষতের মতো গাছের লাল শরীর বেরিয়ে পড়ে। সেই দগদগে গায়ে আঠার মতো আস্তরণ জমে।

জমবার পর সেগুলো টুকরো টুকরো করে কাটে ওরা। কেটে এনে মাটিতে গর্ত করে বড় উনুন বানিয়ে সেই উনুনের গনগনে আঁচে বারো থেকে ষোলো ঘণ্টা জলে ফোটায়। তাতে যে আরকের মতো পদার্থ সৃষ্টি হয়, সেটিকে অন্য পাত্রে ঢেলে আবার উনুনে চড়ানো হয়। যতক্ষণ না সেই আরক বেশ ঘন হয়ে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত উনুনে চড়ানোই থাকে। ঘন হয়ে গেলে, একটি গোলাকার মৃৎপাত্রে ঢেলে থিতোতে দেওয়া হয়। সমস্ত রাত ধরে থিতানো হয়। তার পরদিন ভোরে বড় ঝুড়িতে ঢেলে ফেলা হয় ছাঁকবার জন্যে। যেটুকু ঝুড়িতে জমা হয়, সেটুকু দিয়ে ভাল খয়ের হবে, ওরা সেই খয়েরকে বলে 'পাখড়া'। আর যে জলীয় পদার্থ ঝুড়ি থেকে বাইরে এল, সেটিকে মাটিতে একটি গর্ত করে ঢেলে দেয়। তা দিয়েও এক রকমের নিকৃষ্ট খয়ের তৈরি করবে ওরা; তাকে ওরা বলে 'খয়রা'।

ঝুড়িতে যা থাকে, তা প্রায় এক মাস ধরে ফেলে রাখা হয় শুকোবার ও শক্ত হবার জন্যে। তারপর প্রায় শুকনো হয়ে এলে সেগুলো মাটিতে ছাইয়ের উপর ঢেলে ফেলে। ওরকমভাবে আট দশদিন থাকবার পর সেগুলো বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। তখন সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করে ওরা।

গরমকালে খয়ের বানানো যায় না, কারণ গরমে খয়ের শক্ত হয় না মোটে—শুকনোও না। তাই শীতকালে কাজ আরম্ভ করে, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পাততাড়ি গুটিয়ে ওরা চলে যায়। বনবিভাগকে ওদের রয়্যালটি দিতে হয় এই খয়ের তৈরি করার জন্যে।

বেশ লাগে ওদের এই যাযাবর জীবনের কথা ভাবলে। ঝরনাতলায় রাঁধে-বাড়ে—সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে। শীতের রাতে যখন টুপ-টুপিয়ে শিশির ঝরে পাতা থেকে, তখন ওরা গোল হয়ে ওদের অনির্বাণ উনুনের সামনে বসে গল্প করে, গান করে, তারপর সেই আগুনের পাশেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে।

রাতে বাঘ টহলে বেরিয়ে ওদের দেখে যায়—বাঘের চোখ ওদের ঝুপড়ির আশেপাশে আগুনের গোলার মতো জ্বলতে থাকে। কখনও-সখনও হাতির দল আসে। দূর দিয়ে ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে চলে যায়। ওদের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে উঠে বসে। ক্যানেস্তারা পিটোয়, আগুনে নতুন করে কাঠ গুঁজে আগুন জোরালো করে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

এদিকে সন্ধ্যা নেমে এল। প্রায় তিন মাইল পথ যেতে হবে। উঠলাম আমরা। ওরা বার বার বলল, আবার আসবেন। আমরা গেছিলাম বলে আন্তরিক আনন্দিত হল। ছেলেটির মৃত্যুতে বার বার দুঃখ প্রকাশ করল। ভাল্লুকীর বাচ্চা দুটিকে দশ টাকা করে এক ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে ওরা। গরিব লোক। দশ টাকা ওদের কাছে অনেক টাকা।

পথ চলতে চলতে সুহাগীর ছেলেটি বলছিল, ভারী ভাল বাঁশি বাজাত নাক ওর ভাই। ওই বয়েসের ছেলেদের মধ্যে অত ভাল বাঁশি-বাজিয়ে চতুর্দিকে দশ-পনেরোটা বস্তিতে কেউ ছিল না।

আমরা প্রায় বড় রাস্তার কাছাকাছি চলে এসেছি, এমন সময়ে আমাদের একেবারে পথ জুড়ে একদল চিতল হরিণের দেখা পেলাম। ওরা এই শুঁড়ি পথের পাশের পাহাড়তলির একটা সুন্দর মাঠে চরে বেড়াচ্ছিল। এদিকটাতে আমলকি গাছ অনেক। আমলকি খেতে এসেছিল কি না জানি না।

একদলে যে এত হরিণ থাকে বা থাকতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। ছোট বড় মাদি, শিঙ্গাল সব মিলিয়ে কমপক্ষে দুশো হরিণ হবে। আমাদের দেখা মাত্র তারা এমনভাবে বন-পাহাড় ভেঙে খুরে খুরে খটাখট শব্দ তুলে উড়িয়ে পালাল, সে কী বলব! এখনও মাঝে মাঝে সেই শেষ-বিকেলের সোনা-আলোয় হলদে সাদায় বুটি বুটি হরিণের ঝাঁকের পলায়মান ছবি চোখে ভাসে।

রাতে জিপে আসতে যেতে মাঝে মাঝে হরিণের ঝাঁকের সঙ্গে দেখা যে হয় না, তা নয়। বড় বড় ঝাঁকের সঙ্গেও দেখা হয়। তখন গাড়ির আলোয় জোনাকির মতো ওদের চোখ জ্বলে আর নেবে। কিন্তু দিনের আলোয় যেমন দেখায় তেমনটি রাতে দেখায় না। রাতে জঙ্গলের মধ্যে সব কিছুই কেমন ভুতুড়ে ভুতুড়ে মনে হয়। পথের পাশের বড় পাথর বা ঝোপের অপস্রিয়মাণ ছায়ামাত্রকেই গুঁড়ি-মেরে-বসা বাঘ বলে ভ্রম হয়। টিটি পাখির ডাক—নাইটজারের সংক্ষিপ্ত অতর্কিত তীক্ষ্ণ আওয়াজ—জিপের বনেট ফুঁড়ে ফরফরিয়ে ওড়া খাপু পাখির ক্রমান্বয়ে খাপু-খাপু-খাপু-খাপু ডাকে—সব মিলিয়ে রাতে বনে জঙ্গলে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব থাকে।

কে জানে! অমন পরিবেশেই এখানের লোকেরা 'দারহার' দর্শন পায় কিনা? চেকনাকায় চেকনাকায় পেত্নীরা তাই জল চেয়ে বেড়ায় কি না?



একুশ

দেখতে দেখতে বড়দিন এসে গেল। সুগতবাবু এসেছেন শিরিণবুরুতে। সেখান থেকে মারিয়ানা এবং উনি গিয়ে কুটকুতে থাকবেন দিন কয়েক নিরিবিলি বিশ্রামের জন্যে। কুটকুতে ছুলোয়া শিকারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে পয়লা জানুয়ারি। আমরাও যাব।

ইদানিং আমার বাংলোর সামনের রাস্তা দিয়ে অচেনা জিপের আনাগোনা বেড়ে গেছে। জবরদস্ত শিকারের পোশাক পরা শহুরে শিকারিরা দামি দামি রাইফেল বন্দুক কাঁধে প্রায় প্রতিটি বাংলো দখল করেছেন এসে। জঙ্গলের পাহাড়ে যেখানে-যেখানে হাটিয়া বসে, সেখানে-সেখানে হাটিয়ার দিনে 'ড্যাঞ্চি বাবুরা নধর পাঁঠা থেকে শুরু করে পেতলের মল, সব কিছু পাচ্য ও অপাচ্য জিনিস দর করে ও কিনে বেড়াচ্ছেন।'

দুপুরবেলায় এবং কখনও গভীর রাতেও এ-বাংলো সে-বাংলো থেকে রেকর্ডপ্লেয়ারে ইংরিজি জাজ বা ওয়ালট্‌জ-এর রেকর্ড বাজছে।

রুমান্ডি থেকে শর্টকাটে কুটকু যাবার দুটি রাস্তা আছে। প্রথমটি বারোয়াড়ি হুটার-মোড়োয়াই হয়ে কুটকু। অন্য রাস্তাটি ছিপাদোহর হয়ে। রুমান্ডি থেকে একটি জানোয়ার-চলা শুঁড়িপথের মতো পথ চলে গেছে। তাতে জিপ কষ্টেসৃষ্টে যায়। লাত থেকে সইদূপ ঘাট হয়ে ছিপাদোহর।

লাতে একটি ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস আছে। লাত্ থেকে কুজরুম হয়ে কুটকু। এই দুটি পথই অতি দুর্গম। জিপ চালাতে রীতিমতো কসরৎ করতে হয়—সারা রাস্তা গোঙাতে গোঙাতে চলে জিপ। দুই পথেই রুমান্ডি থেকে কুট্‌কু পৌঁছতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল পড়ে।

অতখানি কষ্টকর পথ পার হয়ে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে যখন আমরা মোড়োয়াই থেকে কুটকুতে এসে পৌঁছালাম, তখন সবে পুবের আকাশ লাল হয়েছে। সূর্য ওঠেনি, কিন্তু লাল আভা কুয়াশার জাল ভেদ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই শিশু-সূর্যের সমস্ত অন্তর ধরা পড়েছে কোয়েলের জলে। নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছে নদীর একেবারে গা-ঘেঁষে উঁচুতে, ছোট্ট একটি বাংলো।

এই কুটকু। দুদিকে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। কোয়েল যে কী কলরোলা, কী সুন্দরী নয়নভুলানো নদী, তা কুটকুতে না এলে বুঝি জানতাম না।

চারিদিকে পাহাড় ঘেরা, তার মাঝে কোয়েল একটি অভিমানী বাঁক নিয়েছে। নদীতে জল খুব বেশি নেই। জিপের চাকায় জল ছিটোতে ছিটোতে নদী পেরুলাম আমরা। নদী

পেরিয়ে ওপারে পৌঁছালাম। তারপর একটি বাঁক ঘুরে এসে বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়লাম।

এতক্ষণ বুঝি বোঝা যাচ্ছিল না, বুঝি দেখা যাচ্ছিল না, জায়গাটা কতখানি সুন্দর। বাংলোর সামনে, হাতের সীমানা থেকে প্রলম্বিত একটি কাঠের বারান্দা আছে নদীর একেবারে উপরে। তিন পাশে লোহার শিকলের বেড়া। সেখানে দাঁড়িয়ে কোয়েলের সুন্দরী মুখের সবটুকু চোখে পড়ে। মনে হল, এত কষ্ট করে, ওই ঠাণ্ডায় শেষ রাতে উঠে এতদূর আসা সার্থক হল।

মারিয়ানা ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, বারান্দায় বসুন; আসছি এক্ষুনি। আমরা দুজনে বারান্দায় না বসে বাংলোর হাতায় পায়চারি করতে লাগলাম। ওই রাস্তায় অতখানি জিপে এসে কোমর ধরে যাবার উপক্রম। পায়চারি করতে করতে দেখলাম, গ্যারেজে একটি জিপ এবং জিপের পাশে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একটি ট্রেলার রাখা আছে।

বাংলোর বাঁ পাশে যে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়টি আছে, তার উপর থেকে এই সাত-সকালেই একটি কোটরা থেমে-থেমে ডাকছে ব্বাক ব্বাক করে। আর সেই ডাক, ভোরের কোয়েল বেয়ে বহুদূর অবধি চলে যাচ্ছে, তারপর আবার ওই দূরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে।

নদীর ওপারে কেঁদ গাছের নীচে কী একটি জানোয়ার জল খাচ্ছিল মনে হল, হঠাৎ হুড়মুড় করে জঙ্গল ঠেলে পালাল। ময়ূর ডাকতে থাকল ওপার থেকে।

যশোয়ন্ত বলল, কপালে থাকলে সুগতবাবুর এবারে একটি বড় বাঘ হয়ে যেতে পারে। যা খবর আছে, তাতে ছুলোয়াতে বাঘ যে বেরোবেই, তাতে আমি নিঃসন্দেহ। যদি সে এক দিনের মধ্যে এই জঙ্গল ছেড়ে অন্য কোনওখানে সরে না পড়ে।

আমরা পায়চারি করছি। এমন সময় বাংলোর বারান্দা থেকে ভদ্রলোক ডাকলেন আমাদের, আরে আসুন-আসুন, এদিকে আসুন, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে দেখছি।

তাকিয়ে দেখলাম মারিয়ানার বন্ধু সুগতকে। লম্বা সুগঠিত চেহারা—বেশ সুপুরুষই বলা চলে। তবে সুন্দর বলতে যা বোঝায় তা নয়। পরনে পায়জামা ও ঘিয়ে ফ্লানেলের পাঞ্জাবি; তার উপরে একটি শাল জড়িয়েছেন। চুলগুলো এলোমেলো। সব মিলিয়ে চেহারা এবং চশমাপরা চোখ দুটির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা মানুষকে প্রথম নজরেই আকৃষ্ট করে। খুব হাসিখুশি ভদ্রলোক।

চৌকিদার অন্য দিক দিয়ে ঘুরে এসে চা দিয়ে গেছে। আমরা চেয়ার টেনে বসলাম। যশোয়ন্ত আলাপ করিয়ে দিল সুগত রায়ের সঙ্গে আমার। ফর্মালি। তাঁর চুরি-করে-পড়া চিঠির মাধ্যমে তাঁকে আমি আগেই চিনতাম।

ভদ্রলোক এমন প্রাণখোলা হাসতে পারেন, এমনভাবে চোখ তুলে তাকান, যেন মনে হয়—বুকের মধ্যেটা অবধি দেখতে পাচ্ছেন।

মারিয়ানাকে লেখা চিঠি পড়ে ফেলেছিলাম বলেই হয়তো, আমার বার-বার মনে হল এই এলোমেলো চুল-ভরা মাথা ও কালো চশমার আড়ালে গভীর চোখের অতলতায়, কোথায় যেন একটা বোবা কান্না আছে।

মারিয়ানা ওদিকের দরজা খুলে এল। একটি কালো সিল্কের শাড়ি পরেছে, মধ্যে লাল-লাল ফুল তোলা। গায়ে একটি সাদা শাল জড়িয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়েই যশোয়ন্তকে হেসে বলল, কি? এলেন তো জ্বালাতে? সুগতবাবু যশোয়ন্তের পক্ষ টেনে বললেন, জ্বলতে চাও যে সেটাও স্বীকার কর। নইলে ওকে নেমন্তন্নই বা করবে কেন? মারিয়ানা বলল, আমি মোটেই জ্বলতে চাই না।

মারিয়ানা সুগতের দিকে চেয়ে আমাকে দেখিয়ে বলল, এই যে, এঁর কথাই তোমাকে গল্প করেছিলাম।

সুগতবাবু চায়ের পেয়ালা মুখ থেকে নামাতে নামাতে বললেন, বুঝলেন মশাই, আপনার গল্প শুনে শুনে প্রায় এ কদিনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। মারিয়ানা আপনার খুব বড় অ্যাডমায়ারার।

যশোয়ন্ত তড়াক করে সোজা হয়ে বসে বলল, আর আমার? আমার অ্যাডমায়ারার নয় বুঝি?

মারিয়ানা দুষ্টুমিভরা গলায় বলল, আজ্ঞে না মশাই।

কিছুক্ষণ সময় আমরা চুপচাপ বসে রইলাম, সুগতবাবু বললেন, শেষবারের মতো একটা ময়ূর মারা যাক, বুঝলেন যশোয়ন্তবাবু। ময়ূর তো শিগগিরি ন্যাশনাল বার্ড হয়ে যাচ্ছে।

যশোয়ন্ত বলল, যাই বলুন, এমন মাংস আর খেলাম না।

মারিয়ানা বলল, রোদ উঠেছে, চলুন আমরা নদীর উপরের ওই বারান্দাতে গিয়ে বসি। এমন সুন্দর সকাল; কোথায় চুপ করে বসে থাকবেন, চোখ ভরে দেখবেন—না, সকাল থেকে মাংস খাবার গল্প শুরু হল। আপনারা সত্যিই পরের জন্মে জল্লাদ হয়ে জন্মাবেন।

আমরা গিয়ে ভোরের নরম রোদে ওই বারান্দায় বসলাম। একটা কনকনে হাওয়া আসছে নদীর উপর দিয়ে—মারিয়ানার অলকগুলো কানের পাশে কাঁপছে—সুগতবাবুর এলোমেলো চুলগুলো বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে—সিগারেটটা ঠিক করে কিছুতেই ধরাতে পারছেন না—হাওয়া এসে বার-বার দেশলাই নিবিয়ে দিচ্ছে।

সুগতবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল, ওই মুহূর্তবাহী আগুনের সঙ্গে মারিয়ানার প্রতি সুগতবাবুর ভালবাসারও একটা মিল আছে হয়তো। যতবারই পরিশ্রমের সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে জ্বালতে চান, ততবারই হাওয়ার ফুৎকারে নিবে যায়। যা থাকে, তা পোড়া বারুদের গন্ধ।

সুগতবাবু সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, মারিয়ানা দেখছিল। অবশেষে একটা কাঠি নিবল না, সুপুরুষ হাতের মুঠোর মধ্যে আগুনটাকে বন্দি করে ফেলে সুগতবাবু সিগারেটটা ধরালেন।

যশোয়ন্ত শুধোল, মিসেস রায়কে নিয়ে এলেন না কেন?

সুগতবাবু যেন একটু বিব্রত বোধ করলেন, বললেন, আসতে বলেছিলাম অনেকবার, কিন্তু ওঁর এক খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর ছবির এগজিবিশান আছে এই সময়ে আর্টিসট্রি হাউসে— তা ছাড়া উনি জঙ্গল-টঙ্গল, শিকার-টিকার বিশেষ পছন্দ করেন না, তবে অবশ্য আমার পথে কোনও বাধাও দেন না। নানা কারণে এক সঙ্গে আসা হল না আর কী।

এইটুকু বলে, সুগতবাবু মারিয়ানার দিকে চাইলেন।

মারিয়ানা চোখ নামিয়ে নিল।

কুজরুমের দিকে একটি বস্তিতে কুলথি লাগানো হয়েছে—যেখানে রোজ রাতে সম্বর আসছে। এই শীতকালে পাহাড়ি বস্তিগুলোর চারিদিকে কাড়য়া আর সরগুজায় পাহাড়ের

ঢাল আর উপত্যকা সব একেবারে হলুদ হয়ে গেছে। এমন হলুদের সমারোহ বড় একটা দেখা যায় না। শান্ত সবুজের পটভূমিতে এই নরম হলুদ বড় চোখ কাড়ে।

সকলে মিলে ঠিক করা হল, বিকেলে হেঁটে-হেঁটে মুরগি, তিতির, বটের, আসকল, কালি-তিতির এবং হরিয়াল, যা পাওয়া যায়, তাই শিকার করা হবে। তারপর রাতের খাওয়া-দাওয়া আটটা নাগাদ সেরে কুজরুমের রাস্তায় কুলথি খেতে সম্বরের অপেক্ষায় পাতার ঝোড়ায় বসে থাকা হবে।

রাত বেশি না হলে সম্বর সচরাচর পাহাড় থেকে না, না; তবে বরাত ভাল থাকলে প্রথম রাতেও অনেক সময় পাওয়া যায়। যাই হোক, আমি বললাম, পাহাড়ের উপত্যকায় শালপাতার ঝোড়ায় বসে এই ঠাণ্ডায় তো প্রাণ যাবার উপক্রম হবে—ওর মধ্যে আমি নেই। তোমরা যাও।

যশোয়ন্ত বলল, সে কথা মন্দ নয়, তা ছাড়া মারিয়ানারও একা-একা লাগবে। কত রাতে আমরা ফিরব তার তো ঠিক নেই। তুমি নাই বা গেলে।

বিকেলে মারিয়ানা বাংলোতেই ছিল। চুলটুল বেঁধে মুখ-হাত পরিষ্কার করে সেজেগুজে সেই ঝুল বারান্দাটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখনও বেশ বেলা ছিল। আমি যশোয়ন্ত এবং সুগতবাবু তিনজনে তিন দিকে বন্দুক হাতে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়েছিলাম।

জঙ্গলের মধ্যে এদিক-ওদিকে কিছু দূর হাঁটাহাঁটি করার পর বাংলোর উল্টোদিকে একটা কেঁদ গাছের নীচের একটা বড় কালো পাথরে আমি পা ঝুলিয়ে বসেছিলাম।

এপার থেকে ওপারের কুটকু বাংলোটিকে দেখা যাচ্ছিল। সেই নদীর ওপারের কাঠের বারান্দায় মারিয়ানা দাঁড়িয়ে আছে একটা নীল শাড়ি পরে। আমি দেখছিলাম। কোয়েলের গেরুয়া পাহাড়ের পটভূমিতে মারিয়ানাকে মনে হচ্ছিল একটি একান্ত একলা ছোট্ট নীল পাখি, যে সরগুজার হলুদ ক্ষেতে পথ-ভুলে ঢুকে পড়েছে, তারপর হলুদে চোখ ধেঁধে গেছে, আর বেরিয়ে আসতে পারছে না।

শিকার করতে বেরিয়েছিলাম বটে, কিন্তু শিকার করতে ইচ্ছে করে না। প্রথম-প্রথম রুমাণ্ডিতে আসার পর যশোয়ন্ত বলেছিল, জঙ্গলকে ভালবাসতে শেখো— তারপর দেখবে বন্দুক হাতে বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালে দিলখুশ হয়ে যাবে। এ ক'দিনে জঙ্গলের সম্বন্ধে যে অহেতুক ভয়টা ছিল, সেটা সত্যিই কেটে গেছে। বন্দুক চালাতে শিখিয়েছে যশোয়ন্ত আমাকে। গুলি লাগাতে শিখিয়েছে। আমার নিজের ওপর এখন আস্থা জন্মেছে। তাই সত্যিই আজকাল বনে-পাহাড়ে নির্ভয়েই চলাফেরা করি, কিন্তু শুধুই শিকার করতে আর ইচ্ছা করে না।

এই কুটকুর আসন্ন সন্ধ্যায় যে সুর, যে রঙ, যে ছবি— তার সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজের যেন কোনও মিল নেই। যে আশ্চর্য শান্ত সুর জলের কুলকুলানিতে এবং মসৃণ পাতার চিকনতায় এখানে অনুরণিত হচ্ছে, তাতে বন্দুকের আওয়াজ হলে সেই মেজাজটি যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

হঠাৎ আমার ডানদিকে কঁক্-কঁক্ করে আওয়াজ হল, শুকনো পাতা সরানোর সড়-সড় খস-খস আওয়াজ—তারপরেই দেখলাম একটি প্রকাণ্ড মোরগ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নদীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমাকে দেখতে পায়নি। বন্দুকটা আমার কোলে শোয়ানো আছে। মোরগটা গলা উঁচু করে আত্মবিশ্বাস ও কিঞ্চিৎ গর্বের সঙ্গে ডাকল কঁকর-ক্ক-ক্ক-ক্ক-কঁ-কর-ক্ক। এমন সময় একটা মেটে-রঙা আঁট-সাঁট গড়নের টাইট

করে কোমরে সেপটিপিন-আটকানো শাড়ি পরা মুরগি এসে তাকে কুর্-কুর্ করে কী বলল—তক্ষুনি যৌবনমদে মত্ত মোরগটা আবার মুরগির সঙ্গে আড়ালে চলে গেল। আমার গুলি করা হল না। গুলি করার কথা মনেই পড়ল না।

আমার পেছনে এবং নদীর ওপারে বাংলোর দিক থেকে আগে-পরে দু-তিনটে বন্দুকের আওয়াজ হয়েছিল। জানি না যশোয়ন্ত বা সুগতবাবু কী মারলেন।

বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। একটু পরেই কোয়েলের জল থেকে রেফ্রিজারেটার খুললে যেমন ঠাণ্ডা ধোঁয়া বেরোয়, তেমনই ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করবে। সূর্য প্রায় হেলে পড়েছে। বাংলোয় গিয়ে মারিয়ানার হাতে বানানো এক কাপ কফি খাব।

কোয়েলের জল পেরিয়ে বাংলোয় ফিরতেই মারিয়ানা বলল, কী মারলেন? আমি বললাম, কিছুই মারলাম না। ওই পারে গিয়ে চুপ করে একটা পাথরে বসেছিলাম। সেখান থেকে আপনাকে দেখা যাচ্ছিল।

মারিয়ানা চোখ তুলে বলল, সত্যি? আমি কী করছিলাম?

আমি বললাম, আপনি কৃষ্ণচূড়ার ডালের নীল পাখির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই জঙ্গল-পাহাড়-নদী; এই অস্তগামী সূর্য—সব মিলিয়ে যে ছবিরই সৃষ্টি হয়েছে, সেই ছবির একটি আঙ্গিক আপনি।

মারিয়ানা খুশি হল। বলল, থাক, আমাকে নিয়ে কাব্যি করতে হবে না। পারেনও আপনি। হাতে বন্দুক নিয়ে অত কাব্যি আসে?

বললাম, কাব্যের অনুপ্রেরণা থাকলে আসে। তবে ঠাণ্ডায় কাব্য হিম; জমে আইসক্রিম হয়ে যাচ্ছে—এক কাপ গরম, খুব গরম কফি চাই।

সত্যিই? একটু বসুন, আমি এক্ষুনি চৌকিদারকে জল বসাতে বলে আসি।

যশোয়ন্ত একটা খরগোশ মেরেছে। বলল, ব্যাটাকে বাঁশ-পোড়া করব কাল। সুগতবাবু একটি আসকল এবং একটি কালি-তিতির মেরেছেন।

ঠাণ্ডাও পড়েছে। অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। বড় নদীর পাশে বলে ঠাণ্ডা আরও বেশি। যশোয়ন্ত ঢক-ঢক করে আধ বোতল র' রাম খেয়ে বোতলটি ট্যাঁকস্থ করে জিপে উঠেছে। সুগতবাবু ডিনারের আগে দু' পেগ হুইস্কি খেয়েছিলেন যশোয়ন্তের অনুরোধ এবং মারিয়ানা বারণ করা সত্ত্বেও। খাওয়া- দাওয়ার পর সুগতবাবু কালো, ভারী ওভারকোটটা পরে নিয়েছিলেন। ভাল করে ফ্লানেল দিয়ে রাইফেলটা মুছেছিলেন; তারপর যশোয়ন্তের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

আমি আর মারিয়ানা জিপ অবধি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম ওঁদের। মারিয়ানা বলেছিল, সুগত বেশি রাত করবে না কিন্তু। ঠাণ্ডা লাগলেই তোমার ফ্যারেঞ্জাইটিস বাড়ে।

পাটা জিপে তুলতে-তুলতে সুগতবাবু বললেন, তুমি যখন বলছ, তাই হবে। মারিয়ানা ঠোঁট উল্টে বলল, ঈস, আমার সব কথাই তো সব সময়ে শুনছ।

যশোয়ন্ত জিপটা স্টার্ট করল। হেডলাইটটা জ্বালল, তারপর ইঞ্জিনের গুনগুনানি জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। কুজরুমের পথে হেডলাইটের নৃত্যরত বৃত্তটি দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল।

চাঁদ উঠেছিল, কিন্তু শিশিরে চাঁদের আলো কেমন ঘোলাটে-ঘোলাটে লাগছিল। একটি নাইট- জার চি-র-প্-চি-র-প্ করে উড়ে-উড়ে কী যেন দুঃখের খবর ছড়াচ্ছিল।

এক অতীন্দ্রিয় শান্তি। এ এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য নির্জনতা। কান পাতলে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনা যায়। কোনও কারণে যদি বুকের রক্ত ছলাৎ-ছলাৎ করে ওঠে, কাছে যে থাকে, সেও সে শব্দ শুনতে পায়।

মারিয়ানা শুধোল, এক্ষুনি শোবেন?

বললাম, শুলে মন্দ হয় না। ঘুমটা বেশ জমিয়ে আসছে।

ও বলল, আমি তো দুপুরে আজকে অবাক কাণ্ড করেছি। আপনারা যখন রোদে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন খাওয়ার পর, আমি তখন বেশ একটু ঘুম...বলে চোখেমুখে দুষ্টুমি মেখে হাসল। তারপর বলল, চলুন আমার ঘরে বসি। আপনি তো আবার যশোয়ন্তবাবুর মতো ঢকঢকিয়ে হার্ড ড্রিংকস খেতে পারেন না।

কফি বানিয়ে, কফির পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে মারিয়ানা বলল, একটা কথা শুধোচ্ছি, কিছু মনে করবেন না আশা করি। কেন না, আমার ও আপনার সম্পর্কটা এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখানে অনেক কথা অকপটে বলা চলে। তাই বলছি। আচ্ছা লালসাহেব, আপনি কখনও কাউকে ভালবেসেছেন?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

বললাম, দেখুন, ভালবাসার মানে যদি কাউকে স্তুতি করা, কাউকে চাওয়া হয়, তাহলে ভালবেসেছি। এমন মানুষ কোথায় যে, কখনও না কখনও কাউকে না কাউকে চায়নি? তবে ভালবাসায় যে পাওয়ার দিকটা থাকে, সে বাবতে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তাই ভালবেসেছিও বলতে পারেন, আবার ভালবাসিনিও বলতে পারেন। যদি কাউকে ভালবেসে থাকি, তাকে জোর করে অধিকার করার সাহস হয়নি।

মারিয়ানা হাসল। বলল, আশ্চর্য!

তারপর বলল, তাহলে আমার প্রশ্নটা আর একটু খুলেই বলি। আপনি কি মনে করেন, ভালবাসা মানসিক ব্যাপারের মতো একটা জৈবিক ব্যাপার—এ কি শুধুই মানসিক হতে পারে না? আমি এবং আমার মতো অন্য অনেক মেয়েই বিশ্বাস করি যে, ভালবাসাটা একটা সম্পূর্ণ মানসিক অবস্থা বিশেষ। এর সঙ্গে দেহের কোনও সম্পর্ক সব সময় নাও থাকতে পারে।

আমি বললাম, দেখুন, এ প্রসঙ্গটা এত পুরনো ও ঘোরালো, তাতে অন্য লোকের মতামত না নিয়ে নিজের-নিজের মতো নিয়ে থাকাই ভাল—তবে আমার মতো যদি জানতে চান, তাহলে বলতে হয় শরীরকে পুরোপুরি অস্বীকার করার উপায় নেই বোধ হয়। আমি যদি কাউকে কোনওদিন ভালবেসে থাকি, তাহলে তার মনটার চেয়ে শরীরটাকেও কম বাসিনি। তাকে যখন পেতে চেয়েছি, তার বুদ্ধিমতী মানসিক সত্তার সঙ্গে তার সুগন্ধি শারীরিক সত্তাকেও সমানভাবে চেয়েছি। জানি না, হয়তো এ আমার নিজের কথা।

মারিয়ানা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বলল, আপনারা মানে পুরুষরা কেমন অন্যরকম। আপনাদের এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেকই তফাত। আশ্চর্য! অথচ আমরা এক শিক্ষা পাই, এক বাবা-মার কাছে মানুষ হই। অথচ কেন এমন হয় বলতে পারেন?

আমি হেসে বললাম, মাপ করবেন, বলতে পারব না।

মারিয়ানার ঘরে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে, চেয়ার ছেড়ে উঠে বললাম, নিন শুয়ে পড়ুন দরজা বন্ধ করে।

মারিয়ানা বলল, কম্বলের তলায় আরাম করে শোবো বটে, ঘুম আসবে না। বই পড়ব। তারপর দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, দেখুন, রাতে ওরা ফিরলে আমাকে জাগাবেন কিন্তু প্লিজ। যদি কফি-টফি খেতে চায়। সুগতর গলার পেইন্টটা আমার ঘরে আছে, যদি দরকার হয়।



বাইশ

ছুলোয়া শিকারের সব আয়োজন প্রস্তুত।

গত রাত্রে ওরা বৃথাই শীতে কষ্ট পেয়ে মরল। রাত আড়াইটে-তিনটে নাগাদ ফিরে এসেছিল। শম্বর আসেনি কুলথি খেতে। তবে কোয়েলের দিক থেকে একটা বাঘের গোঙানির আওয়াজ শুনেছে ওরা। শম্বরের ডাক শুনেছে তার অব্যবহিত পরেই। ডাকতে ডাকতে দৌড়ে গেছে শম্বরের দল নদীর দিক থেকে পাহাড়ে।

মাচা বাঁধা হয়েছে চারটে। প্রথমে যশোয়ন্ত, তারপর সুগতবাবু, তারপর আমি এবং সর্বশেষে টিগা বলে স্থানীয় একজন ওঁরাও দেহাতি শিকারি।

ছুলোয়া করবার ভার যে নিয়েছে, তাকে দেখলেই বেশ অভিজ্ঞ যে, তা বোঝা যায়। কুজরুম বস্তির লোক সে। ছুলোয়া করনেওয়ালারা বেশির ভাগই কুজরুমের লোক।

দুপুরের খাওয়া সেরে বেরোতে বেরোতে আমাদের বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। সকালে ছুলোয়া করলেই ভাল হত; কিন্তু রাত তিনটেয় ফিরে যশোয়ন্ত আর সুগতবাবু ঘুম থেকে উঠেছেন প্রায় এগারোটা বাজিয়ে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি করা সত্ত্বেও বাংলো থেকে বেরোতে বেরোতেই প্রায় দুটো হয়ে গেল।

প্রথম ছুলোয়া যখন আরম্ভ হল তখন প্রায় পৌনে তিনটে বাজে। দেখতে দেখতে ছুলোয়া করনেওয়ালারা এগিয়ে এল। উত্তেজনা বাড়তে লাগল। হাতের তালু ঘামতে লাগল। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। একদল ময়ূর না-উড়ে মাটিতে মাটিতে দৌড়ে গেল আমার মাচার তলা দিয়ে। তারপরই যশোয়ন্তের মাচার দিক থেকে ও টিগার মাচার দিক থেকে পরপর রাইফেল ও বন্দুকের দুটি আওয়াজ পেলাম। কী মারল জানি না।

এমন সময় আমার একেবারে সোজাসুজি জঙ্গল ঠেলে একটি অতিকায় দাঁতাল শুয়োর বের হল। অতবড় শুয়োর যে হয়, নিজে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। আমার মাচা বোধ হয় বরাহপ্রবরের নজরে পড়েনি। আরো দু-পা এগিয়ে আসতেই আমি বন্দুক তুলে গুলি করলাম এবং গুলি লাগল গিয়ে ঘাড়ের পেছনে, মেরুদণ্ডে। গুলিটা লাগামাত্র শুয়োরটা চার-পায়ে মাটি ছিটকোতে ছিটকোতে ঘুরপাক খেতে লাগল ওই জায়গাতেই। চরকিবাজির মতো। প্রথম গুলিটা জব্বর হল কি হল না, বুঝতে না পেরে, বাঁ ব্যারেলে যে এল. জি. ছিল সেইটাও দুরগুম করে দেগা দিলাম। একটু দৌড়ে গিয়েই পড়ে গেল শুয়োরটা। পড়ে কিছুক্ষণ ছটফট করল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

শুয়োরের সঙ্গে গতজন্মে শত্রুতা ছিল কিনা জানি না, কিন্তু শুয়োরের বাচ্চারা ভালবেসে বারবার আমারই সামনে হাজির হবে। কি বনে, কি শহরে!

ছুলোয়া শেষ হলে নেমে গিয়ে দেখি যশোয়ন্ত একটি চৌশিঙা হরিণ মেরেছে—। টিগা মেরেছে একটি শিঙাল চিতল। সুগতবাবু বললেন, আমার এত ঘুপ পাচ্ছে ভাই যে, কী বলব—আমি তো মাচায় বসে গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—আপনাদের গুলির শব্দে ঘুম ভাঙল। তলা দিয়ে কিছু গেল কি না, তাও জানি না। আজকাল মোটেই রাত জাগতে পারি না। বড় কষ্ট হয় রাত জাগলে।

ওই এক মাচাতেই উল্টোমুখে বসে আর একবার শিকার হবে। এই শেষ ছুলোয়া। এই ছুলোয়া শেষ হতেই রাত হয়ে যাবে প্রায়।

তাড়াতাড়ি করে প্রথম ছুলোয়ার শিকারগুলি টেনে একটা দোলা-মতন জায়গায় নামিয়ে রেখে ছুলোয়াওয়ালারা প্রায় দৌড়ে দৌড়ে একটা পাকদণ্ডী পথে ছুটে গেল। পনের-কুড়ি মিনিট পরেই মুখিয়া একটি কেঁদ গাছে উঠে 'কু' দিল। নালার ওপাশের পাহাড় থেকে আওয়াজ হল 'কু-উ-উ-উ'। শুরু হল ছুলোয়া।

যশোয়ন্ত বলছিল যে, এই ছুলোয়াতে বাঘের আশা বেশি। কারণ, এখানের লোকদের ধারণা যে, মধ্যবর্তী পাহাড়ের নালাতেই বাঘের আস্তানা। যতদূর জানা গেছে, তাতে একটি বাঘ আছেই। গতকাল রাতের গোঙানির আওয়াজে যশোয়ন্তের সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। যদিও ছুলোয়া খুব তাড়াতাড়ি করে করা হল, তবু বাঘ বেরোনো মোটেই আশ্চর্য নয়।

রোদের তেজ প্রায় নেই বললেই চলে। কাঁধে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। দূরের টাঁড় থেকে তিতিরের কান্না ভেসে আসছে, টি—হা—টিঁউ টিঁউ— টি—হা। একটা বড় কাঁচপোকা আমার মাচার কাছে ঘুরে-ঘুরে গুন-গুন করে উড়ছে। বিদায়ী সূর্যের সোনালি ফালি পাতার ফাঁকে ফাঁকে এসে সারা বনে এক মোহময় বিষণ্ণ আবেশের সৃষ্টি করেছে। কোয়েলের উপরে দক্ষিণের আকাশে একদল লালশির পোচার্ড উড়ে যাচ্ছে ডানা ঝটপটিয়ে। সব মিলে এমন একটা নিস্তব্ধ নির্লিপ্তি যে, কী বলব।

ছুলোয়া শুরু হল। গাছের গায়ে টাঙ্গি দিয়ে হালকাভাবে মারায় ঠকাঠক শব্দ, ছুলোয়াওয়ালাদের মুখ-নিঃসৃত নানারকম বিচিত্র শব্দলহরী কানে এসে পৌঁছ্চ্ছে।

ধীরে ধীরে ওরা এগিয়ে আসছে। কাছে আসছে, আরও কাছে। মনে হল, ছুলোয়াওয়ালাদের দূর থেকে শোরগোল করে কী যেন বলল, উমমে যাতা হ্যায়। বড়কা বাঘোয়া বা। অন্য একজন বলল, ডাবল বাঘোয়া বা। আরেকজন বলল, সামহাল হো। বড়া বাঘ।

এমন সময় সুগতবাবুর মাচার দিক থেকে একটি রাইফেলের গুলির অতর্কিত আওয়াজ শোনা গেল—এবং তার বোধহয় পাঁচ-ছয় সেকেন্ড বাদেই একটা অত্যন্ত তীব্র ও বুককাঁপানো আর্ত চিৎকারে কানে এল। চিৎকার শুনে সেটা যে মানুষেরই চিৎকার, প্রথমে তা মনে হল না—বুকফাটা এমন একটা আঁক্—আঁ-আর্-র-র—আওয়াজ যে, শুনে গলা শুকিয়ে গেল। কিন্তু আগে কি পরে আর কোনও আওয়াজ হল না।

সেই ক্ষণস্থায়ী নিরুদ্ধ আওয়াজের পরই সমস্ত বন-পাহাড় আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আবার কাঁচপোকাটার গুনগুনানি শোনা যেতে লাগল কানের কাছে—গুন-গুন-গুন-গুন।

কী করব ঠিক করতে পারলাম না। যশোয়ন্তের কড়া নিষেধ ছিল যে, ছুলোয়া-চলাকালীন মাচা থেকে যেন না নামি। তা ছাড়া ভয়ও করছিল। সত্যিই যদি বাঘ হয়! ওই আওয়াজটা কীসের তা বুঝে উঠতে পারলাম না—বাঘের, না মানুষের!

কেন জানি মনে কু ডাক দিল যে, সুগতবাবু নিশ্চয়ই আক্রান্ত হয়েছেন। মাচা থেকে নামব কি নামব না ভাবতে ভাবতে ওই দিক থেকে আর একটি রাইফেলের গুলির আওয়াজ পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার নাম ধরে অত্যন্ত উত্তেজিত গলায় যশোয়ন্ত আমাকে ডাকছে শুনলাম।

এদিকে ছুলোয়া করনেওয়ালারা প্রায় মাচার কাছ অবধি পৌঁছে গেছে। মাচা থেকে নামতে নামতে শুনলাম, যশোয়ন্ত চেঁচিয়ে বলছে, ছুলোয়া বনধ করো, বন্ধ করো। খাতরা বন গিয়া—খাতরা বন গীয়া—খাতরা বন গীয়া।

যশোয়ন্তের কথা শুনে ছুলোয়াওয়ালারা একে অন্যকে হাঁক দিয়ে বলতে লাগল—খাতরা বন গীয়া হো—খাতরা বন গীয়া হো।

ঘন বনের মধে শীতের বিকেলে সেই থমথমে কুসংবাদটি গমগম করে কেঁপে কেঁপে ভেসে বেড়াতে লাগল বনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। খা-ত-রা—ব-ন—গী-য়া—হো—খা-ত-রা—বন—গীয়া—অ-আ-আ...

গাছ থেকে নেমে দৌড়ে সুগতবাবুর মাচার দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালাম।

মাচা থেকে সুগতবাবুর শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বাইরে ঝুলছে। কপাল মাথা ও চুল গড়িয়ে দরদর করে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচে মাটিতে পড়ছে এবং একটি মাঝারি আকারের বাঘ মাচার পেছনে মুখ-থুবড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। মাচার লতার বাঁধন খুলে গেছে। দু-তিনটি কাঠ খুলে নীচে পড়ে আছে।

আমাকে আসতে দেখে যশোয়ন্ত ওর রাইফেলটাকে ভূ-লুণ্ঠিত বাঘের গায়ে শুইয়ে তরতর করে মাচায় উঠে আমাকে নীচে দাঁড়াতে বলল। আমি দাঁড়াতেই সুগতবাবুকে ধরে আলতো করে আমার সাহায্যে মাটিতে নামাল।

ততক্ষণে হাঁকোয়া সবাই এসে গেছে। আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে নানারকম মন্তব্য করছে। টিগা কোথা থেকে দৌড়ে কী কতগুলো পাতা ছিঁড়ে এনে সেই রস নিঙড়ে দিতে লাগল সুগতবাবুর গলায়। সুগতবাবুর ডান কাঁধ এবং গলার কিছু অংশ ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে বাঘটা—। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে গলার ফুটো দিয়ে রক্ত ও ফেনা বেরোচ্ছে। ফরসা মুখটা এবং এলোমেলো চুলগুলো গাঢ় ঘন রক্তে থকথক করছে। চশমাটা মাচার নীচে পড়ে আছে। একটা কাঁচ ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে।

অত রক্ত দেখে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। গলা শুকিয়ে আসতে লাগল।

টিগা এবং তার অনুচরেরা বিনা বাক্যব্যয়ে দু' মিনিটের মধ্যে শলাইগাছের ডাল কেটে লতা দিয়ে বেঁধে একটা স্ট্রেচারের মতো বানিয়ে ফেলল। আমি এবং যশোয়ন্ত সুগতবাবুর অচৈতন্য শরীরটাকে ধরাধরি করে তাতে তুলে দিলাম। যশোয়ন্ত সুগতবাবুর রাইফেলটাকে আনলোড করে নিজের কাঁধে নিল। তারপর আমরা হনহনিয়ে জিপের দিকে চললাম। কিছু লোক রইল বাঘের তত্ত্বাবধানে।

এতসব কাণ্ড যে ঘটে গেল—সে সব বড় জোর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে। জিপে পৌঁছে আমি আর টিগা জিপের পেছনের সিটে সুগতবাবুকে যতখানি পারি সাবধানে

কোলে শুইয়ে নিয়ে বসলাম। রক্তে আমাদের গা-হাত-পা মাখামাখি হয়ে গেল। যশোয়ন্ত জিপের স্টিয়ারিং-এ বসল। ওখান থেকে কুটকু বাংলো জিপে বেশি দূরের পথ নয়।

যশোয়ন্ত বলল, বাঁচবে বলে মনে হয় না হে লালসাহেব।

আমি যেন চমকে উঠলাম। জখম হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, সব বুঝছি, সব দেখেছি, কিন্তু এই সুগতবাবু—মারিয়ানার এত আদরের সুগত, যিনি এখনও বেঁচে আছেন, আমার ও টিগার কোলে শুয়ে আছেন, এখনও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রাণের বার্তাবাহী রক্ত ও ফেনা বেরোচ্ছে—তিনি যে সত্যি সত্যিই মরে যাবেন, তা ভাবা যায় না।

মানুষ কী করে চোখের সামনে, কোলের মধ্যে মরে, তা জানি না কখনও—জানতে চাইওনি, এই মুহূর্তেও জানতে চাই না।

মানুষের এবং সদ্বংশজাত মানুষের রক্তেও তো কম দুর্গন্ধ নয়! চ্যাট-চ্যাট করছে। এ রক্তে শম্বরের রক্তের মতোই বদবু— ঈস যে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে জিপে পড়ছে, জমে যাচ্ছে, সে রক্ত কোনও চিতল হরিণের নয়, শুয়োরের নয়; সে রক্ত যে সুগতবাবুর, তা ভাবতে পারছি না।

যশোয়ন্ত বলল, বাঘটাকে সামনা-সামনি গুলি করেই ভুল করেছিলেন উনি। বাঘটা নিশ্চয়ই একেবারে মুখোমুখি আসছিল। কিন্তু ওঁর গুলি বাঘের বুকে লাগা সত্ত্বেও বাঘ সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে মাচায় উঠে ওই মরণ-কামড় দিয়েছিল।

ও বলল, আমি চিৎকার শুনেই দৌড়ে গেছিলাম এবং দূর থেকে দেখি, বাঘ কাজ শেষ করে মাচা থেকে লাফিয়ে পড়ছে। কিন্তু মনে হল, পালাবার চেষ্টা করেও পারছে না। ওই অবস্থাতেই আমি বেশ দূরে থাকা সত্ত্বেও একটি গুলি করলাম এবং তাতেই দেখলাম বাঘ শুয়ে পড়ল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুগতবাবু হার্ড-নোজড বুলেট ব্যবহার করেছিলেন, সফট-নোজড বুলেট হলে বাঘ লাফিয়ে হয়তো মাচায় উঠতে পারত না। ডাবল ব্যারেল রাইফেল থাকলে হয়তো আর একটি গুলি করতে পারতাম, বাঘ মাচায় ওঠার আগে। যাক, সেসব আলোচনা করে এখন আর কী হবে। কী লাভ?

আমি বললাম, সব তো বুঝলাম, সব তো বুঝলাম, এখন মারিয়ানাকে গিয়ে কী বলবে যশোয়ন্ত? মারিয়ানাকে গিয়ে কী বলব?

যশোয়ন্ত উত্তর দিল না। রাস্তায় চোখ রেখে গাড়ি চালাতে লাগল।

দেখতে দেখতে কুটকু বাংলোয় পৌঁছে গেলাম আমরা; যশোয়ন্ত বলল, একটা কম্বল, মারিয়ানার একটা শাড়ি এবং অ্যান্টিসেপটিক যদি কিছু বাংলোয় থাকে তো এক্ষুনি নিয়ে এসো! মারিয়ানাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। এক্ষুনি। নষ্ট করার মতো সময় নেই।

টিগার কোলে সুগতবাবুর মাথাটা দিয়ে দৌড়ে গেলাম বাংলোয়। যশোয়ন্ত জিপটা হাতার মধ্যে ঢোকালেও বাংলো থেকে একটু দূরে রেখেছিল।

মারিয়ানা ঘরে নেই। বাবুর্চিখানায় কী যেন করছে। বাবুর্চিখানার দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই উঁচু উনুনের উপরের কড়াইয়ে কী একটা নাড়তে নাড়তে ও বলল, কি মশাই? ফিরেছেন? এত তাড়াতাড়ি? তারপর আমুদে গলায় বলল, আপনাদের জন্য চিঁড়ের পোলাও রান্না করালাম। সুগত খুব ভালবাসে। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

উত্তর না দিয়ে আমি ডাকলাম, মারিয়ানা—।

মারিয়ানার মনে আমার সেই ডাক নিশ্চয়ই কোনও হিমেল ভয় পৌঁছে দিয়েছিল। এক মোচড়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েই ও আমার রক্তাক্ত চেহারা দেখে আঁতকে উঠল। চমকে উঠে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে লালসাহেব?

বললাম সংক্ষেপে: যা বলার। মনে হল, মারিয়ানার সেই চমক কেটে গেল। ওর চোখ দুটি নিথর হয়ে গেল। দৌড়ে ঘরে গিয়ে একটা সাদা শাড়ি, এক শিশি ডেটল এবং একটি কম্বল নিয়ে এল। আমি আর এক দৌড়ে ওর ঘরে ঢুকে ওর শালটি নিয়ে এলাম। তারপর আমরা দুজনে দৌড়ে এসে জিপে উঠলাম।

টিগা ও চৌকিদার বন্দুক রাইফেলগুলো নিয়ে ঘরে গেল। ওরা বাংলোর জিম্মাদারিতে রইল। সুগতবাবুর যে ড্রাইভার, সে খাস বেয়ারাও বটে। সে লোকটি ভীষণ কাঁদতে লাগল—কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—বাবু, আমার দাদাবাবুকে বাঁচান, আপনারা যেমন করে পারেন বাঁচান, নইলে আমি কোন মুখ নিয়ে বউদির কাছে ফিরব?

ওকে যশোয়ন্তের কাছেই বসতে বললাম, জিপের সামনের সিটে।

যশোয়ন্ত জিপ স্টার্ট করল।

অন্ধকার হয়ে গেছে। হেডলাইটের আলোটা জংলি পথে ছলছল চোখে চলতে লাগল। পথও তো কম নয়। ছিপাদোহরে ডাক্তার আছেন, কিন্তু এইরকম রুগীর চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম নেই। তাই উপায় নেই কোনও। ডালটনগঞ্জেই যেতে হবে। কোয়েলের জল পেরিয়ে ওপারে পৌঁছল জিপ। তারপর গোঙাতে গোঙাতে চলল।

মারিয়ানা কিন্তু কাঁদল না একটুও। ভেবেছিলাম কাঁদবে। একবার অস্ফুটে শুধু বলেছিল, সুগত—উঃ...।

সাদা শাড়িটা সুগতবাবুর কাঁধে ও গলায় জড়িয়ে তার উপরে জবজবে করে ডেটলের পুরো শিশি উপুড় করি দিলাম। যশোয়ন্ত জিপের ড্যাশ বোর্ডের ড্রয়ার থেকে রামের শিশিটা বের করে মুখ হাঁ করে ঢেলে দিতে বলল। দিলামও বটে, কিন্তু কিছুটা কষ বেয়ে গড়িয়ে গেল এবং কিছুটা গলার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এল।

তাতে ভাল হল কি মন্দ হল কে জানে?

পাছে ঠাণ্ডা লাগে, তাই আধখানা কম্বল দিয়ে সুগতবাবুকে ঢেকে দিয়েছি। আর আধখানা নীচে দিয়েছি। আমার কোলের উপর কোমর ও পা রেখেছি, মারিয়ানার কোলে মাথা। পায়ের কিছুটা বেরিয়ে আছে পেছনে, পাঁজাকোলা করে শোয়ানো সত্ত্বেও। অতবড় লম্বা-চওড়া মানুষটা!

যশোয়ন্ত যত সাবধানে পারে জিপ চালাচ্ছে, যাতে ঝাঁকুনি কম লাগে। কিন্তু এদিকে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার। মারিয়ানা কোনও কথা বলছে না। মাঝে মাঝে মুখটা দিয়ে সুগতবাবুর কম্বলে ঢাকা বুকটার কাছে রাখছে। বোধ হয় হৃৎপিণ্ডের রায় শুনছে। একেবারে সোজা হয়ে দৃঢ় ঋজু শালগাছের মতো বসে আছে মারিয়ানা।

উল্টো দিক দিয়ে একটা ট্রাক আসছিল। যশোয়ন্ত জিপটা বাঁ দিক করল, ওই ট্রাকের হেডলাইটের আলোয় জিপের ভেতরটা ভরে গেল। সেই আলোয় দেখলাম, মারিয়ানা জিপের পরদায় হেলান দিয়ে সোজা হয়ে বসে আছে। দু চোখ বেয়ে নিঃশব্দ ধারায় জল বইছে। চোখে চোখ পড়তেই, দাঁতে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল ও।

হুটারের কাছাকাছি গিয়ে যশোয়ন্ত এক সেকেন্ডের জন্যে জিপটা থামাল, একটা চুট্টা ধরাবে বলে। দেশলাই জ্বালতেই মারিয়ানা ঘৃণার সঙ্গে বলল, যশোয়ন্তবাবু, একটা লোক মরতে বসেছে আর আপনার চুট্টা না খেলেই হত না।

যশোয়ন্ত অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি চুট্টাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার জিপে স্টার্ট দিল।

এমন সময় সুগতবাবুর গলা থেকে একটা জোর ঘড়-ঘড়ানি আওয়াজ হতে লাগল। একটানা মিনিটখানেক—তারপরই আওয়াজটা হঠাৎ থেমে গেল।

মারিয়ানা কেঁদে উঠে শুধোল, কী হল? এমন হল কেন? যশোয়ন্তবাবু, কী হল?

যশোয়ন্ত দৃঢ় গলায় ধমকের সুরে বলল, কিছুই হয়নি। ভাল করে শোয়ানো হয়নি সুগতবাবুকে। ওঁর নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। যশোয়ন্তের কথামতো আমরা ওঁকে একটু নাড়াচাড়া করে ভাল করে শোয়ালাম।

ডালটনগঞ্জের হাসপাতালে যখন পৌঁছালাম, তখন রাত প্রায় ন' টা। যশোয়ন্ত দৌড়ে গেল হাসপাতালের ভিতরে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন ওয়ার্ড-বয় একটা স্ট্রেচার নিয়ে এল। আমরা দুজন সুগতবাবুকে সাবধানে তাতে তুলে দিলাম। রক্ত জমে মারিয়ানার শাড়িতে একেবারে থকথক করছে। আমাদের প্রত্যেকের গায়েই রক্ত। আমরা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

অপারেশন থিয়েটারের টেবিলের উপর ওঁকে রাখা হল। সাহেব ডাক্তার এসে স্টেথিস্কোপ লাগালেন বুকে। নার্সরা ডিসইনফেকট করার যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখতে লাগল ট্রেতে। কিন্তু সকলকে হতভম্ব করে ডাক্তার বললেন, আই অ্যাম স্যরি জেন্টেলমেন, হি মাস্ট হ্যাভ ডায়েড অ্যাট লিস্ট অ্যান আওয়ার ব্যাক।

যশোয়ন্ত সুগতবাবুর হাত থেকে রিস্টওয়াচ ও হিরের আংটিটা খুলে নিল। বুকপকেট থেকে পার্স এবং কতকগুলো কাগজপত্র যা ছিল, তা আমি নিয়ে আমার কাছে রাখলাম। কিছুক্ষণ পর মারিয়ানাকে আমরা জোর করে নিয়ে সুমিতাবৌদির কাছে রেখে এলাম।

কিছুতেই যেতে চাইছিল না ও সুগতবাবুকে ছেড়ে।

বিকেলবেলার হাসিখুশি সুপুরুষ রাতের বেলার রক্তাক্ত শব হয়ে গলে।

সুমিতাবউদির বাড়ি থেকে ফিরবার সময় যশোয়ন্ত বলল, একটু চোখ রেখো চারদিকে। এখানে বাঘ নেই বটে, তবে জগদীশ পাণ্ডে আছে। যে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।

যশোয়ন্ত বাইরে গেল আবার। কলকাতায় মিসেস রায়ের কাছে ট্রাঙ্ককল বুক করে হাসপাতালের অফিসেই আমি বসে রইলাম।

ডালটনগঞ্জ শহরে যশোয়ন্তের প্রতিপত্তি ও প্রচুর জানাশুনা থাকাতে ডেথ-সার্টিফিকেটটা বের করতে আমাদের বেগ পেতে হল না। পুলিশের হাত থেকেও সহজেই নিস্তার পাওয়া গেল। পোস্টমর্টেম করল না। যশোয়ন্ত বলল, ভেবেছিলাম জগদীশ পাণ্ডের ডেথ-সার্টিফিকেট নিতে আসব—তা না; কী হল।

বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম। গতকাল সকাল থেকে আজকের রাত, এর মধ্যে কত কী ঘটে গেল। এই সামান্য সময়ের মধ্যে। রাংকায় যশোয়ন্ত বলেছিল আমাকে, লালসাহেব, বাঘ যে কী জিনিস তা একদিন জানবে। তা যে এমন করে এবং এত তাড়াতাড়ি জানতে হবে, তা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।

পকেট থেকে সুগতবাবুর পার্সটা বের করলাম। ভিজিটিং কার্ড রাখবার জায়গায় একটি ফোটো। মারিয়ানা এবং অন্য এক ভদ্রমহিলার, খুব সম্ভব মিসেস রায়ের। পাঁচটা একশো টাকার নোট। পনেরোটা এক টাকার নোট গোছানো। ন'টা দশ টাকার নোট। কলকাতার দুটি দোকানের ক্যাশমেমো। রাইফেল বন্দুকের লাইসেন্স যে বন্দুকের দোকানে রিনিউ করতে দেওয়া রয়েছে, তার রসিদ।

অন্য কাগজগুলি রক্তে প্রায় মাখামাখি হয়ে গেছে। প্রথম কাগজটিই একটি চিঠি। এবং আশ্চর্যের কথা, মারিয়ানাকেই লেখা।

হাসপাতালের দেওয়াল ঘড়িটা টিকটিক করতে লাগল। একা একা বসে আমি চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম।

কুটকু
৩০/১২

আমার মারিয়ানা,

তুমি আমার পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছ কিনা জানি না। তুমি আমার পাশেই আছ, অথচ এত দূরে আছ যে, তোমাকে চিঠি লিখতে হচ্ছে।

আগামিকাল তোমার বন্ধুরা আসবেন শিকারে। তাঁদের সামনে বলবার ইচ্ছে থাকলেও হয়তো তোমায় কিছু বলতে পারব না। তা ছাড়া, তুমি যখন একলা থাকো, তখনই বা বলতে পারি কই? অবশ্য নতুন করে তেমন কিছু বলার নেইও। তবু তোমার সঙ্গে একা একা আরও দু-একটা দিন কাটাতে পারলে ভাল লাগত। তোমার বন্ধুদের যোগ্য সম্মান দিয়েই বলছি, যে...(তারপর এত রক্ত লেগে আছে যে পড়া যাচ্ছে না।)

মারিয়ানা, বড় গাছ আমার খুব ভাল লাগে। ইচ্ছে করে, আমি কোন উষ্ণ গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় দারুণ ক্লান্ত হয়ে আমার সর্বস্ব এলিয়ে কোনও গাছের ছায়ায় বসে ক্লান্তি অপনোদন করি।

আমার ইচ্ছে করে, তুমি কোনও গাছ হও। কোনও চেরি গাছ, কোনও কৃষ্ণচূড়া গাছ কিংবা কোনও জ্যাকারাণ্ডা গাছ, যার সুগন্ধি ছায়ায় বসে আমি বাঁচবার তাগিদ পেতে পারি।

তুমি হতে পারবে সে গাছ? পারবে না, পারবে না, পারবে না। আমি জানি যে তুমি তা পারবে না। অথচ কোনও দিন পারবে না বলেই হয়তো মনে মনে সব সময় আশা করি যে, তুমি পারবে, পারবে, পারবে। বলতে পারো? কেন এমন উইশফুল থিংকিং? যা কোনওদিন পাব না, তার জন্যে আর কতদিন এমন কাঙালপনা করব বলতে পারো?...

তোমার বন্ধু মহুয়া আজকাল আমাকেই প্রাঞ্জলভাবে বলে যে তাকে ছাড়া আমার আর প্রায়ই কাউকে (অর্থাৎ তোমাকে) ভালবাসা চলবে না। আমার সবটুকু ভালবাসা পাবার মনোপলি-রাইট যে তাকে সমাজ দিয়েছে, সে সম্বন্ধে সে সচেতন। সে যে আমাকে অকৃত্রিম ভালবাসে না, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। সেটা সেও যেমন জানে, আমিও জানি। অথচ তুমি বলো, মুখে না বললেও হাবেভাবে বলো যে, আমারও একমাত্র ধর্মপত্নীকেই ভালবাসা উচিত। তোমাকে ভালবাসা আমার পক্ষে পাপ। তোমার পক্ষে আমাকে কোনও কিছুই দেওয়া সম্ভব নয়। শারীরিক তো নয়ই; মানসিকও নয়।

তুমি এবং তোমার বন্ধু দুজনে দুজনের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছ। তুমি বন্ধুর স্বার্থ দেখছ এবং বন্ধু তোমার স্বার্থ দেখছ।। মধ্যে আমি বোকার মতো দুজনকে সমানভাবে ভালবেসে অন্তর্দ্বন্দ্বে ও অপূর্ণতার গ্লানিতে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি।

তুমি লেখাপড়া শিখেছ, কিন্তু বৃথাই। বাইরে অনেক পুঁথি ওলটালে কী হয়, মনে মনে গোঁড়া মেয়েটিই আছ। সংস্কার-মুক্তি হয়নি। তোমার সংস্কার-মুক্তি হয়নি।

তোমার বন্ধুকে আমার যা ছিল সব দিয়েও সন্তুষ্ট করতে পারিনি—কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি যে, সে কথা সে জানে। তোমার কাছ থেকে কাঙালের মতো চেয়ে তোমাকে শুধু বিরক্তই করেছি—তোমাকেও কণামাত্র আনন্দিত করতে পারিনি।

বরাবর জেনে এসেছি যে, অন্য কাউকে দুঃখী না করে নিজে সুখী হওয়া যায় না। কিন্তু আজ জানছি যে, নিজে পরম দুঃখী হয়েও অন্য কারওকেও কণামাত্র সুখী করা যায় না। আমার মতো লোক দুঃখ পেতেই জন্মায়, দুঃখ হয়তো তাদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।

জানো মারিয়ানা, আজকাল মাঝে মাঝে কেমন একটা আত্মহত্যার ইচ্ছা মনের মধ্যে উঁকি দেয়। অথচ আমার মতো এমন তীব্রভাবে বাঁচতে বোধ হয় আর কেউ চায়নি। তবু, আজকাল আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

আমার মৃত্যুর পর অন্তত নিরুচ্চারে মনে মনে বোলো যে, তুমি আমাকে ভালবাসতে, কিন্তু তা দেখাতে পারোনি। তুমি আমাকে অনেক কিছু দিতে চাইতে, কিন্তু দিতে পারোনি। কারণ সমাজ তোমাকে সেই মুক্তি দেয়নি। এ যদি সত্যি নাও হয়, তবু মিথ্যে করে, ভান করেও বলো। আমি অশরীরী সত্তায় এসে কান পেতে সেই কথা শুনব। তুমি যখন ঘুমোবে, তখন এসে তোমার ঘুমন্ত চোখের পাতায় চুমু খেয়ে যাব। তাতে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি হবে না।

কেন জানি না। কেবলই মনে হয় যে, আমার দিন ফুরিয়েছে। আজ সন্ধ্যাবেলা নদীর উপরের বারান্দায় বসে তোমার 'দিন ফুরালো হে সংসারী' গানটি শুনে বড় ভয় লাগল। একে কী বলব? Premonition?

জানি না মারিয়ানা সোনা। আমার বড় ভয় করে। মরতে আমার বড় ভয় করে।

ইতি—তোমার সুগত



তেইশ

আবার আমার পুরনো রুমান্ডিতে ফিরে এলাম। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরলাম। কুটকুতে যখন যাই, তখন আমাদের সামনে অত বড় একটা শোকাবহ ঘটনা অপেক্ষা করে আছে বলে জানতাম না। মারিয়ানার কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে ভারী কষ্ট হয়।

কলকাতা থেকে সুগতবাবু ও মিসেস রায়ের আত্মীয়স্বজন ট্রাঙ্ককল পেয়েই গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। মৃতদেহ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন। মারিয়ানাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন ওঁরা। হয়তো না গেলেই পারতেন। কারণ মারিয়ানার বন্ধু মহুয়া, পরোক্ষে তাঁর এত বড় সর্বনাশের মূলে যে মারিয়ানাই, এমন কথা হয়তো সেই শোকতপ্ত মুহূর্তে মুখ ফসকে বলেও ফেলবেন মারিয়ানাকে।

তা যদি বলেন, সেটা মারিয়ানার কাছে দুর্বিষহ বলেই ঠেকবে। উনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে, সুগতবাবুর সমস্ত পাগলামি, ছেলেমানুষের মতো কাঙালপনা সত্ত্বেও, আন্তরিক ও সর্বাঙ্গীণ চাওয়া থাকা সত্ত্বেও, এক কণাও না দিয়ে মারিয়ানা তাকে নির্মমভাবে বারে-বারে ফিরিয়েই দিয়েছে। নিজেকে বড় বড় কথার বুলি দিয়ে ভুলিয়েছে। নিজেকে বুঝিয়েছে, বন্ধুর স্বামীকে ছিনিয়ে নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা।

তবু এও সত্যি যে, সুগতবাবুর মৃত্যুতে মারিয়ানার মতো বোধ হয় আর কেউই বোঝেনি যে সে সুগতকে তার সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসত।

সুগতবাবুর পার্স এবং অন্যান্য সবকিছু কাগজপত্র তাঁর বড় দাদার হাতে দিয়ে দিয়েছিলাম আমি। কেবল সেই রক্তমাখা চিঠিখানি দিতে পারিনি। সেটি এখনও আমার কাছেই আছে। মারিয়ানা যখন শিরিণবুরুতে ফিরবে, তাকে গিয়ে দিয়ে আসব। যদি সে আর না ফেরে, তাহলে ভেবেছিলাম, সে চিঠি কোয়েলের জলে ভাসিয়ে দেব। আবেগভরা পাহাড়ি নদীর উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সুগতবাবুর অসামাজিক প্রেম বাহিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ক্যালেন্ডারে একদিন হঠাৎ তাকিয়ে দেখলাম, সময়টা একটা ঘাসফড়িং-এর মতো লাফাতে লাফাতে কখন জানুয়ারির মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে।

প্রথম এখানে আসার পর দেখেছিলাম, মহুয়া-ডাঁরের মেলায় লোক যাচ্ছে দলে দলে। তারপর কত যে মেলা হল। পালামৌ যেন মেলারই জায়গা। প্রতি মাসে কিছু না কিছু কোথায়ও না কোথায়ও লেগেই আছে। অনেক রকম জিনিস মেলে এই মেলাগুলিতে। ওঁরাওদের হাতে-বোনা সবুজ ও লাল কাজ করা দোহর। খুব একটা সুরুচির ছাপ আছে।

মেয়েদের গলায় হাতে এবং পায়ে পরার পেতলের গয়না। কাঠের কাঁকই—আরও কত কী দেখার জিনিস, কেনার জিনিস।

বছরের প্রথম মেলা হয় জানুয়ারির প্রথম দিকে হির-হিঞ্জে, বালুমঠ থানায়। তারপর ডালটনগঞ্জিয়া মেলা—ফেব্রুয়ারির প্রথমে। চাঁদোয়া থানায় চাকটার মেলাও ছোট নয়—ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি বসে। মার্চের প্রথমে মানাতু থানার শরিকদলে, এবং মাসের শেষে নগর-উন্টারীতে, উন্টারী থানায়। এপ্রিল ও মে-তে একটি করে মেলা। ভওনাথপুরের কিতারে এবং মহুয়াডাঁরে।

বর্ষাকালে যাতায়াতের অসুবিধার জন্যই বোধ হয় মেলাটেলা বিশেষ নেই। সেই নভেম্বর মাসে আবার বসে। সবশেষের মেলা ডিসেম্বর মাসে—কের থানায় বালুমঠে।

জানুয়ারিতেই শীতের প্রকোপটা সবচেয়ে বেশি। এখন পাহাড়ে বনে টাটকা তরিতরকারির অভাব হয় না। সব কিছুরই যেন স্বাদ আলাদা। প্রতি বৃহস্পতিবারে যবটুলিয়াতে যে হাটিয়া বসে, সেই হাটিয়ার মুরগিগুলো যেন অনেক বেশি স্বাদু হয়ে যায়। মাঝে মাঝে হাটে বগারী ভাজা পাওয়া যায়। বগারী পাখির ঝাঁকে একসঙ্গে শয়ে শয়ে পাখি থাকে। দেখতে চড়ুইয়ের মতো, কিন্তু চড়ুইয়ের চেয়েও অনেক ছোট। এখানকার লোকেরা টাঁড়ে জাল পেতে ধরে। ঝুড়িতে জ্যান্ত পাখি নিয়ে বসে থাকে উনুন সামনে করে। অর্ডার হলেই সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে ভেজে দেয়। নুন আর শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে খেলেই হল। ওঁরাও, খাঁরওয়ার, ভোগতা, মুণ্ডা, কাহার—সকলে যে কী উপাদেয় জ্ঞানে খায়, কী বলব! খেতে সত্যিই ভাল।

শিকার করতে শেখার পর থেকে মুরগি বড় একটা কিনি না। আর এখন বুনো মুরগিরও যা স্বাদ। ধান খেয়ে খেয়ে পুরু চর্বির আস্তরণ পড়েছে। শেষ বিকেলে ধানখেতে যখন মুরগির ঝাঁক চরতে নামে সোনালি পাখনায় দ্যুতি ছড়িয়ে, তখন দেখতে ভারী ভাল লাগে। মুরগি নিধন তো দৈনন্দিন কর্মে দাঁড়িয়েছে এখন। তা ছাড়া খাবার জন্যে হরিয়াল, তিতির, কালিতিতির এবং আসকলও মারি। কালি-তিতিরের মাংস নয় তো, মনে হয় মাছ খাচ্ছি। বটেরও মারি। দেখে মনে হয়, তিতিরের বাচ্চা বুঝি।

আজকাল নিজে নিজে মাঝে মাঝে মুরগি রাঁধি। যশোয়ন্ত কি ঘোষদা কি রমেনবাবু এলে, একটা মন-গড়া বিরাট নাম দিয়ে দিই—রাশ্যান—আমেরিকান—নাম একটা হলেই হল। নাম যাই দিই না কেন, খেয়ে কেউ খারাপ বলে না। যশোয়ন্ত বলে, দ্যাখো লালসাহেব, তোমার মধ্যে যে এত গুণ সুপ্ত ছিল, তা কি এই রুমান্ডিতে না এলে জানতে পেতে?

হাসতে হাসতে বলি, যা বলেছ।

সেদিন ঘোষদা এসেছিলেন—অবিশ্বাস্য খবর নিয়ে। ওঁদের বিয়ের পর প্রায় দশ বছর কেটে গেছে—কোনও সন্তান-সন্ততি হয়নি এ পর্যন্ত। কিন্তু সেদিন ঘোষদা জিপ থেকে নেমেই এক গাল হেসে বললেন, শিগগিরই ছেলের বাবা হচ্ছি হে, এই ছ’-সাত মাস বাদে—সন্দেশ খাওয়াও, সন্দেশ খাওয়াও। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, কনগ্রাচুলেশান্স। বললাম, এ তো সন্দেশের খবর নয়। আপনাকে শাণ্ডিল্লা লাডডু খাওয়াব।

খবরটা আনন্দের বটে। কিন্তু সত্যি বলতে কী আমার আনন্দ হল না শুনে। পুরনো সুমিতাবউদিকেই আমরা দেখে অভ্যস্ত, হই হই করা, ফুর্তিবাজ, রাতের পর রাত আড্ডা-মেরে-কাটানো। সুমিতাবউদির ছেলে হলে সেই বউদিকে তো আর পাব না। তা ছাড়া,

কোলের কাছে কেউ ছিল না বলে প্রবাসী ছেলেগুলোকে এমন দিদির মতো যত্নআত্তি করতেন। ছেলে না শত্তুর। আমার ভাল লাগল না। শুনলাম, সুমিতবউদির এই পাহাড়ি পথে জিপে করে আমার এখানে আসা একেবারে বারণ। তা ছাড়া সুমিতাবউদি শিগগিরই কলকাতায় চলে যাবেন ওঁর মায়ের কাছে। একেবারে ছেলে কোলে করে ফিরবেন। দশ বছর ছাড়া চলল তো এক্ষুনি ছেলের কি এত দরকার ছিল, বুঝি না।

যাই হোক, ভাল করে মুরগি রেঁধে টেকো বুড়োকে অগ্রিম সাধের নেমন্তন্ন খাইয়ে দিলাম।

ঘোষদা খেয়েদেয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তোমাকে সেদিন কেচকিতে যা বলেছিলাম, মনে আছে তো?

উত্তরে আমি চুপ করে রইলাম।



চব্বিশ

রবিবার, বাগানে বসে আছি আলোয়ান মুড়ে সকালবেলার রোদ্দুরে, এমন সময় একটি বছর পনেরো বয়সের ওঁরাও ছেলে দৌড়োতে দৌড়োতে আমার বাংলোয় ঢুকল। আমার সামনে এসে নমস্কার করে যা বলল তার সারাংশ হচ্ছে, তাদের বাথান ভেঙে কাল রাতে একটা বড় চিতা তাদের আদরের বাছুরটিকে মেরে, টেনে নিয়ে গেছে জঙ্গলে। তার একটি বিহিত করা দরকার।

গ্রামে টাবড় শিকারি থাকতে আমার তলব পড়ল কেন বুঝলাম না। পরে জানলাম, ওদের গাদা বন্দুকের চেয়ে টোপিওয়ালা বন্দুকের উপর শ্রদ্ধা বেশি। তা ছাড়া জেনে ভাল লাগল যে, শিকারি হিসেবে আমার বেশ সুখ্যাতি হয়েছে। অবশ্য সেটা আমার কোনও রকম চেষ্টা বা গুণ ব্যতিরেকেই। যশোয়ন্তবাবুর সাকরেদ, সুতরাং ভাল শিকারিই হবেন এমন একটা ধারণাই এর মূলে।

জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এলাম। ছেলেটির সঙ্গে এগোলাম।

সুহাগী বস্তির একেবারে শেষ বাড়ি তাদের—সুহাগী নদী থেকে বেশি দূরে নয়। ওঁরাওদের বাড়ি যেমন হয়—অদ্ভুত ধাঁচের। চৌকো নয়।

বাড়ির লাগোয়া বাথান। কাঠের খুঁটি পোঁতা, উপরে শলাই কাঠের ছাউনি। তার উপরে শন চাপা দেওয়া। কাঠের খুঁটি পোঁতা, উপরে শলাই কাঠের ছাউনি। তার উপরে শন চাপা দেওয়া। চিতাটা সামনে দিয়ে দরজা ভেঙে ঢুকে বাছুরটাকে মেরে আবার সামনে দিয়েই বাছুরটাকে মুখে করে জঙ্গলে ঢুকে নদীর দিকে চলে গেছে। বাথানে যখন ঢোকে, তখন গরুটা দড়ি ছিঁড়ে এসে চিতাটাকে শিং দিয়ে গুঁতোবার চেষ্টা করেছে। পা দিয়ে চাঁট মারারও চেষ্টা করেছে, কিন্তু দড়ি ছিঁড়তে না পারায় কিছুই করতে পারেনি। অবশ্য দড়ি ছিঁড়লে তার অবধারিত ফল হত যে, গরুটাও চিতার হাতে মরত। গরুটাকে মারা চিতাটার পক্ষে মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু অত ভারী জানোয়ারটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারব না বলে অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, গরুটাকে মারেনি।

থাবার দাগ দেখে বুঝলাম, বেশ বড় চিতা এবং বিলকুল মস্ত্। ঘষটানোর দাগ দেখে দেখে আমরা প্রায় তিনশো গজ গিয়ে বাছুরটার হদিশ পেলাম। পেছনের দিক থেকে খেয়েছে সামান্যই। পেটটা ফুলে ঢোল। যেখানে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, সেখানটায় অনেকগুলো পুটুস ও করৌঞ্জের ঝোপ। তার পাশে বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা। বড় গাছ নেই। ঘাসে ভরা বিস্তীর্ণ টাঁড়।

সময়টা শুক্লপক্ষ। চাঁদের আলোয় বন্দুক দিয়ে গুলি করতে মোটে অসুবিধা হয় না, রাইফেল থাকলেই বরং অসুবিধে হয়। তাই ঠিক করলাম একটা অর্জুন গাছে বসব। গাছটা সেই ফাঁকা জায়গার একেবারে গা-ঘেঁষা। ফাঁকা জায়গাটা অর্জুন গাছটি থেকে বড় জোর পনেরো হাত দূরে। একটি খয়ের গাছ ছিল সেখানে।

আমার সঙ্গে সেই ছেলেটি এবং সুহাগী গ্রামের আরও দুটি লোক এসেছিল। তাদের বললাম, অর্জুনগাছে একটা ছোট চারপাই উল্টো করে বেঁধে মাচা বানাতে।

সুগতবাবুর মাচায়-শায়ীন রক্তাক্ত শরীরটির স্মৃতি এখনও মন থেকে পুরোপুরি মোছেনি। চিতাবাঘ অবশ্য গাছ বেয়েই উঠতে পারে। তাই উঁচু বা নিচু করে মাচা বাঁধা অবান্তর। তবে মাচা বেশি উঁচুতে বাঁধলে গুলি করতে খুব অসুবিধা হয়। তাই মাঝামাঝি উচ্চতায় বাঁধতে বললাম। গরুটাকে টেনে এনে সেই খয়ের গাছের গুঁড়িতে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধাব রাতে। নইলে চিতা দড়ি ছিঁড়ে নিয়ে যেতে পারে।

ওরা চুপচাপ আমার কথামতো কাজ করল।

সেখানেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকলাম। ঘাসের উপর পায়ের দাগ ভাল বোঝা যায় না। তবু যতদূর বুঝলাম চিতাটা নদী পেরিয়ে নয়াতালাওর দিকে চলে গেছে। গরুটাকে ঠিক করে বাঁধা হলে উপরে পাতাসুদ্ধু ডাল চাপা দিয়ে রাখা হল, যাতে শকুনের নজর না পড়ে।

তারপর ফিরে এলাম।

বিকেলবেলা, বেলা থাকতে থাকতে গিয়ে মাচায় বসলাম। সঙ্গে ছেলেটি ও তার বাবা এসেছিল। গরুর গা থেকে ডালপালা সব কিছু সাবধানে সরিয়ে নিয়ে খয়ের গাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে, তারা কথা বলতে বলতে গ্রামের দিকে ফিরে গেল।

সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। একটি বিষণ্ণ সোনালি আভায় সমস্ত বনস্থলী ভরে গেছে। জঙ্গলের মধ্য থেকে মোরগ ও ময়ূরের ডাক ভেসে আসছে। সুহাগী গ্রামের মোরগগুলো দিন-শেষের ডাক ডাকছে গলা ফুলিয়ে। গলায় কাঠের ঘণ্টা ডুং ডুং করে বাজিয়ে গাঁয়ের কাঁড়া বয়েল ফিরে গেছে। যবটুলিয়া বস্তির গম-ভাঙা কলের পুপ-পুপানি থেমে গেছে। গাছে গাছে পাখিরা আসন্ন রাতের জন্য তৈরি হচ্ছে। বিস্তীর্ণ টাঁড়ের সোনালি সায়াহ্নকারে তিতিরগুলো সমস্বরে ডাকছে। আজকাল তিতির কাঁদলেই মনে হয় ওরা বলছে, ফাঁকি-দিয়া, ফাঁকি-দিয়া, ফাঁকি-দিয়া।

সুহাগী নদীর দিক থেকে একটা লক্ষ্মীপেঁচা দুরগুম দুরগুম দুরগুম করে তিনবার ডেকে উঠল। তার এখন সকাল হল। রোঁদে বেরুবে। কোথায় ইঁদুর, কোথায় ব্যাঙ সেই ধান্দায়। দুটি টিটি পাখি টিটির টি— টিটির টি করতে করতে মাঠটা পেরিয়ে কোনাকুনি উড়ে গেল। মাচার পিছনেই মাটিতে একদল ছাতারে আলো থাকতেই ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে তাবৎ জাগতিক ব্যাপারের উপর অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করছিল। অন্ধকার নেমে আসতে তারাও নির্বাক হয়ে গেল। কিন্তু পিটিসের ঝোপের ভিতরে তাদের উসখুসানি, নড়ে-চড়ে বসার আওয়াজ—কুরকুর—খুরখুর অনেকক্ষণ অবধি শোনা গেল।

তারপর হঠাৎ দেখলাম, একটি উষ্ণ ভরন্ত সুরেলা দিন একটি সিক্তা রুপোলি হিমেল রাতে গড়িয়ে গেল।

দিনের আলো থাকতে থাকতে চিতাটা আসবে আশা করছিলাম। এখন কপালে ভোগান্তি আছে। যা শীত— তা বলার নয়। একটু পরেই পাতা বেয়ে হয়তো শিশির

পড়বে টুপটুপিয়ে।

চরাচর উদ্ভাসিত করে মোমের থালার মতো একটি হলুদ চাঁদ পাহাড়-বনের রেখা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে আকাশ বেয়ে উঠল। জঙ্গলের প্রতি আনাচে-কানাচে হলুদ আলো ছড়িয়ে গেল। যা অদৃশ্য ছিল, তা দৃশ্যমান হল। যা অস্পষ্ট ছিল, তা স্পষ্ট হল। ধারালো ঘাসের চিকন শরীরে আলো পিছলে পড়তে লাগল।

কোথা থেকে এল জানি না; দুটি বড় কানওয়ালা খরগোশ লাফাতে লাফাতে মাঠটি পার হয়ে চলে গেল। আধ ঘণ্টা পরে একটি লুমরি এল। হাওয়ায় রক্তের গন্ধ পেয়ে নাক তুলে নিশ্বাস নিল। তারপর বাছুরটার কাছে এসে, ঘোষদা যেমন করে আমার রান্না-করা মুরগির দিকে চেয়ে থাকেন, তেমনই করে চেয়ে রইল। ঘুরেফিরে দেখল। কাছে গেল, ফিরে এল।

এমন সময়ে হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের মতো এক লাফ মেরে লুমরিটা আমার মাচার নিচ দিয়ে পড়ি কি মরি করে পালাল। চোখ তুলে দেখলাম, একটি প্রকাণ্ড চিতা ঘাস ঠেলে এগিয়ে আসছে। সমস্ত শরীরটাকে যেন চারটি পায়ের খোঁটার মধ্যে ঝুলিয়ে নিচু করে বয়ে বেড়াচ্ছে।

একবার থেমে দাঁড়াল। চারিদিকে সাবধানে চাইল। তারপর বাছুরটা পূর্বস্থানে নেই দেখে খুব অবাক হল। ভেবেছিলাম খাওয়া আরম্ভ করল দেখেশুনে গুলি করব, কিন্তু আমার সন্দেহ হল, আদৌ না খেয়েও তো পালাতে পারে। চিতাটা আমার দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটি নদীর উল্টোদিকে। নদীর দিক থেকেই এসেছে। নিথর হয়ে দাঁড়িয়েই আছে। চোখের পলকও পড়ছে না। যেন কার সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ও হয়তো জানে না, হয়তো মৃত্যুর সঙ্গেই আছে।

খুব আস্তে আস্তে বন্দুকটা কাঁধে তুলে, নিশ্বাস বন্ধ করে চিতাটার কাঁধে নিশানা নিলাম। বন্দুকের মাছিতে এবং ব্যারেলে চাঁদের আলো চকচক করছিল। ট্রিগার টানলাম। ডানদিকের ব্যারেলে একটা পৌনে তিন ইঞ্চি লেথাল বল ছিল। কী হল বুঝলাম না। চিতাটি যেদিকে মুখ করে ছিল, সেদিকে মুখ করেই একটি প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সেই চন্দ্রালোকিত পটভূমিকায় তার লম্ফমান মূর্তি মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আমার মনে হল যে, গুলিটা লেগেছে।

চারিদিকে নজর রেখে বসে থাকলাম। একঘণ্টা কেটে গেল। ওরা মোষের শিং দিয়ে একরকমের শিঙে তৈরি করে। সেই রকম একটি শিঙে নিয়ে এসেছিলাম। কথা ছিল, আমার কোনও সাহায্যের দরকার হলে আমি শিঙে বাজাব। কী করব, বুঝতে পারলাম না। বাঘ যদি গুলি খেয়ে ওঁত পেতে বসে থাকে। তাহলে শিঙে বাজিয়ে যাদের এই রাতের জঙ্গলে ডেকে আনব, তাদের বিপদ অবধারিত।

আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল। শীত একেবারে অসহ্য। আর বসে থাকা যাচ্ছে না। বন্দুক শুইয়ে রেখে কম্বলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে আছি, তবুও মনে হচ্ছে জমে যাব।

অবশেষে থাকতে না পেরে ঠিক করলাম যে, মাচা থেকে নেমে হেঁটে যাব গ্রামে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম, হে ভগবান, যেন গুলি না লেগে থাকে। চিতা যেন বাড়ি চলে গিয়ে থাকে। গুলি খেয়ে আমার জন্যে যেন ওঁত পেতে বসে না থাকে নীচে।

অবশ্য এখন ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। চতুর্দিকে পায়ে-চলা জংলি পথ সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভগবানের নাম করে নামলাম মাচা থেকে, বন্দুক হাতে। নির্বিঘ্নেই নামলাম। মাচার উপরে থাকতেই ডান ব্যারেলে একটি এল-জি পুরে নিয়েছিলাম। বাঁ ব্যারেলেও এল-জি-ই আছে। কাছাকাছি হঠাৎ আত্মরক্ষার জন্যে ছুঁড়তে হলে বন্দুকে এল-জি-ই সব থেকে ভাল।

কম্বলটাকে বাঁ কাঁধে ফেলে, ডান কাঁধে বন্দুকটাকে শুটিং পজিশনে তুলে আস্তে আস্তে এগোলাম। আঁকাবাঁকা পথে বোধহয় পনেরো কুড়ি পা-ও যাইনি, বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ল, চিতাটা একটা গাছের নীচে ওঁৎ পেতে আমার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। আমি জানি না, আমি কী করলাম—যন্ত্রচালিতের মতো দুটি ট্রিগার একই সঙ্গে টিপে দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য। চিতাটা নড়াচড়া কিচ্ছু করল না। যেমন ছিল, তেমনই রইল।

তখনই আমার সন্দেহ হল, চিতাটা লাফিয়ে এসে ওইখানে মরে পড়ে নেই তো? সন্দেহ হবার সঙ্গে সন্দেই দাঁড়িয়ে পড়লাম নিথর হয়ে। তবুও যখন চিতার কোনও ভাবান্তর হল না, তখন আমি ওইখানেই শিঙেয় ফুঁ দিয়ে কম্বল মুড়ে বসে পড়লাম। শীত-টিত কোথায় উবে গেল।

খুব আনন্দ হল। আমার প্রথম চিতা! প্রথম বাঘ। শিকারির খাতায় নাম উঠল। যশোয়ন্ত নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। কলকাতার মাখনবাবুর পক্ষে এক বছরের মধ্যে এত বড় উন্নতি সত্যিই অভাবনীয়।

পনেরো মিনিটের মধ্যে ওরা সকলে এসে হাজির। চিতাটা দেখে ওরা ভারী খুশি— 'বড়কা শোন চিতোয়া—বড়কা শোন চিতোয়া' বলে খুব খানিক চেঁচামেচি হল।

চিতাটির কাছে গিয়ে আলো ফেলে দেখলাম, প্রথম গুলিটা ঠিক যে জায়গায় নিশানা করেছিলাম, তার চেয়ে একটু পিছনে লেগেছে এবং মাটিতেও চিতার গায়ের রক্ত জমে আছে। তার মানে, পরের গুলি দুটির একটিও লাগেনি চিতার গায়ে। যে কেঁদ গাছের গায়ে চিতাটি পড়েছিল, তার গুঁড়িতে গিয়ে গুলি লেগেছে। অর্থাৎ সত্যিই যদি চিতা আহত হয়ে ওঁৎ পেতে থাকত, তাহলে এ শিকার অন্য রকম হত; সুগতবাবুর রক্তমাখা মুখটার কথা নতুন করে মনে পড়ল।

পরদিন সকালে বাংলোর হাতায় সাড়ম্বরে চিতাটির চামড়া ছাড়াচ্ছিলাম। চতুর্দিকে পৃষ্ঠপোষক ও স্তুতিকার ভিড় করে আছে। এমন সময় ঘোড়া টগবগিয়ে যশোয়ন্ত এসে হাজির হল।

সুগতবাবুর মৃত্যুর পর বহুদিন ওর কোনও খোঁজ-খবর ছিল না। আমারও একটু একা থাকতে ইচ্ছা করত। মারিয়ানার জলে ভেজা চোখ দুটো কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারিনি এ ক'দিন। সুগতবাবুর মুখটিও বারবার মনে পড়েছে। ঘুমের মধ্যেও মনে পড়েছে। কিন্তু তবুও চুপ করে শুয়ে শুয়ে ওদের কথা ভাবতে ভাল লেগেছে; জানি না সত্যি সত্যি সুগতবাবু এসে মারিয়ানার ঘুমন্ত চোখের পাতায় চুমু খেয়ে গেছেন কিনা। আজকাল এ-রকম করে কেউ কাউকে ভালবাসে দেখিনি। যে যুগে ভালবাসা বিনা আয়াসেই কেনা যায়, সে যুগে এ হেন দুঃখী ভালবাসার কথা চিন্তা করাও আশ্চর্য।

যশোয়ন্ত ভয়ংকরকে গাছে বেঁধে এসে, সব শুনে, আমার পিঠে দু' চড় মেরে বলল, সাবাস! দোস্ত গুড়—চেলা চিনি। তবে রাতে ওভাবে মাচা থেকে নামা তোমার অত্যন্ত মূর্খামি হয়েছে। ভবিষ্যতে এরকমভাবে আত্মহত্যা করতে যেয়ো না। এর চেয়ে অনেক সোজা পথ আছে আত্মহত্যার। বাতলে দেব।

যশোয়ন্ত আসতেই অপ্রয়োজনীয় লোকের ভিড় অনেক কমে গেল। ধীরে ধীরে ভিড় পাতলা হয়ে গেল।

যতক্ষণ না সব লোকজন চলে যায়, যশোয়ন্ত ততক্ষণ আমার কাছে বসে থাকল, তারপর হঠাৎ বলল, একটা জরুরি কাজে এসেছি। ভাল করে শোনো। তোমাকে বলিনি এতদিন; সুগতবাবুর মৃত্যুর পর একটা চাল চেলেছিলাম ডালটনগঞ্জে। শহরের যে সব লোকের সর্বত্রগতি, তাদের কাছে বলেছিলাম যে, আমি সুগতবাবুর স্ত্রীর কাছে কলকাতায় যাচ্ছি। সেখান থেকে দেরাদুন যাব অফিসের কাজে দেড়-দু' মাসের জন্যে। তার আগে ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। কথাটা রটিয়েছিলাম, যাতে জগদীশ পাণ্ডের কানে কথাটা যায়, তার জন্যেই। দেখছি, ফল হয়েছে! ও নিশ্চয়ই ডি. এফ. ও অফিসে খোঁজ করেছিল; কিন্তু সেখানেও ব্যাপারটা আন-অফিসিয়ালি ক্যামোফ্লেজ করা আছে। ডি. এফ. ও-র সই জাল করা চিঠি আছে! কেউ জানে না। একজন ডিলিং ক্লার্ক ছাড়া। জগদীশ ব্যাটা ধরতে পারেনি যে, ওটা আমার চাল। আমি তো ছুটিতে আছিই।

গম্ভীর মুখে যশোয়ন্ত বলল, শোন লালসাহেব, ওরা আগামিকাল রাতে আবার আসছে শিকারে। ও কেস-ফেসে কিছু হবে না। জগদীশ পাণ্ডে যেন-তেন-প্রকারেণ উপর মহলে ধর-পাকড় করে ও কেস্ চেপে দেবে। তখন আমাদের মান-ইজ্জত সব যাবেই—তদুপরি সেও আমাদের ছেড়ে দেবে না। ভোগান্তির শাস্তি চোরাই পথে ঠিকই দেবে। তাই ঠিক করলাম, এ সুযোগ ছাড়ব না। জগদীশ পাণ্ডেকে শিখলাব এই বেলা।

সুইদূপ ঘাট হয়ে ওরা এদিকে আসবে। অনেক ঘোরা পথে। খবর পেলাম যে ওরা বলেছে, স্পট লাইটে যে-জানোয়ারেরই চোখ দেখা যাবে, সেই সব জানোয়ারই মারবে। কী জানোয়ার তা বিচার করবে না, নর-মাদীন বিচার করবে না, শাস্তি দেবার জন্যে একেবারে ম্যাসাকার করবে। জানোয়ার মেরে-মেরে ওখানেই ফেলে রেখে যাবে। এবার ওরা শিকারে আসছে না, গতবারের অসম্মানের বদলা নিতে আসছে। আমাকে শিক্ষা দিতে আসছে। তা আসুক। আমার প্ল্যানও কিন্তু রেডি। শিগগির একবার তোমার জিপটা নিয়ে চলো, জায়গাটা দেখে আসি।

যশোয়ন্তের প্ল্যান কিছুই বুঝলাম না। তবে আমার মনে ডাক দিল যে, সামনেই আর একটি নিশ্চিত বিপদ বা বিপদের আশঙ্কা আছে। জিপের উইন্ডস্ক্রিনে যখন সেবারে গুলি লেগেছিল, তখন কেমন মনে হয়েছিল—এখনও তা ভুলিনি। রাগ যে আমার হয়নি তা নয়! তবে আমার মতো লোকের রাগ ইজি-চেয়ারে শুয়ে, মনে মনে শত্রু নিপাত করেই ফুরিয়ে যায়। যতখানি রাগ আমি বইতে পারি, তার চেয়ে বেশি রাগ হলে সে রাগ উপচে পড়ে যায়—ধরে রাখতে পারি না।

যশোয়ন্ত বলল, চলো লালসাহেব, আজ একটু স্কাউটিং করে আসি।

কুজরুম বস্তি পেরিয়ে সইদূপ ঘাট অবধি পৌঁছলাম আমরা লাত হয়ে। লাতের রেঞ্জার সাহেব ডালটনগঞ্জে গেছেন। পরশু ফিরবেন। বুঝলাম, জগদীশ পাণ্ডে সব রকম খবরাখবর নিয়েই আসছে। অবশ্য রেঞ্জার সাহেবে থাকলেই বা কী? শীতের রাতে জগদীশ পাণ্ডের মতো লোককে বাধা দিয়ে লাভ নেই এবং বাধা দিলে ওই জঙ্গলে যে, সে তাকে গুলি করে মেরে রেখে যেতে পর্যন্ত পারে, এই সাধারণ বুদ্ধি সমস্ত সুস্থ-মস্তিষ্ক লোকেরই আছে। সে বুদ্ধি নেই কেবল যশোয়ন্তের। ও একটা দাঁতাল একরা শুয়োর। গোঁ

একবার চাপলে হয়। তখন লড়াই সে করবেই। যত বড় বাঘই হোক না কেন, তার সঙ্গে লড়াই না করে পালাবে না।

সইদূপ ঘাটের ঠিক নীচে একটি কাঠের সাঁকো ছিল, পাহাড়ি ঝরনার উপরে—পাহাড় থেকে রাস্তাটা বাঁকে বাঁকে নেমে এসেছে—চক্রাকারে। একটি বাঁক ঘুরেই সেই সাঁকোটি। ওইখানে খুব সাবধানে গাড়ি না চালাতে সাঁকোতে ধাক্কা খাবার সম্ভাবনা, অথবা পথ থেকে নীচে গাড়ি-সমেত পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

সে সময় সইদূপ ঘাটের রাস্তা অতি খারাপ ছিল। রাত হয়ে গেলে মাল-বোঝাই ট্রাক এই ঘাট দিয়ে মোটেই যাতায়াত করে না। খালি ট্রাকও সম্ভব হলে এড়িয়ে যায় এই ঘাটকে। একদিকে পাহাড় এবং অন্যদিকে খাদ—বাঁকগুলো এত ঘন ঘন ও রাস্তা এত সরু যে, ট্রাকের পক্ষে মোড় ঘোরা নিদারুণ অসুবিধা।

সেই সাঁকোটার সামনে যশোয়ন্ত নামল। আমাকে বলল, স্টার্ট বন্ধ করো গাড়ির। সাঁকোর উপরে চওড়া সেগুনের তক্তা পাতা আছে। বড় বড় বোল্টের সঙ্গে লাগানো। বোল্ট খোলার একটি বড় রেঞ্জ নিয়ে এসেছে যশোয়ন্ত। সেই রেঞ্জ দিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা কসরৎ করেও একটি বোল্ট খুলতে পারল না। তারপর বলল, ধ্যাৎ, এতে হবে না। অন্য বুদ্ধি করেছি।

তারপর , যশোয়ন্ত পথের পাশে, গাছের ছায়ায় একটি পাথরের উপর বসে আমাকে ওর সেই অন্য বুদ্ধি বোঝাল। বিস্তারিতভাবে।

সাঁকোর পাশে গাছতলার পাথরে পা ছড়িয়ে বসে একটা চুট্টা ধরিয়ে যশোয়ন্ত আমাকে আস্তে আস্তে ওর কমপ্লিকেটেড প্ল্যান বোঝাতে লাগল। ওর চোখ দুটো চকচক করতে লাগল।

জগদীশ পাণ্ডেরা ছিপাদোহর আসার আগে যে চেকনাকা পড়ে, তা পেরিয়ে আসবে। তখন ওরা নিশ্চয়ই ফরেস্ট গেটে কিছু একটা ধাপ্পা দিয়ে আসবে। সেই সময় ফরেস্ট গার্ড যশোয়ন্তের কথা অনুযায়ী বলবে যে, আজ ডি. এফ. ও সাহাব আনেওয়ালা হায় রাত মে। শুনে জগদীশ পাণ্ডে একটু অবাক হবে।

অন্যদিন হলে জগদীশ পাণ্ডে হয়তো ঝুঁকি না নিয়ে ফিরে যেত। কিন্তু ডি. এফ. ও সাহেব আসার আগে আগেই ও অবশ্যই সেদিন কাজ সেরে পালাবে। ডি. এফ. ও. সাহেব সজ্জন লোক—ওঁকে ভয় নেই, ভয় হচ্ছে বদতমিজ যশোয়ন্তকে। সে-ই যখন নেই, তখন সুযোগ জগদীশ হাতছাড়া করবে না।

ও আমাকে বলল যে, আমাকে জিপটি নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হবে, সইদূপ ঘাটের অনেক আগে। ওদের জিপ সে জায়গা পেরিয়ে আসার পরে বেশ পরে, আমি জিপ স্টার্ট করে জোরে ওদের পেছনে পেছনে আসব, যাতে ওরা আমার জিপের হেড লাইটের আলো দেখতে পায় অথচ আমি বেশ দূরে থাকি। সইদূপ ঘাটের মতো পাহাড়ি পথে অন্য গাড়িকে পাশ দেবার জায়গা কম। হুড-খোলা জিপে বন্দুক-রাইফেল সমেত অবস্থায় ওরা আমাকে পাশ দিতে চাইবেও না। ডি. এফ. ও সাহেবের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে।

যশোয়ন্ত বলল, ডি. এফ. ও-র পোশাক পরে, ডি. এফ. ও-র জিপের নাম্বার-প্লেট লাগানো জিপ চালিয়ে তোমাকে আসতে দেখলে ওদের প্রথম কাজ হবে যত জোর সম্ভব জিপ ছুটিয়ে পালিয়ে যাওয়া। কুটকু পৌঁছে কোয়েল পেরিয়ে মোড়োয়াই হয়ে পালালে

ধরবার জো-টি নেই। সইদূপ ঘাটে ওদের জিপ যত জোরে ছুটবে, আমাকেও তত জোরে জিপ ছোটাতে হবে এবং মাঝে মাঝে হর্ন বাজাতে হবে জোরে জোরে। তাতে ওরা ঘাবড়ে যাবে—ভাববে, ডি. এফ. ও যে বটেই, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

সেই সময় ভয় আছে, ওদের কাছ থেকে গুলি খাবার। কিন্তু সে সম্ভাবনা এই ঘাটে অপেক্ষাকৃত কম, কেন না রাস্তাটা ক্রমান্বয়ে পাহাড়ে পাক খেয়েছে। অনেকখানি জায়গা সোজা, বড় জোর পঁচিশ-তিরিশ হাতের বেশি আর দেখাই যায় না। তার চেয়ে বেশি পেছনে থাকলে, আমার জিপের আওয়াজ ও হেডলাইটের আলোই কেবল ওরা শুনতে ও দেখতে পাবে। আমাকে দেখতে পাবে না। তাই ওদের জিপে বসে বসেই আমার জিপের উদ্দেশে ওরা গুলি ছুঁড়তে পারবে না। এইরকমভাবে তীব্র বেগে নামতে নামতে যখন ওরা ঘাটের শেষ সীমায় নেমে আসবে, তখন, ন্যাচারালি, ওদের জিপের গতি আরও বেড়ে যাবে। শেষ বাঁক নিয়েই সামনে দেখবে সাঁকোটি।

ইতিমধ্যে আমার জিপের অফুরন্ত হর্ন শুনে যশোয়ন্ত সাঁকোর উপর আড়াআড়ি করে একটি শালের খুঁটি ফেলে দেবে। তার গায়ে লাল শালু আগে থেকেই বাঁধা থাকবে এবং সামনের দিকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রকাণ্ড টিনের নোটিশ ঝুলবে। সাদার উপরে লালে লেখা থাকবে 'ডেঞ্জার। সাঁকোর মুখে ওদের জিপ মোড় নেবার সঙ্গে সঙ্গে পথের বাঁ-দিকে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকা যশোয়ন্ত ওর ফোর-ফিফটি-ফোর হান্ড্রেড রাইফেল দিয়ে জিপের সামনের টায়ারে গুলি করবে । এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ডান দিকে খাদের দিকে ঝোঁক নেবে এবং ওই গতিতে, ওই আকস্মিকতায় এবং ওই সময়ের মধ্যে যত বড় গাঁ-প্রি ড্রাইভারই হোক না কেন জগদীশ পাণ্ডে, পুরো জিপ সুদ্ধ গিয়ে তাকে পড়তেই হবে ডানদিকের খাদে, নদীর পাথর ভরা কোলে, এবং ভগবান আমাদের সহায় হলে ওদের একজনও বাঁচবে না।

সব শুনলাম চুপ করে। যশোয়ন্ত চুট্টাটা ছুঁড়ে ফেলল।

আমি বললাম, কিন্তু এ যে কোল্ড-ব্লাডেড মার্ডার যশোয়ন্ত। যশোয়ন্ত বলল, হ্যাঁ। জরুর।

বললাম, তোমার রাগ তো জগদীশ পাণ্ডের উপর, দলের লোকদের মারবে কেন?

যশোয়ন্ত চোখ লাল করে আমার দিকে চেয়ে বলল, জগদীশের রাগও তো আমার উপরে, তোমার উপর গুলি চালাল কেন?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

হঠাৎ মনে হতেই ওকে বললাম, টায়ারে গুলি করার পর যদি—তুমি যা ভাবছ তা না হয়? কোনওরকমে যদি গাড়ি ওরা থামিয়ে ফেলে, তাহলে কী হবে?

যশোয়ন্ত বলল, তাহলে আর কী হবে? আমাদের দু'জনের লাশ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ওরা কোয়েলের বালিতে পুঁতে দেবে। ওদের প্রায় সকলের হাতেই ম্যাগাজিন রাইফেল।আমরা দুজনে ওদের সঙ্গে পারব না কোনওমতেই।

আমি বললাম,কী দরকার যশোয়ন্ত খামোকা এরকম করে—যদি সত্যিই ওরা জিপটা থামিয়ে ফেলে?

যশোয়ন্ত হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে আর একটা চুট্টা ধরাল। বলল, আরে ইয়ার, মরেগা তো এক রোজ জরুর। মগর, মরনাহি হ্যায় তো অ্যাইসেহি তামাসা করতে করতে। কুকুরের বাচ্চাটাকে শিখলাতে না পারা পর্যন্ত খেয়ে-শুয়ে যে আমার স্বস্তি নেই।

পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা জিরিয়ে নিলাম। শীতের বেলা। দেখতে দেখতে মনে হল, এই সন্ধে হল বুঝি। এক কাপ করে চা খেয়ে আমি আর যশোয়ন্ত বেরিয়ে পড়লাম।

সইদূপ ঘাটের কাছাকাছি যখন এলাম তখন সন্ধে হবো হবো। পথে কুজরুম পেরিয়ে এসেই আমরা একটা জায়গায় পথের পাশে পাথরের আড়ালে দাঁড়ালাম আমার পোশাক খুলে ফেলে দিয়ে সরকারি পোশাক পরে ডি. এফ. ও সাজলাম। তদানীন্তন ডি. এফ. ও.সাহেব মাথায় সবসময়—কি শীত কি গ্রীষ্মে—একটি শোলার টুপি পরে থাকতেন। যশোয়ন্ত সেরকম একটি টুপিও আমাকে বের করে দিল ওর ঝোলা থেকে।

যশোয়ন্ত জিপের নাম্বার প্লেটে ওয়াটার বটলের জলের সঙ্গে মাটি গুলে কাদা করে লেপে দিল। বলল, তাড়াতাড়িতে অন্য নাম্বার প্লেট করানো গেল না।

সাঁকোটার কাছে এসে যশোয়ন্ত নেমে গেল। ওর ঝোলা থেকে দু টুকরো লাল শালু বের করে পথের পাশ থেকে একটি শুকনো শাল বল্লা তুলে এনে আড়াআড়ি করে সাঁকোর উপর বসিয়ে দিল এবং 'ডেঞ্জার' লেখা টিনের বড় চাকতিটা একটুখানি শালুতে বেঁধে সেই শাল বল্লার গায়ে ঝুলিয়ে দিল।

হঠাৎ মোড় ঘুরেই এই রকম অবস্থায় সাঁকোটা দেখলে যে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোকই গাড়ি নিয়ে এ সাঁকো পেরোবার চেষ্টা করবে না। যশোয়ন্তের বুদ্ধির তারিফ করছি। ঠিক এমনই সময় একটা ট্রাকের আওয়াজ শোনা গেল আমাদের পেছন থেকে। তাড়াতাড়ি আমরা দৌড়ে গিয়ে একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। কারণ আমাকেও এখন এ অঞ্চলের প্রায় সব ড্রাইভারই চেনে। ওই অকুস্থলে অমন অদ্ভুত পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই তাদের সন্দেহ হবে। লুকোবার আগে যশোয়ন্ত তাড়াতাড়ি করে শাল বল্লাটা সরিয়ে ফেলল এবং সাজসরঞ্জাম লুকিয়ে ফেলল।

ট্রাকটি চলে গেল।

যশোয়ন্ত আমাকে বলল, নাও আর দেরি কোরো না, এগিয়ে যাও। ঘাট থেকে মাইল দুয়েক আগে বাঁ দিকে কতকগুলো ঘন সেগুনের প্ল্যানটেশন আছে—তার সামনেটা পুটুস ঝোপে ভরা। সেইখানে জিপটা ঢুকিয়ে স্টিয়ারিং-এই বসে থেকো। রাস্তা ছেড়ে জিপটা যেখানে জঙ্গলে ঢোকাবে, সেখানে জিপ থেকে নেমে পথের ধুলোর উপর চাকার দাগটা পা দিয়ে ভাল করে মুছে দিয়ো। মনে থাকে যেন। যাও ইয়ার। গুড লাক। গুড হান্টিং।

এই বলে আমাকে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে ঝোলা থেকে রাম-এর বোতল বের করে যশোয়ন্ত ঢকঢকিয়ে খেতে লাগল।

আমি আস্তে আস্তে জিপ চালিয়ে চলে গেলাম।

অন্ধকার হয়ে গেল। বনের পাতায় পাতায় ঝিঁঝির ঝিনঝিন শুরু হল। সেগুন গাছের তলায় পিটিসের আড়ালে বসে বসে কোনও গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দই শুনতে পেলাম না এ পর্যন্ত। সাতটা বেজে গেল। খুব শীত করছে। মশাও বেশ আছে। জিপের পেছনে শুকনো পাতায় পা ফেলে ফেলে সাবধানে কী একটা জানোয়ার যেন আমায় নজর করছে। সঙ্গে আমার বন্দুক আছে। কিন্তু কোনও আলো নেই। আজ থেকে দেড় বছর আগে এই ঘাটে একটি নরখাদক বাঘ এসে আস্তানা গেড়েছিল এবং বহু মানুষ খেয়েছিল। তারপর এই ঘাটেই একজন স্থানীয় শিকারির হাতে সেই বাঘ মারা পড়ে। ইতিমধ্যে জগদীশ পাণ্ডের

মতো 'জিপারূঢ়' শিকারির গুলিতে যে, অন্য কোনও বাঘও আহত হয়ে তারপর নরখাদক রূপান্তরিত হয়নি এমন গ্যারান্টি কোথায়? বেশ অস্বস্তি হতে লাগল।

রাত প্রায় পৌনে আটটা নাগাদ দূরাগত একটি জিপের এঞ্জিনের গুনগুনানি শোনা গেল। এ জায়গাটার রাস্তাটা বেশ সোজা এবং প্রায় সমতলের উপর দিয়ে।

টপ গিয়ারে জিপটা আসছে—বেশ জোরে চালিয়ে আসছে বোঝা গেল। দেখতে দেখতে আওয়াজটা নিকটবর্তী হল—কাছে এল, এবং আমার সামনে দিয়ে আলোর বন্যা বইয়ে হুড-খোলা জিপটা চলে গেল।

জিপটা আমাকে অতিক্রম করে যাবার মিনিটখানেক পরই আমি ইঞ্জিন স্টার্ট করে মাথার টুপিটা চেপে বসিয়ে দুর্গানাম জপ করে ওদের পিছু নিলাম। আমিও টপ গিয়ারে রীতিমতো জোরে চালিয়ে চললাম।

একটু যেতে না যেতেই দূরত্ব কমে আসতে লাগল। আমার হেডলাইটের আলোয় দেখলাম পাঁচ-ছ'জন আরোহী। হেডলাইটের আলোয় তাদের বন্দুক-রাইফেল চকচক করছে। দুটি জিপের দুরত্ব কমে আসছে। এদিকে ওরা সইদূপ ঘাটে উঠতে আরম্ভ করেছে। এমন সময় সামনের জিপ থেকে তীব্র এক ঝলক স্পট লাইটের আলো এসে আমার জিপের উইন্ডস্ক্রিনে পড়ল। কিন্তু তাতে ওরা বড়জোর আমার পোশাকটা দেখতে পেল। ওই গতিমান জিপ থেকে ওই দূরের অন্য গতিমান জিপের চালককে চেনা সোজা কথা নয়।

ওরা ঘাটে উঠছে। জিপটা পাক দিয়ে দিয়ে রীতিমতো জোরের সঙ্গে পাহাড়ে চড়ছে। অত্যন্ত পাকা ড্রাইভার—সন্দেহ নেই। নইলে ওই রাস্তায় অত জোরে গাড়ি চালাতে পারত না।

ঘাটে উঠেই, যশোয়ন্তের নির্দেশমতো আমি হর্ন বাজাতে বাজাতে ওদের ধাওয়া করলাম। ওই নির্জন পাহাড়ে বনে আমার জিপের ডাবল হর্নের আওয়াজ যশোয়ন্ত যে শুনতে পাচ্ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যশোয়ন্ত এখন কী করছে? আমার কেবল সেই কথাই মনে হতে লাগল। আমার জিপের গতিও ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল। উত্তেজনাও বাড়তে লাগল। এবং জগদীশ পাণ্ডে ও আমি ঘাটে ঘাটে প্রায় সাঁকোর কাছাকাছি এসে গেছি বলে মনে হল।

কুকুর তাড়ানোর মতো করে জগদীশ পাণ্ডের দলকে তাড়াচ্ছি যে, এই কথাটা জেনেই মন আত্মতৃপ্তিতে ভরে গেল।

ঘাটের শেষ বাঁক নেবার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের গাড়ির ব্রেক কষার জোর কিচকিচ শব্দ শুনলাম এবং সঙ্গে-সঙ্গে যশোয়ন্তের হেভি রাইফেলের গুলির আওয়াজ। তারপর কী হল বোঝার আগেই একটা প্রচণ্ড ঝন-ঝন আওয়াজ হল—পাথরের গায়ে লোহা আছড়ালে যেমন আওয়াজ হয় এবং সেই সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে আর্তনাদ এবং চিৎকার। এই সময় আমার জিপও অকুস্থলে পৌঁছে গেল। হেডলাইটের আলোয় দেখলাম, পথের ডানদিকের পাথরে ধাক্কা মেরে একটা শালের চারা গাছ ভেঙে ওদের জিপ গিয়ে কুড়ি বাইশ ফিট নীচের পাহাড়ি নদীতে পড়েছে।

আমি পৌঁছানো মাত্র যশোয়ন্ত বিনা বাক্যব্যয়ে শালবল্লা থেকে লাল শালুর টুকরো দুটো ও ডেঞ্জার লেখা টিনের চাকতিটা খুলে নিল। তারপর শাল-বল্লাটা যখন সরিয়ে

পথের পাশে ফেলেছে ঠিক তক্ষুনি নদীর বুক থেকে একটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল এবং আমাদের বেশ কাছ দিয়ে আমাদের পাশ কেটে গিয়ে একটা গুলি পাহাড়ে গিয়ে লাগল।

হেডলাইটটা সঙ্গে-সঙ্গে নিবিয়ে দিলাম। জিপ এগিয়ে যশোয়ন্তের কাছে পৌঁছাতেই যশোয়ন্ত এক লাফে ওর সম্পত্তি-সমূহ সমেত ডান দিকের সিটে উঠে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-তিনটি গুলির আওয়াজ হল। একটি গুলি এসে জিপের পেছনের পরদা এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল। যশোয়ন্ত জিপের সাইড লাইটটাও হাত বাড়িয়ে নিবিয়ে দিল এবং আমাকে কানে-কানে ফিসফিসিয়ে বলল, জোরে চলো। যত জোরে পারো।

প্রাণপণ জোরে অ্যাকসিলাটরে চাপ দিলাম—জিপটা উল্কার মতো সাঁকো পেরিয়ে এল—তারপর আবার আলো জ্বালিয়ে আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম কুজরুমের দিকে। পেছনে কী হল—ওরা বাঁচল কি মরল, কজন মরল, কজনের হাত-পা ভাঙল কিছুই বুঝলাম না। তবে এটুকু বুঝলাম যে, একেবারে অক্ষত দেহে না হলেও বেশ বহাল তবিয়তেই দু-তিন জন আছে—নইলে অত তাড়াতাড়ি আমাদের উপর দমাদ্দম গুলি চলত না।

কুজরুমের আগে গিয়ে জিপ থামালাম। যেখানে জামা-কাপড় ছেড়েছিলাম। যশোয়ন্ত বলল, তাড়াতাড়ি জামা বদলে নাও। আমি চালাচ্ছি এবারে।

বাদবাকি রাস্তাটুকু যশোয়ন্ত একেবারে টিকিয়া-উড়ান করে জিপ চালাল। কুটকুর কাছে এসে কোয়েল পেরিয়ে এলাম। এই মাত্র ক'দিন আগেই সুগতবাবুকে নিয়ে রাতে আমরা এই পথেই ফিরেছি।

তারপর হুটার হয়ে, মোড়োয়াই হয়ে রুমান্ডির রাস্তায় বেঁকে গেলাম আমরা।

পথে অন্য কাগজ কোম্পানির একটি ট্রাকের সঙ্গে দেখা হল। জিপ দেখে, পাশ করে দাঁড়াল—আমরা বেরিয়ে গেলাম। ড্রাইভার আমাদের জিপের কাদা-মাখা নম্বর পড়তে পারল না।

রুমান্ডি পৌঁছেই যশোয়ন্ত হুইস্কির বোতল খুলে বসল।

আমার কেমন যেন নিজেকে খুনি খুনি মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে খুব ভয়ও করছিল। এই বুঝি পুলিশের লোক এল অ্যারেস্ট করতে—অথবা ওরাই বুঝি দল বেঁধে রাইফেল বন্দুক বাগিয়ে এসে হাজির হল এক্ষুনি।

যশোয়ন্ত কিন্তু নির্বিকার। ও বলল, মোড়োয়াই-এর আগে যে ট্রাকটির সঙ্গে দেখা হল, সেই ট্রাকটি যদি থামে অথবা উল্টো দিক দিয়ে যদি অন্য কোনও ট্রাক আসে, তবেই ওদের উদ্ধার করবে। নইলে শালারা সারা রাত ওখানেই পড়ে থাকবে।

যশোয়ন্ত এক-এক চুমুকে এক-এক পেগ শেষ করতে লাগল। অন্ধকারে ওর চোখ দুটো চিতাবাঘের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল। মাঝে মাঝে বাঁ-হাতের তেলো দিয়ে গোঁফটা মুছে নিতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর যশোয়ন্ত ভয়ংকরের পিঠে চেপে নইহারের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।



পঁচিশ

শীতটা কমে এসেছে, তবে এখনও কামড়ে আছে। কলকাতার ডিসেম্বরের চেয়েও বেশি শীত।

সেদিন রবিবার। সকালে বারান্দাতে বসেছিলাম কাগজ নিয়ে। মাঝে-মাঝে খবরের কাগজ আনিয়ে পড়ি ডালটনগঞ্জ থেকে। রোজকার কাগজ প্রায়ই পড়া হয় না। কাগজ পড়া ভুলেই গেছি। রবিবারের কাগজ আনাই মালদেও বাবুদের ট্রাক ড্রাইভার মারফত। একদিনের কাগজেই গত সাত দিনের খবর আস্বাদন করি।

যশোয়ন্ত বলত, পৃথিবীর কোন কোণায় যুদ্ধ হচ্ছে, কোথায় লোক না খেতে পেয়ে মরছে, কোথায় লোক বেশি খেতে পেয়ে মরছে, এত সব খবরে তোমার কী দরকার ইয়ার? খাও-দাও, কাম পেতে মৌটুসি পাখির শিস শোনো, নয়তো চলো বন্দুক কাঁধে করে বনে-পাহাড়ে এক চক্কর ঘুরে আসি। দেখবে দিল খুশ হয়ে যাবে। আমরা না করছি রাজনীতি, না বসছি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউতে। কী হবে এই ছোট মাথায় অত সব অবান্তর প্রসঙ্গ চাপিয়ে?

প্রথম প্রথম ওর সঙ্গে তর্ক করেছি—তারপর নিজের অজান্তে কখন দেখেছি—কাগজের জন্যে আর তেমন অভাবই বোধ করিনি, যেমন কলকাতায় করতাম। ভোরবেলায় চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ না পড়লে মনে হত কী একটা কর্তব্যকর্মই করা হল না। সব কাগজওয়ালাই তো ব্যবসাদার । টাকা রোজগার করাই তাঁদের মোক্ষ। রাজ্যের বাজে খবরে পাতার কিছুটা ভর্তি করে, বাকিটা বিজ্ঞাপনে ভরিয়ে দিয়েই তো তাঁরা দেশ ও দশের সেবা করেন। নীতি, বিবেক অথবা সততা এখন আর ক'টি খবরের কাগজের আছে? এমনকী, চক্ষুলজ্জাও তো নেই। একটি বাজে অভ্যাসের হাত থেকে মুক্ত হয়েছি, বাঁচা গেছে! তা ছাড়া, এখানে খবরের কি অভাব নাকি? কার গরু মরছে সাপের কামড়ে, কোন কূপে কপিসিং ফেলিং শুরু হয়েছে, কোথায় বাঘের অত্যাচারে বাঁশ কাটার কাজ পুরোপুরি বন্ধ আছে; কোথায় কোন বুড়ো ওঁরাও হাঁড়িয়া খেয়ে কার মাথায় টাঙ্গি বসিয়েছে, কোথায় কোন মেয়েকে ভেজ্জানাচের পর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এমনই কত শত খবর। কেবল কাগজই ছাপা হয় না—কিন্তু খবরের অভাব কোথায়?

গেটে একটি ট্রাক থামল। ড্রাইভার নেমে এসে আমার হাতে একটি চিঠি দিয়ে গেল। শিরিণবুরু থেকে মারিয়ানা লিখেছে ছোট্ট চিঠি।

লাল সাহেব,

আগামিকাল কি কোনও জরুরি কাজ আছে? একবার আসেন যদি, তো খুব ভাল হয়। বড় একা একা লাগে। রাতে থেকে পরদিন বিকেলেই আবার রওনা হয়ে চলে যাবেন। কোনও খবর পাঠানোর দরকার নেই। চলে আসবেন। আসতে পারলে খুব খুশি হব।—আপনার মারিয়ানা।

কিছুই ভাল লাগছিল না। চুপচাপ বসে ভাবছিলাম যে, এক মুহূর্তবাহী হঠকারিতার পরিণাম হিসাবে হয়তো রুমান্ডি ছেড়ে চলেও যেতে হবে। কেন জানি না, আস্তে আস্তে অবচেতন মনে কেমন একটা ভয় জন্মেছে যে, ওরা আমাকে ছাড়িয়ে দেবেই। রাখবে না। বিশেষ করে আমার ইমিডিয়েট বস ঘোষদা যখন আমাকে তাড়াতে চান। অন্তত যশোয়ন্ত তো এ ব্যাপারে ঘোষদার উপর একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। জানি না, হয়তো এর পেছনে আরও বড় কোনও হাত আছে, যে হাত কলকাতার হুইটলি সাহেব পর্যন্ত প্রসারিত হয়। আর একসটেনশান পাব বলে ভরসা নেই।

কলকাতাতেই যদি এই চাকরি করতাম, তবে হয়তো বিষাদ আসত না। সেখানে বেশির ভাগ বেসরকারি অফিসের চাকরি তো ছাড়ার জন্যেই। কিন্তু তবু সেখানে আমার আজন্ম পরিবেশ, আমার আশৈশব অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি হত।

কিন্তু এই রুমান্ডিতে যে নির্জনতা, যে প্রাকৃতিক ঔদার্য, যে সবুজ শালীনতায় আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যে উৎসারিত আনন্দের আমি অংশীদার হয়েছি, তা থেকে রাতারাতি আমাকে কেউ কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ফেললে আমার কষ্ট হবে। আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবে ডিজেলের ধোঁয়ায়। মেকি ভদ্রতায় দম বন্ধ হয়ে যাবে।



ছাব্বিশ

মোড়োয়াই থেকে বেরুতে প্রায় চারটে বেজে গেল। শেষ শীতের বিকেল—চারটে অনেক বেলা।

সোনালি রোদের বালাপোশ মুড়ে বন-পাহাড় শেষবারের মতো গা তাতিয়ে নিচ্ছে। খেতে খেতে কিতারী, বাজরা, ধান, গেঁহু সবকিছুই প্রায় কেটে নেওয়া হয়েছে। ফুড়ুত ফুড়ুত করে চড়ুইগুলো তবু শূন্য ক্ষেতে দল বেঁধে সারা দুপুর চঞ্চল ভাবনার মতো মুঠো মুঠো উড়ো বেড়ায়। বুলবুলি পাখিরা কেলাউন্দার ঝোপের ডালে বসে শিস দেয়—ছোট ছোট মৌটুসি পাখি সুন্দরী মেয়ের চোখের তারার মতো স্পন্দিত হয় ফুলে ফুলে। টুনটুনি পাখির বড় দেমাক। গান গায় কি গায় না।

জিপ বেশ জোরে চালিয়ে চলেছি। শিরিণবুরুতে এখন মারিয়ানার বাংলো অবধি জিপ যায়। আমরা প্রথম গিয়েছিলাম বর্ষাকালে—তখন পথ অতি দুর্গম ছিল এবং পথের একটি নদী পেরুনো যেত না। পুজোর পর থেকেই সে নদীর উপর দিয়ে জিপ চালিয়ে চলে যাওয়া যায় সহজেই।

রাত সাড়ে সাতটা বাজে। মারিয়ানার বাংলোর দোতালায় আলো জ্বলছিল। একতলার সব বাতি নিবানো। গেটের কাছে জিপটি থামাতেই কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে উঠল। মারিয়ানা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চৌকিদার গেট খুলল।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মারিয়ানা নেমে এল। একতলার বারান্দার বাতি জ্বালল। একটি ফলসা-পেড়ে সাদা শাড়িতে মারিয়ানাকে রোগা, করুণ ও খুব সুন্দরী বলে মনে হল।

ও বলল, সত্যিই এলেন! ভেবেছিলাম, আসবেন না।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে শুধোলাম, এ রকম ভাবনার কারণ?

কোনও কারণ নেই। এমনই ভেবেছিলেম। এক্ষুনি খাবেন? না এখন কফি-টফি কিছু খেয়ে রাতের খাবার পরে খাবেন? রোজ কখন খান রাতে?

রোজ তো ন'টার সময় খেয়ে দেয়ে শয়নে পদ্মনাভ। আজকে এখন কফি খেয়ে পরেও খাওয়া চলতে পারে।

মারিয়ানা, যে ঘরে ঘোষদা-বউদি প্রথমবার থেকেছিলেন, সে ঘরে আমার থাকার বন্দোবস্ত করেছে। ওর ঘরের পাশেই।

বলল, জামা-কাপড় বদলে হাত মুখ ধুয়ে আসুন। ধুলোয় তো গা-মাথা ভরে গেছে। আমি খাবার ঘরে যাচ্ছি।

মারিয়ানা নিজের হাতে ওমলেট ও কফি বানিয়ে দিল খাবার ঘরে স্টোভ ধরিয়ে। আমরা দোতলার খাবার ঘরেই বসে বসে গল্প করতে লাগলাম। বাইরে এখনও বেশ ঠাণ্ডা।

শুধোলাম, হঠাৎ তলব করলেন যে? খুব একা একা লাগে, না?

এক। একা তো বেশ অনেকদিন থেকেই আছি। একা থাকতে তো অভ্যস্তই হয়ে গেছি। কিন্তু এবারে কলকাতা থেকে ফিরে এসে একেবারে অসহ্য লাগছে, একেবারে অসহ্য। সুগতকে পুড়িয়ে এলাম।

আমি একটু আশ্চর্যরকম কঠিন হয়েই বললাম, ভদ্রলোক যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন আপনি কিন্তু রানীর মতো মাথা উঁচু করে বেড়াতেন। আজ উনি যখন নেই, আপনাকে কাঙালিনীর মতো মনে হচ্ছে কেন?

আমার কথাতে মারিয়ানা খুব অবাক ও বিব্রত হয়ে আমার চোখে তাকাল। কিন্তু উত্তরে কিছু বলবার আগেই আমি কোটের পকেট থেকে সুগতবাবুর রক্তমাখা চিঠিখানা বের করে ওর হাতে দিলাম।

বললাম, নিন। এই সুগতবাবুর শেষ চিঠি। আপনাকে লেখা।

মারিয়ানা ভীষণ আশ্চর্য ও কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে আমার দিকে তাকাল—তারপর কম্পমান হাতে চিঠিটা খুলল। কালো কালো দাগ দেখে শুধোল, এগুলো কীসের দাগ?

আমি নিষ্ঠুর গলায় বললাম, সুগতবাবুর রক্তের।

কেন এবং কী করে এমন নিষ্ঠুর হলাম, আমি আজও জানি না।

ঝরঝরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মারিয়ানা চিঠিটা পড়তে লাগল। মারিয়ানা যখন সুগতবাবুর মাথা কোলে নিয়ে জিপে বসেছিল কুট্‌কু থেকে ডালটনগঞ্জ যাবার সময় তখনও এমনভাবে কাঁদেনি।

তারপর ও চিঠিটা পড়া শেষ করে, ভাঁজ করে নিজের সামনে রাখল।

জলভরা চোখে আমাকে শুধোল, আপনি তাহলে সব জানেন?

আমি বললাম, সব জানি কিনা জানি না। তবে এর আগে আমাকে পাঠানো বইয়ের মধ্যে অসাবধানে রাখা যে চিঠি দু'টি ছিল, সে দু'টি পড়েছিলাম এবং এইটি দেখলাম। তাতে যতটুকু জানা যায় জেনেছি। আমার ধারণা, এর চেয়ে বেশি কিছু জানার নেই। সেই চিঠি দুটো পড়ে খুব অন্যায় করেছিলাম সত্যিই, কিন্তু পড়েছিলাম বলেই আজকে আপনার দুঃখের গভীরতা বোঝার জন্য অন্তত একজন লোকও এখানে পেলেন। সেইটে নিশ্চয়ই কম কথা নয়। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। এ কথা অন্য কেউই জানবে না।

মারিয়ানার চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। ইউক্যালিপটাস গাছের মতো সোজা হয়ে বসে বলল, আমি কাউকে কেয়ার করি না।

তখন ওদের দেখে আমার হাসি পেল; আমি বললাম, তাই বুঝি! এত সাহস সুগতবাবু বেঁচে থাকতে কোথায় ছিল? তখন এ সাহসের ছিটে-ফোঁটা থাকলে উনি হয়তো মরতেন না!

মারিয়ানা কথা বলল না। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। সুগতবাবুর চিঠিটা আর একবার খুলল, আবার বন্ধ করে রাখল।

মারিয়ানা তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, আপনারা বোঝেন না, বোঝবার চেষ্টাও করেন না।

কোন উত্তর দিলাম না। ঘড়িটার টিক-টিক-টিক শুনতে লাগলাম।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম মারিয়ানা জানে না যে, নিজের সঙ্গে, নিজের ঠুনকো বিবেকের সঙ্গে, নিজের আজন্ম সংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ও একসময় হেরে গেছে। কিন্তু সেই পরাজয়টা বড় দেরিতে এল।

শুলাম যখন, তখন প্রায় বারোটা। বাইরে নিশুতি রাত। গ্রামের কুকুরগুলো সমস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে—শম্বর-টম্বর দেখে থাকবে। অনেকখানি জিপ চালিয়ে এসেছি, তা ছাড়া এত রাত করা অভ্যেস নেই। গাঢ় ঘুমে এলিয়ে পড়লাম।

রাত কত জানি না, হঠাৎই দরজায় ধাক্কা শুনে ঘুম ভেঙে গেল। মারিয়ানার গলা। দরজায় বেশ জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে আর আমার নাম ধরে ডাকছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুললাম। দেখলাম, মারিয়ানা দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা ফ্যাকাশে।

আমি শুধোলাম, কী হল?

মারিয়ানা চারদিকে তাকিয়ে বলল, সুগত এসেছিল।

আমি ধমকের সুরে বললাম, চলুন তো ঘরে চলুন! বলে ওকে প্রায় জোর করে খোলা বারান্দা থেকে ওর ঘরে নিয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুকে ওকে দৃঢ় গলায় বললাম, বসুন। খাটে বসুন। বলুন আমাকে,কী হয়েছিল!

মারিয়ানা কথা বলতে পারছিল না।

আমি ঘরের ইজি-চেয়ারে বসলাম।

একটু সামলে নিয়ে মারিয়ানা বলল, এই ঘরে সুগত এসেছিল একটু আগে।

আমি বললাম, আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কি যা তা বলছেন! লেখাপড়া শেখা মেয়ে, অমন বোকার মতো কথা বললে আমার রাগ হয়ে যাবে কিন্তু।

মারিয়ানা বলল, না না প্লিজ শুনুন, আমার কথা শুনুন। সুগতকে একটু আগে দেখলাম।

আমি বললাম, সত্যি। আপনি না...

মারিয়ানার মুখটা আতঙ্কে কুঁচকে উঠল। বলল, ভাবতে পারি না। সুগত পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে এসেছিল। শাল জড়িয়ে। নিখুঁতভাবে দাড়ি কামিয়েছিল দেখলাম।

ঘুমাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার কেমন গা-ছমছম করতে লাগল। মনে হল, চোখ খুললেই ভয় পাব। আপনি যে ইজি-চেয়ারে বসে আছেন, মনে হল, কে যেন সেখানে বসে আছে। চোখ মেলতেই দেখি সুগত। উঠে বসলাম। ঘরের নীল আলোটা জ্বলছিল। ওই আলোয় ওকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

আমি চোখ মেলতেই হেসে বলল, খুব অবাক হলে তো? তোমাকে দেখতে এলাম।

আমি ভুলে গেলাম যে ও মরে গেছে। ওকে আমরা পুড়িয়ে এসেছি।

আমি কথা বললাম, আমি ওর নাম ধরে বললাম, সুগত , আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি; ভালবাসি।

সুগত একটু হাসল। বলল, এ কথাটা তখন বললে না? এ কথাটা শোনার জন্যে কতদিন অপেক্ষা করে থাকলাম। তখন বললে না?

আমি বলতে গেলাম—আমি বুঝতে পারিনি যে, তুমি এমন ছেলেমানুষ। আমার যা আছে সব দিতে পারি তোমাকে, তুমি যেমন করে চাও।

সুগত বলল, সত্যি, সত্যি।

সুগত আমার কাছে এগিয়ে এল। মনে হল আমাকে আদর করবে বলে। আমি যেন কেমন হসে গেলাম। তখনও ভয় পাইনি। তখনও একটুও ভয় পাইনি—খুব ভাল লাগছিল, সুগতকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ভাবছিলাম, এতদিনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। এমন সময় যেই সুগত কাছে এল, দেখি—সেই রক্তমাখা মুখটা! সেই গলার কাছে ফুটো দিয়ে নিশ্বাসের সঙ্গে ফেনা বেরোচ্ছে। আমি...আমি আঁতকে উঠলাম, ওকে দেখে ঘেন্না হল; কেঁদে ফেললাম। মনে হল, সুগত বীভৎসভাবে হেসে উঠল। তারপর কী হল জানি না, দেখলাম সুগত নেই। আমি একা ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে আছি। যেই দেখলাম সুগত নেই, অমনি ভয় পেলাম—ভীষণ ভয় পেলাম, ভাবলাম, মরেই যাব ভয়ে। তারপর কোনওরকমে আপনার দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম। তারপর...জানি না। এই যে এখন আপনার সামনে বসে আছি।

আমি বললাম, আপনি একটু বসুন, আমার ঘরে ব্র্যান্ডি আছে ব্যাগে, যশোয়ন্ত রাখতে দিয়েছিল সঙ্গে। নিয়ে আসি। গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে একটু খান, সুস্থ বোধ করবেন।

উঠতে যেতেই মারিয়ানা বলল, না আমি একা ঘরে থাকব না।

আমার সঙ্গে সঙ্গে ও আমার ঘরে এল। বাইরে বড় শীত। ব্র্যান্ডিটা বের করলাম। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর আমার পিছু পিছু—যেন এটা আমারই বাড়ি, ও-ই আমার অতিথি—এমনভাবে সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঘরে এল। এসে একটা চেয়ার টেনে বসে চুপ করে আমাকে দেখতে লাগল।

খুঁজে খুঁজে স্টোভ বের করে, স্টোভ ধরিয়ে একটু জল গরম করলাম। গ্লাসে করে জল এবং ব্র্যান্ডি মিশিয়ে মারিয়ানার কাছে এসে গ্লাসটি ধরে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ আমাকে রাতজাগা জল-ভেজা চোখ নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে অপ্রকৃতিস্থভাবে দেখছিল—আমি কাছে যেতেই আমার হাত থেকে গেলাসটি টেবিলে নামিয়ে রেখে আমার হাতটি ও দু-হাতে জড়িয়ে ধরল।

ঘটনার আকস্মিকতায় এত অভিভূত হয়ে গেলাম যে, বলতে পারি না।

আমার হাত দিয়ে সযত্নে ওকে সরিয়ে চেয়ারে বসালাম।

বললাম, পাগলি মেয়ে। নিন ব্র্যান্ডিটা খেয়ে নিন।

মারিয়ানা ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে আস্তে আস্তে ব্র্যান্ডিটা খেল। তারপর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ধরা গলায় বলল, একজনের কাছে অকৃতজ্ঞতার গ্লানি জীবনময় বয়ে বেড়াব। এ ভুল যাতে আর না করি, তারই পাঠ নিলাম। চুমু খেলেই, বা আবেগ প্রকাশ করলেই বা নিজেকে এক্সপ্রেস করলেই মানুষ যে ছোট হয়ে যায় না, সেটা আমি যে আজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, তাই আপনাকে দেখালাম।

আমি বললাম, ওসব পরে হবে, এখন চলুন। লক্ষ্মী মেয়ের মতো এবারে শুয়ে পড়বেন।

তবু ও কিছুতেই একা শুতে রাজি হল না। অগত্যা আমার ঘরের খাট থেকে বিছানা এনে ওর ঘরে পাতলাম। ও কিছুতেই আমাকে মাটিতে শুতে দিল না। ও মাটিতে শুল। আমি ওর খাটে শুলাম। ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে ওর গায়ে কম্বল টেনে দিলাম। আশ্চর্য! শোকে মানুষ কীরকম শিশু হয়ে যায়। ভাবা যায় না!

সারা রাত মারিয়ানার মিষ্টি শরীরের গন্ধভরা বিছানায় শুয়ে আমার ভাল করে ঘুম হল না। ঘরের আধো অন্ধকারে মারিয়ানাকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। নিজের জন্যেও

বোধহয়। খুব ইচ্ছে করছিল, খাট থেকে নেমে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শুই। ওর দুঃখকে আমার বুকে শুষে নিই।

পরদিন সকালে মারিয়ানা একেবারে স্বাভাবিক।

সলজ্জ হাসি হেসে বলল, আপনাকে বেড়াতে আসতে বলে কাল খুব জ্বালাতন করেছি, না?

আমি বললাম, ভীষণ। কিন্তু এরকম একা একা তো আপনার থাকা চলবে না। হয় আপনি কলকাতায় যান, নয়তো আপনি এখানে কোনও আত্মীয়-টাত্মিয়কে আনান। নইলে একটা বিয়ে করুন। এরকম একা একা জঙ্গলে মানুষ দিনের পর দিন থাকতে পারে?

মারিয়ানা দুঃখিত গলায় আমাকে বলল, এতদিনে আমাকে আপনি এই বুঝলেন? এখন আমি বিয়ে করলে সুগতর কাছে কী জবাবদিহি করব? তা ছাড়া, মহুয়ার কাছেও যে বড় ছোট হয়ে যাব।

আমি বললাম, অন্য লোকে কী বলবে না বলবে, ভেবেই তো এই অবস্থা আজকে—আবারও সেই ভুল করবেন না। সুগতবাবুর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তা বলে এখন থেকে অমন ধনুকভাঙা পণ করে বসবেন না।

মারিয়ানা মাথা নেড়ে বলল, না না, এসব বলবেন না লালসাহেব, আপনি আমাকে যেমন করে জানেন, এক সুগত ছাড়া আর কেউ বোধ হয়, আমাকে এত কাছ থেকে জানেনি। জানে না। আপনি অমন কথা বলবেন না। একজনকে বড় মর্মান্তিকভাবে ঠকিয়েছি। আমার আর এসব ভাল লাগে না। এখন আমি মুক্ত। সুগত সংস্কারমুক্তির কথা বলত। তা যে এমনভাবে ঘটবে কখনও ভাবিনি। আমাদের সমাজে বিয়েটা সত্যিই একটা বাঁধন, মুক্তি নয়। যে যাই বলুক।

গেট অবধি পৌঁছে দিতে এল মারিয়ানা। বলল, আপনার চাকরি যদি সত্যি যায়ই, তবে এখানে এসে আমার কাছেই থাকবেন।

আমি হেসে বললাম—আজীবন?

মারিয়ানা সিরিয়াসলি বলল, আজীবন। খুশি হয়ে থাকতে দেব।

আর খেতে পরতে?

হ্যাঁ, তাও দেব।

আর কিছু তো দেবেন না!

ও হেসে ফেলল। বলল, না।

জিপটা স্টার্ট করলাম। মারিয়ানা কপাল থেকে চুল সরাতে সরাতে বলল, সত্যি, আপনার জন্যে কী প্রার্থনা করা যায় বলুন তো?

আমি বললাম, পরের জন্মে যেন আপনার সুগত হয়ে জন্মাই।

মারিয়ানার চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই লাজুক চোখ নামিয়ে ও বলল, ভারী খারাপ আপনি।



সাতাশ

এই বন পাহাড়ের সব কিছুই কেমন অদ্ভুত। লোকগুলোও যেন থাকতে থাকতে অদ্ভুত হয়ে যায়। এই যে এত বড় কাণ্ডটা ঘটে গেল, জগদীশ পাণ্ডের দলবলকে যে নদীতে ফেলে দিল যশোয়ন্ত, তার জন্যে ওরা পুলিশে ডাইরি পর্যন্ত করল না। শুনেছি, জগদীশ পাণ্ডের একটা পা ভেঙে গেছে। ওর বন্ধুর পাঁজরে চোট লেগেছে। অন্যজনের কলার বোন ভেঙে গেছে। অথচ তবু যেন কিছুই হয়নি; এমনি ভাব করে, নেহাতই জিপগাড়ি ব্রেক ফেল করে নদীতে পড়ে গেছে, এই বলে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিল।

ওরা পুলিশে ডাইরি না করায় যশোয়ন্ত বেশ চিন্তিত আছে। সত্যি কথা বলতে কী, ওকে আগে কখনও এত চিন্তিত দেখিনি। আজকাল যখনি বাড়ি থেকে বাইরে বেরোয়, ও পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। কোমরে গোঁজা থাকে, ওর হাফহাতা খাকি বুশ শার্টের নীচে। আমিও যখনই বাড়ি থেকে বাইরে বেরোই, তখনই বন্দুকটা নিয়ে বেরোই। অবশ্য বন্দুক দিয়ে শিকার করা চলে, ডাকাতি করা চলে, মানে আক্রমণাত্মক অস্ত্র হিসেবে বন্দুক ভাল, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে বন্দুক অচল। বনের রাস্তার মোড়ে অথবা জঙ্গলের শুঁড়ি পথে কোথায় যে জগদীশের দলবল লুকিয়ে থাকবে, তা পূর্বমুহূর্তেও জানা যাবে না। সময়ও পাওয়া যাবে না। পিস্তলে এই সুবিধা। এই সব সময়ে মুহূর্তের মধ্যে পিস্তল থেকে কাছাকাছি গুলি ছোঁড়া যায়।

জানি না কেন, যশোয়ন্ত প্রায়ই বলছে আজকাল যে, জগদীশ পাণ্ডের কাছ থেকে আমার বোধ হয় কোনও ভয় নেই। প্রথম কারণ এই যে, যশোয়ন্ত নিশ্চিতভাবে জেনেছে যে, আমার চাকরি শিগগিরই যাচ্ছে। দ্বিতীয় কারণ, ঝগড়াটা এখন নাকি যশোয়ন্ত আর জগদীশ পাণ্ডে এই দুজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। এ ব্যাপারে বোধহয় দু'পক্ষেরই মতামত এই যে, অন্য কাউকে এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল। কবে কখন এই দুই শত্রু এমন বোঝাপড়ায় এল, তা অবশ্য জানি না।

তাই যদি হয়ে থাকে, তবে এর পরিণাম খারাপ। খুবই খারাপ। জগদীশ পাণ্ডের যতটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে সে করতে পারে না এমন কাজ সত্যিই নেই। যশোয়ন্তের বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। অতএব এরা দুজনে যদি এ ব্যাপারে একা একা ফয়সালা করতে চায়, তবে যে কী ঘটনা ঘটবে ঠিক ভাবা যায় না।

জগদীশ পাণ্ডের সঙ্গে ওর ঝগড়া যে শুধু শিকার নিয়েই নয়, তার একটু আভাস পেয়েছিলাম গতকাল।

আমি আর যশোয়ন্ত নইহার থেকে জিপে ফিরছিলাম। হঠাৎ লালতির সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। এক ঝুড়ি মহুয়া মাথায় নিয়ে লালতি শাল-বনের পথে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। যশোয়ন্ত জিপটা প্রায় ওর গায়ের কাছে ভিড়িয়ে ওকে জাপটে ধরে কোলে তুলে চুমু খেয়েছিল—ঝুড়িভর্তি লালতির সব মহুয়া রাস্তায় পড়ে গেছিল। লালতি কপট ক্রোধে হাত-পা ছুঁড়েছিল। তারপর তাকে জিপের বনেটের উপর বসিয়ে দিয়ে যশোয়ন্ত আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল—বলেছিল, ঈ হ্যায় মেরে দিল, জান দোস্ত—লালসাব। ঔর ঈ—লালতি। মেরে মুন্নী।

যশোয়ন্ত লালতির দিকে চেয়ে বলল, এক রাত কি লিয়ে দুলহন বনেগী লালসাব কি?

নহী, নহী। বলেই লালতি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

যশোয়ন্ত চুট্টায় আগুন দিয়ে বলেছিল, কিঁউ। মেরা দোস্ত খুবসুরৎ নহী?

নহী, নহী, উস লিয়ে নহী।

তো? কিস লিয়ে?

উত্তরে লালতি চুপ করে রইল।

অমনি যশোয়ন্ত আবার ওকে জড়িয়ে ধরে ওর সারা গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

লালতি কিত কিত করে হাসতে হাসতে বলল, ছোড়ো ছোড়ো, গুদগুদি লাগ রহা হ্যায়!

যশোয়ন্ত ওকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তুম জানতে হো, মেরা দোস্ত আভিতক কিসীসে মুহব্বত নেহি কিয়া?

লালতি আবার হাসল। বলল, ধেৎ। ঝুট বাত হ্যায়।

সেই প্রথম আমি লালতির দিকে ভাল করে তাকালাম। কুড়ি-একুশ বছর বয়স হবে। গায়ের রঙ তামাটে। খুব টানা-টানা চোখ। ঠোঁট দুটো দারুণ। কটা কটা একমাথা চুল। অত্যন্ত নোংরা। গায়ে গন্ধ। কিন্তু দারুণ ফিগার। সত্যিই দারুণ।

ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম।

লালতির পক্ষে বিশ্বাস করাই সম্ভব নয় যে, আমার বয়সের আমার মতো একজন যুবক এখনও কাউকে বুকে নিয়ে ঘুমোয়নি। হাসি পেল। মাঝে মাঝে আমার নিজেরই বিশ্বাস করতে অনিচ্ছে হয়।

তারপর আমি আর যশোয়ন্ত দুজনে লালতির ঝুড়ি থেকে পড়ে যাওয়া মহুয়াগুলি সব আবার কুড়িয়ে দিলাম। লালতি হাসতে হাসতে যশোয়ন্তকে চোখ ঠেরে, ঝুড়ি মাথায় চলে গেল।

জিপের স্টিয়ারিং-এ বসা যশোয়ন্তকে শুধোলাম, ওর মধ্যে তুমি কী এমন দেখছ যশোয়ন্ত?

যশোয়ন্ত হাসল। বলল, ইস লিয়েই তো ম্যায় শহরবাঁলোসে ডরতা। তারপর বলল, ওর মধ্যে গভীরে দেখার তো কিছু নেই। ওর মধ্যে শুধু একটি নিমকিন লাজোয়াব শরীর দেখেছি। শরীর ছাড়িয়ে ওর মধ্যে তো আমি আর কিছু দেখতে যাইনি লালসাহেব। তোমরা পড়ে-লিখে আদমিরা সবসময় দিগন্তের ওপারে কী আছে তার খোঁজ করো। সবসময় তোমরা সামান্যকে ছাড়িয়ে অসামান্য কিছু খুঁজতে যাও। তাই বোধহয় কিছুই পাও না। আমি আমার সামান্য দিগন্তরেখার মধ্যে বন্দি আছি; বন্দি থাকতে চাই। এই বেতলা, বাগেচম্পা, ছিপাদোহর, রুদ, চাহাল-চুংরুর জঙ্গলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাই। লালতির নাংগা শরীরে বুঁদ হয়ে থাকতে চাই। এই আমার দিগন্ত। মধুর দিগন্ত। এর

বাইরে কী আছে আমি কখনো দেখতে যাইনি লালসাহেব। যদি কিছু থেকে থাকেও, তা জানার লোভ বা আগ্রহও আমার নেই। আমি নিজেকে নিয়ে খুব সুখে আছি। তোমরা দূরের শহরের লোকরা, বাইরের পৃথিবীর লোকরা এলোমেলো কথা বলে আমার এই সুখ নষ্ট করে দিয়ো না।

জিপটা একটা কজওয়ে পেরুল গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে। আওয়াজ কমলে আমি শুধোলাম, তুমি কি বলতে চাও, লালতিকে তুমি ভালবাসো?

যশোয়ন্ত আবারও হাসল। মাঝে মাঝে গোঁফের ফাঁকে ও কেমন দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসে। বলল, নিশ্চয়ই ভালবাসি। শরীরের ভালবাসা।

আর মনের ভালবাসা?

যশোয়ন্ত হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, মনের ভালবাসা তো সবাইকে বাসা যায় না লালসাহেব। সে একজনকেই বাসি। তবে কী জানো, সে ভালবাসার তো গাঁ বদল হয় না; সে ভালবাসা এক গাঁয়েই থাকে। জীবনে একজনকেই তেমন করে ভালবাসা যায়। জীবনের অন্য ভালবাসাগুলো সব সেই একই ভালবাসার ভেঙে যাওয়া আয়নার টুকরো-টাকরা। টুকরোগুলো এক জীবনে দু'হাতে কুড়িয়ে জড়ো করেও আর সে ভাঙা আয়না জোড়া লাগে না। যে আয়না ভাঙে; তা ভাঙেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। আমার জংলি দোস্ত যশোয়ন্ত মাঝে মাঝে এমন এমন কথা বলে ফেলে যে, উত্তরে কথা না বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু চুপ করে ভাবতে ইচ্ছে করে।

একটু পরে যশোয়ন্ত নিজেই বলল, আর সবচেয়ে মজার কথা কী জানো দোস্ত, এই মনের ভালবাসা আর শরীরের ভালবাসা কখনও একজনের কাছ থেকে তুমি পাবে না। যদি তা কখনও ঘটে, সে এক দুর্ঘটনা বটে। তা না হওয়াই ভাল। আমাকে একশো একটা গুলি করলেও আমি বিশ্বাস করি না যে, কেউ একই সঙ্গে শরীর আর মনের ভালবাসার চাহিদা মেটাতে পারে।

আমি বললাম, তা হলে আর ভালবাসা ভালবাসা বলছ কেন? বলো, শরীরের চাহিদা।

যশোয়ন্ত খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল—বলল, বিলকুল নহী। চাহিদা বড় নোংরা শব্দ। জিনিসটা নোংরা। তোমাকে কী করে বোঝাব যে, শরীরেরও ভালবাসা আছে—শরীরও বুলবুলি পাখির মতো কথা বলে। তারপর হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল, তোমার মতো গাধা সতী ব্যাচেলারকে এসব কথা বোঝানো আমার কম্ম নয়।

জিপটা একটা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। বাঁ দিকে একটা ন্যাড়া পাহাড়। পত্রশূন্য গাছগুলো আকাশে হাত বাড়িয়ে কী যেন চাইছে। হাওয়ায় হাওয়ায় শুকনো পাতা উড়ছে মচমচানি আওয়াজ তুলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে যশোয়ন্ত বলল; এই লালতি যখন ষোলো বছরের ছিল, তখন থেকে আমি ওর শরীরকে ভালবাসি। কিছুদিন আগে এক রাতে লালতি আমার কাছে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল। দেখলাম, ওর বুকে কে যেন দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। ওর বাঁদিকের বুকে একটা ছোট্ট লাল তিল আছে। তাই আমি ওর নাম দিয়েছিলাম লালতি। ওর আসল নাম অন্য।কী করে এমন হল জিজ্ঞেস করতে, লালতি আমাকে সব বলল। কী বলব লালসাহেব, সে রাতে আমার বড় কষ্ট ও রাগ হয়েছিল। যে শরীরকে আমি ভালবাসি, সেই শরীরে কেউ হায়নার মতো দাঁত বসাবে এ আমি ভাবতে পারি না। তা

ছাড়া যে সব কামবকত পুরুষ মেয়েদের কী করে আদর করতে হয় তাই শেখেনি, সেগুলোর কোনও অধিকারই নেই কোনও সুন্দর শরীরে হাত ছোঁয়াবার। তবু একটা খাটাশ, একটা বদবু হায়না আমার লালতির লাল তিলের উপর দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল। সেদিন থেকে খাটাশটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। আমার শরীরের ভালবাসার শরিকের গালে ও দাঁত ছুঁইয়েছে। আমি একদিন ওর জান নিয়ে নেব লালসাহেব। তুমি দেখো। ওকে একদিন আমি জানে খতম করব।

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম, কে সে লোক? কার এত দুঃসাহস?

যশোয়ন্ত এক অদ্ভুত শান্ত হাসি হাসল। তারপর জিপের গিয়ার বদলাতে বদলাতে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, হামলোঁগোকা দোস্ত। জগদীশ পাণ্ডে।



আঠাশ

হুটার আর কুজরুমের কাছের এক ওঁরাও বস্তির ছেলেরা নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। সোমবারে সারহুল উৎসব। মার্চের শেষে শালবনে ওরা সারহুল উৎসব করে।

মারিয়ানা অনেকদিন আগে একটি সারহুল গান শুনিয়েছিল—

'হালফিলের মেয়েরা প্রজাপতির মতো নরম।
হাত ছুঁইয়ে দেখো—
কী নরম—
ইস্ প্রজাপতির মতো নরম।'

বললাম, যাব, নিশ্চয়ই যাব। এমনিতে হয়তো নেমন্তন্ন করত না। আমিই ওদের বলে রেখেছিলাম, সারহুল উৎসবের সময় আমাকে যেন একবার বলে, দেখতে যাব।

এই উৎসব মার্চের শেষেই যে হবে, এমন কোনও কথা নেই। শাল গাছে যখন থোকা থোকা ফুল ধরে, হাওয়ায় হাওয়ায় যখন সেই গন্ধ ভেসে আসে—ঋতুরানি বসন্ত যখন বনে জঙ্গলে অসীম মহিমায় অধিষ্ঠিত হন, তখন ওরা এই উৎসব করে।

যখন আমি প্রথম রুমান্ডিতে আসি, তখন প্রখর গ্রীষ্ম। বসন্ত অপগত। তাই যখন বন জঙ্গলের বাসন্তী ভুবনমোহিনী রূপ দেখতে পাইনি। এ রূপ এখন দেখছি। এ রূপ বর্ণনা করি, সে সাধ্য আমার নেই।

প্রকৃতির মতো সুগন্ধি, সুবেশা, সুন্দরী মেয়ে আর দেখলাম না! এই ক্ষণে ক্ষণে শাড়ি বদলানো। এখন শীতের সবুজ গাড়োয়াল ছেড়ে বসন্তের ফিকে হলুদ বেগমবাহার পরেছেন। শ্যাম্পু করা শুকনো পাতার চুলে চুড়ো বেঁধেছেন। আর আতর কী আতর! সর্বক্ষণ শরীর অবশ করা গন্ধে হাওয়া ম' ম' করে।

দেখতে দেখতে সোমবার এসে গেল। গেলাম হুটারে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে। রোদটা এখনও মিষ্টি মিষ্টি লাগলেও ভরদুপুরে একটু গরমই লাগে।

এপ্রিলের প্রথম থেকে বেশ গরম পড়ে যাবে। তবে হাওয়াটা এখনও গরম হয়নি—বনের পাতায় পাতায় পাহাড়ি নদী-নালায় আমাদের নয়াতালাওয়ে সর্বত্রই এখনও আর্দ্রতা আছে—থাকবে বেশ কিছুদিন। তারপর মে মাসে বনের বুক শুকিয়ে কুঁকড়ে ভিখারিণীর বুকের মতো হয়ে যাবে। জল থাকবে না কোথাও এক কণাও।

বড় রাস্তা ছেড়ে বেশ কিছুটা গিয়ে বারোয়াড়ির দিকের পাহাড়ের নীচে চমৎকার একটি শালবন। বড় বড় ঋজু, সবুজ, সতেজ শালগাছ। ফুল পড়ছে উড়ে উড়ে পড়ে আছে নীচে,

মাটিতে, ঘাসে, পাথরে। একটি নীলকণ্ঠ পাখি একলা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এ গাছ থেকে ও গাছে।

ওরা সকলে গাঁয়ের পাহানকে নিয়ে সাড়ুয়া বুড়ির কাছে চলল।

সাড়ুয়াবুড়ি আর কেউ নন। একটি সুন্দরীর শালগাছ; যাকে ওরা সকলে 'বনদেওতা' বলে মেনেছে। ওরা বিশ্বাস করে, এই সাড়ুয়াবুড়ির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরেই বৃষ্টি হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল। অশেষ তাঁর ক্ষমতা।

সকলে মিলে সেই শেষ বাসন্তী বিকেলে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে মাদল বাজাতে বাজাতে এসে সাড়ুয়াবুড়ির নীচে জমায়েত হল। তারপর গাঁয়ের পাহান পাঁচটি মোরগ নিবেদন করল বুড়িকে। পাহান বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্রতন্ত্র বলল। হয়ে গেল পুজো।

ওরা সকলে মিলে গোছা গোছা শাল ফুল পাড়ল। তারপর সেই ফুল নিয়ে চলল গাঁয়ে। একটা জিনিস লক্ষ করলাম যে, যারা এসেছে এখানে, তাদের মধ্যে একটিও মেয়ে নেই।

পরদিন সকালে আবার গেলাম ওদের গাঁয়ে।

পাহানের সঙ্গে কয়েকজন ওঁরাও যুবা, গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যাবে। প্রতি বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে। বাড়ির মেয়েরা একগুচ্ছ শাল ফুল পেতে বসবে পাহানের সামনে। পাহান তাদের চুলে ফুল গুঁজে দেবে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাহানকে, ওরা সকলে মিলে আপাদমস্তক জল ঢেলে ভিজিয়ে দেবে।

এমনি করে পাহান গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যাবে। এত জল মাথায় ঢালাতে পাছে পাহানের সর্দি কি জ্বর হয়, তাই গাঁয়ের লোকের চিন্তার শেষ নেই। পাহানের মাথায় যত না জল ঢালা হয় তার পেটে তার চেয়ে বেশি মহুয়া পড়ে সেদিন। অতএব টলতে টলতে, হাসতে হাসতে, ভেজা কাপড়ে পাহান এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যায়। মেয়েগুলি কৃষ্ণসার হরিণীর মতো দৌড়ে বেড়ায়। দোলা লাগে বুকে কাঁপতে কাঁপতে খিলখিল করে হাসে, কাঁপা কাঁপা হাতে পাহান ওদের খোঁপায় ফুল গোঁজে—মেয়েরা দুষ্টুমি করে পাহানকে আরও বেশি করে ভিজিয়ে দেয়। এমনি করতে করতে দিন ফুরায়।

রাতের খাওয়াদাওয়া হয় একসঙ্গেই। ছেলেমেয়ে বুড়ো সব যায়। তারপর শালফুলের ঘাগরা পরে, শালফুলের সুন্দর মুকুট মাথায় দিয়ে ছেলে ও মেয়েরা নাচ আরম্ভ করে। সে এক নাচের মতো নাচ।

সারা রাত মাদলের শব্দ শোনা যায়। গুড়ুক-গুড়ু-গুং গুবুক-গুরু গুং...। গুড়ুক গুড়ু-গুড়ুক-গুড়ু—গুবুক-গুড়ু-গুং।

পেটে যত মহুয়া পড়ে, নাচের বেগ তত বেশি বাড়ে। এমনি করে পরদিন সকাল পর্যন্ত এই নাচ আর গান চলে—ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত গলার একটানা দোলানি সুরে।

এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা! মারিয়ানার বাড়িতে ভেজ্জা নাচ দেখেছিলাম, আর বহুদিন পর এই সারহুল নাচ দেখলাম।



উনত্রিশ

নয়াতালাওর কাছে সেই আমবাগানে নাকি ভাল্লুকের মরসুম শুরু হয়েছে। সেই বুড়ো ট্রাক-ড্রাইভার ইতিমধ্যে আমাকে আরও কয়েকবার মনে করিয়ে দিয়ে গেছে তার প্রয়োজনের কথা। লজ্জার সঙ্গে, কুণ্ঠার সঙ্গে; ভয়ের সঙ্গে এসে।

রামধানীয়া এসে বলছিল, সন্ধের পর আমবাগানে আমের লোভে ভাল্লুকগুলো রোজই আসছে। এখন শুক্লপক্ষ। সন্ধের পর চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করে। জঙ্গলের নীচে বহুদূর অবধি নজর চলে। মাঝে মাঝে রাতে, এখন পথে বেরোলেই হাতির দলকে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ওরা দল বেঁধে নয়াতালাওর দিকে যায় জল খেতে। কোনওদিন বা দেখা যায় না। জঙ্গলে শুধু শোনা যায় ডালপালা ভাঙার শব্দ। হাতির দল কোনওদিন কাউকে কিছু বলে না। গুণ্ডা পাগলা হাতি থাকলে ভয়ের ব্যাপার। হাতির উপদ্রব বেত্‌লার দিকেই বেশি। আমাদের এদিকে উপদ্রবকারী হাতি বড় একটা আসে না।

ভাবলাম, চলে যাবার আগে একটা পুণ্যকর্ম যদি করে যেতে পারি, মন্দ কী? ট্রাক-ড্রাইভারের তৃতীয় পক্ষের বউ যদি আশীর্বাদ করে আমায়, তা না জানি কোনও না কোনও উপকারে লেগে যাবে ভবিষ্যতে।

সেদিন আটটা নাগাদ বেরিয়েই পড়লাম বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে। আজকাল সন্ধেই হয় প্রায় সাতটা নাগাদ। সূর্য আর পৃথিবীর শরীর ছেড়ে উঠতেই চায় না। যাই যাই করতে করতেও বেলা যায় না। সূর্য গেলেও তার শরীরের তাপ সারা পৃথিবীর শিথিল শরীরে ছড়িয়ে থাকে। হাওয়ার নিশ্বাসে মহুয়া আর করৌঞ্জের বাস ভাসে। রাতচরা পাখিরা খুশির ফোয়ারা ছড়ায় ছোট ছোট ঠোঁটে। জঙ্গলে পাহাড়ে এ সময় হেঁটে বেড়ানোর মতো মনোরম অভিজ্ঞতা আর নেই।

বড় রাস্তা ছেড়ে নয়াতালাওর রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। এখান থেকে আমবাগান আরও মাইলখানেক। নানা কথা ভাবতে ভাবতে বন্দুকটা কাঁধে ফেলে চলেছি। আধ মাইলটাক গেছি বড় জোর। এমন সময় পথের ডান দিকের একটি পাহাড়ি নালার বুকে শুকনো পাতা মাড়ানোর মচমচ আওয়াজ পেলাম।

একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একটু পরে তার পাশেই আবার ওরকম মচমচ আওয়াজ শুনলাম।

খুব কৌতূহল হল, কী জানোয়ার অমন করছে তা দেখার। বন্দুকটায় দুটো এল-জি পুরে নিয়ে পা টিপে টিপে ওদিকে সাবধানে এগোতে লাগলাম।

কাছাকাছি যেতেই দেখলাম, নালার বুকে আলো ছায়ার আধো-অন্ধকার। অনেকগুলো বড় বড় পাথরে একটা টিলার মতো হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গ্রীষ্মের পত্রবিরল গাছেদের মাথা বেয়ে ধবধবে চাঁদের আলো এসে দাবার ছকের মতো ছক পেতেছে কালো পাথরে।

নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখেও সেখানে কোনও জানোয়ার দেখতে পেলাম না। একটি টি-টি পাখি রাস্তার উপরে ঘুরে ঘুরে টিটিরটি-টিটিরটি করে উড়ে বেড়াতে লাগল। সাধারণত জঙ্গলে কোনও জানোয়ার বা মানুষকে চলাফেরা করতে দেখলেই ওই পাখিগুলো তাদের সামনে বা মাথার উপরে অমন করে উড়ে বেড়ায়।

মুখ ঘুরিয়ে আমি রাস্তার দিকে তাকালাম। রাস্তার দিকে পুরো মুখ ঘুরিয়েছি, এমন সময় সেই কালো পাথরের টিলার কাছ থেকে একটি মেয়েলি গলার চাপা হাসি শুনতে পেলাম। বেশ ভয় পেয়ে ও অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়েই ও দিকে বন্দুক তুললাম।

এমন সময় যশোয়ন্তের গম্ভীর গলা শুনলাম, 'মত মারো ইয়ার। মাদীন হ্যায়।'

আমার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম গড়াতে লাগল। আমি ইদানিং জঙ্গলে পাহাড়ে যেখানেই সন্দেহজনক কিছু দেখি, অমনি জগদীশ পাণ্ডের কথা মাথায় খেলে যায়। আর একটু হলে হয়তো গুলিই করে ফেলতাম। এমন রসিকতা কেউ করে!

পাথরের টিলার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখি, যশোয়ন্ত এবং একটি মেয়ে টিলার উপরের মসৃণ পাথরের বুকে ভর দিয়ে শুয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের দুজনের গায়েই কাপড় জামার চিহ্নমাত্র নেই।

যশোয়ন্তকে দেখে এই মুহূর্তে আমার মনে হল যে, ওকে আমি চিনি না। ঠিক এ অবস্থায় আগে ওকে কোনওদিন দেখিনি। দেখব বলে ভাবিওনি। অথচ ওর পটভূমিতে ওর পাগলামির পরিপ্রেক্ষিতে, এরকম দৃশ্য যে-কোনওদিনই দেখব বলে তৈরি হয়ে থাকা আমার উচিত ছিল।

আমি কী করব, বা বলব, ভেবে না পেয়ে বললাম, যাচ্ছি। আমি চললাম।

যশোয়ন্ত একটা আদিম মানুষের মতো কালো পাথরের স্তূপ বেয়ে চাঁদের রাতের তরল সায়ান্ধকারে নালার মধ্যে তরতরিয়ে নেমে এসে আমার হাত ধরল।

বলল, ভাগতে কিঁউ ইয়ার? আও বৈঠো। তুমসে কুছভি ছিপানা নেহী।

তারপর উপরের দিকে চেয়ে ডাকল, উতারকে আ লালতি।

লালতি সলজ্জে বলল, নেহী।

কিঁউ? নাঙ্গা? উসলিয়ে?

নেহী।

তো কিঁউ?

এইসেহি।

যশোয়ন্ত হো হো করে হাসতে লাগল। আলোছায়ার বুটিকাটা বনে একজন প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতো সমাজ সভ্যতার মুখে লাথি মেরে ও হাসতে লাগল। মনে হল, যশোয়ন্ত আজ নেশায় বেশ বেহুঁশ হয়ে আছে।

যশোয়ন্তের হাসি থামতে না থামতে লালতির পায়ে লেগে উপর থেকে একটা খালি বিয়ারের বোতল টুংটাং শব্দ করে পাথর গড়িয়ে এসে নীচে বালিতে ধপ করে পড়ল।

লোকে যেমন পোষা কুকুরকে ডাকে, তেমনি করে যশোয়ন্ত লালতিকে বলল, আঃ আঃ লালতি আ—মেরে দোস্ত তুম্‌কো জেরা নজদিকসে দেখেগা। আ মেরে লালতি, পেয়ারী।

লালতি আবার বলল, এ বাবু, তুম অ্যাসা করোগে তো হাম ভাগেগী।

যশোয়ন্ত আবার পাগলের মতো হাসতে লাগল।

আমি যশোয়ন্তকে কোনওদিনও এমন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেখিনি।

যশোয়ন্ত আমার হাত ধরে এক ঝটকা টানে আমাকে নিয়ে একটা পাথরে বসল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল, বুঝলে লালসাহেব, নরম পাখির মতো মহুল ফুলের মতো, মেয়েদের শরীর নিয়ে অনেক নাড়লাম চাড়লাম। শিঙ্গাল হরিণের মতো হরিণীর দলের সঙ্গে ছায়ায় রোদ্দুরে অনেক খেললাম। কিন্তু সুমিতাবউদির মতো কাউকে দেখলাম না। মনের ভালবাসার গাঁ বদল আমার হল না। জানো লালসাহেব, সুমিতবউদি আমার কাছ থেকে কিছু চেয়েছিল। সুমিতাবৌদি বলেছিল, যশোয়ন্ত, তোমার দুরন্তপনার এক কণা আমাকে দিয়ে যাও। সেই এক কণা উষ্ণতা আমি চিরদিনের জন্যে, বরাবরের জন্যে আমার করে রাখব। তুমি আর কখনও পালিয়ে যেতে পারবে না আমার কাছ থেকে। লালসাহেব, একদিন সুগান সিংয়ের সুরাতীয়াও আমার কাছে কিছু চেয়েছিল; অন্য কিছু। তার জন্যে আমি কিছুই করতে পারিনি, সে ব্যথা আমার মনে আজও কাঁটার মতো লাগে। আমি জানি, তোমাদের সামাজিক বাজপাখিটা সব সময় মাথার উপর চিঁচিঁ করে ঘুরে বেড়ায়, তবু আমি যা কাউকে কোনওদিন দিইনি, তাই দিয়ে ফেললাম সুমিতাবৌদিকে।

জগদীশ পাণ্ডে, কি পৃথিবীর কোনও শালা পাণ্ডেকে আমার আর ভয় নেই। আমার যদি কিছু হয়ও, আর একটা ছোট্ট যশোয়ন্ত সুমিতাবউদির বুক জড়িয়ে থেকে যাবে। লালসাহেব, এতদিন আমি শিমুলতুলোর মতো হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়িয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমি আমার দুরন্তপনার বীজ একটি দারুণ খুশবুভরা চাঁপা ফুলে বরাবরের মতো পুঁতে দিয়েছি।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম।

মনে পড়ল, ঘোষদা আমার কাছে সাধের নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন। হাসিও পেল। আবার সুমিতাউদির কথা ভেবে কথাটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতেও ইচ্ছা করছিল না।

যশোয়ন্ত আমার মুখে ওর হাত চাপা দিয়ে বলল, কাউকে বোলো না দোস্ত। এ কথা কাউকে বলার নয়। কেন যে তোমাকে বলে ফেললাম, জানি না। তবে তোমাকে বলিনি, এমন কিছুই আমার নেই। তাই বলে ফেললাম। তুমি আর কিছু শুধিয়ো না। আমার খালি ভাবতে কষ্ট হয় যে, আমার ছেলে—ডাকাইত যশোয়ন্তের ছেলের বাপ বলে পরিচিত হবে ওই লোকটা! ওই নিচু মনের ভিতু, চাকরিসর্বস্ব ভুঁড়িওয়ালা লোকটা। এটা ভাবলেই আমার কষ্ট হয়।

আমার ছেলেকে তো আমি কিছুই দিয়ে যেতে পারলাম না। সে যখন বড় হবে, বড় হয়ে আমার মতো জঙ্গলে পাহাড়ে রাইফেল হাতে রোদ্দুরে-চাঁদে ঘুরে বেড়াবে, তখন সে হয়তো কোনও উঁচু পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে নীচের রোদ-ঝলমল উপত্যকার দিকে চেয়ে মনে মনে বলবে:

"I had an inheritance from my father,
It was the moon and the Sun.
I can move throughout the world now,
The spending of it is never done."

হঠাৎ লালতি উপর থেকে বলে উঠল যে, তাকে অন্ধকারে সাপের কামড় খাওয়ানোর জন্যে ওইখানে একা শুইয়ে রেখে যশোয়ন্ত কোন আনজান ভাষায় গেহুঁ-বাজরার গল্প করছে দোস্তের সঙ্গে?

আমি বললাম, আমি চলি, যশোয়ন্ত। আমি চলি।

যশোয়ন্ত হাসল। তারপর অনিচ্ছার হাসি হেসে বলল, আচ্ছা।

আমি অন্ধকারের ঝুপড়ি থেকে বেরোচ্ছি, এমন সময় যশোয়ন্ত পেছন থেকে আমাকে ডেকে বলল, লালসাহেব, লজ্জাবতী লতা একা-একাই দেখা ভাল—যেদিন দেখবে। সব জিনিস অন্যের হাত ধরে দেখতে নেই।

বলেই, আবার জঙ্গল কাঁপিয়ে হাসতে লাগল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।



ত্রিশ

ভয়টা সত্যি হল। কোম্পানির স্পেশাল ক্যুরিয়ার এসেছিল চিঠি নিয়ে। আমার চাকরি সত্যিই গেল। মানে আমার কনট্রাকট ওঁরা আর রিনিউ করলেন না। অবশ্য রিনিউ করবেনই যে, এমন কোনও কথা ওঁরা দেননি, তবু না-করার কোনও কারণ ছিল না। যদি না আমি যশোয়ন্তের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে ঘোষদার কু-নজরে পড়তাম। চাকরি যাওয়ার জন্যে দুঃখ নেই, দুঃখটা অন্য কারণে।

পনেরো দিন পর কলকাতা থেকে আমার উত্তরসূরি আসবেন। তাঁকে কাজ বুঝিয়ে আমার ছুটি। ভাবতে পারি না। সত্যিই ছুটি হবে এখান থেকে। বরাবরের মতো।

ঘোষদার কথা মনে হয়। জানতে ইচ্ছে হয়, কী অন্যায় করেছিলাম ভদ্রলোকের কাছে।

এ ক'দিন কিছু আর ভাল লাগে না। সারাদিন কাজকর্ম দেখে বিকেলে চান সেরে বাংলোর হাতায় চেয়ার পেতে বসে থাকি। আমার চোখের সামনে একটা আশাবাহী সূর্য করুণ বিষণ্ণ ব্যথাবাহী সুর ছড়িয়ে বাগুং পাহাড়ের আড়ালে ডুবে যায়। শান্ত সরোদের স্বর হাওয়ায়, শুকনো পাতার মচমচানিতে ভেসে বেড়ায়। বড় বিষণ্ণ লাগে।

একটি শুকনো খয়েরি শালপাতার মতো মনে হয় নিজেকে—নিজের কোনও ভার নেই, কোনও গন্তব্য নেই। কিছু বক্তব্য নেই। পাগলা হাওয়ায় যেখানে ঠেলে নিয়ে যায়, সেখানেই যাই। যেখানে আছড়ে ফেলে, সেখানে আছাড় খাই।

বড় ভালবেসে ফেলেছি এই রুমান্ডিকে। এই নইহার, শিরিণবুরুকে। পালামৌর এই পাহাড়, বন, গাছপালা, ফুল প্রজাপতিকে। ভালবেসে ফেলেছি যবটুলিয়ার গমভাঙা কলের পুপ-পুপানিকে, ভালবেসে ফেলেছি ওঁরাও ছেলের উন্মত্ততাকে—পাচন-তাড়িত কাঠের ঘণ্টা-দোলানো কালো-কালো মোষগুলোকে। যা কিছু দেখি, যা কিছু শুনি, যা কিছুর সুবাস পাই, সব কিছুকেই ভালবেসে ফেলেছি। নিরুপায়ভাবে, অপারগভাবে।

কী করব জানি না। পেটের ভাতের জন্যে তেমন ভাবিনি। তোরঙ্গের কোনায় একটা পাকানো কাগজ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিল-মারা। কেবলমাত্র ভাত জোটানোর পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। মাত্র ভাত জোটানোর জন্যেই বা কেন? হয়তো বা আরও অনেক কিছুর জন্যে। হয়তো বা বালিগঞ্জ পাড়ায় একটি ফ্ল্যাট, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড একটি গাড়ি, হায়ার পারচেজে কেনা একটি রেফ্রিজারেটর, একটি রেডিওগ্রাম, একটি লোক দেখানো, চোখ

ঝলসানো বসবার ঘর এবং তদুপরি স্লিভলেস ব্লাউজপরা অন্তঃসারশূন্য একটি দেহসর্বস্ব—সব কিছুই এই কাগজটি ভাঙিয়ে পেতে পারি।

কিন্তু আজ যা পেয়েছি—এই রুমান্ডির জীবন, যশোয়ন্তের ভালবাসা, মারিয়ানার বন্ধুত্ব, জুম্মানের সেবা, রামধানিয়া, টাবড়, সকলের বাধ্যতা—এসবের সঙ্গে তুলনা করি এমন কিছু কলকাতায় আছে বলে ভাবতে পারি না।

এখানের এক-একটি ভরন্ত সুরেলা সোনালি দিনকে মুঠি ভরে প্রতিদিন আমি কারও মসৃণ স্তনের মতো ধরেছিলাম। পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ ও নির্বিবাদ মালিকানায় ভোগ করেছিলাম। কলকাতার সমস্ত জীবনের বিনিময়ে আমি এখানের একটি দিনও দিতে রাজি নই। এখন আমাকে এখান থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মানে নবজাত শিশুরই মতো প্রকৃতি মায়ের নাড়ি থেকে সভ্যতার ছুরি দিয়ে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে সভ্য ও ভণ্ড কলকাতার আবর্জনার স্তূপে আমাকে নিক্ষেপ করা। ভাবতে পারি না, ভাবতে পারি না।

এই মুহূর্তে আমি আমার অন্তরের অন্তরতমে বিশ্বাস করি, এই প্রকৃতিই আদি। আমাদের একমাত্র আশা। আমাদের শেষ অবলম্বন। আমাদের আশ্লেষ আশ্রয়। কী ঐকান্তিকতায় যে বিশ্বাস করি, তা বোঝাবার মতো ভাষা আমার নেই। এর চেয়ে গভীরভাবে আমার এই অল্প বয়সের জীবনে আর কিছুই বিশ্বাস করিনি।

গতকাল ঘোষদা এসেছিলেন। অনেক কুমিরের কান্না কাঁদলেন আমার চাকরির একসটেনশান না হওয়ার দুঃখে।

হাসি পাচ্ছিল। যশোয়ন্তের সঙ্গে থেকে থেকে, মাঝে মাঝে আমি রাগ করতেও শিখেছি। ইচ্ছে হল, বন্দুকটা এনে, দিই ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে। তারপর আবার হাসি পেল। ভাবলাম, এসব 'বন্ধু ভাগ্যে পুত্রপ্রাপ্ত' লোক এতখানি পুরুষোচিত শাস্তির যোগ্য নয়।

এই বসন্ত বনের রাত যেন মাতাল করে। কী যে সুগন্ধ ছড়ায় হাওয়াটা, কী বলব। কেরাউঞ্জা, মহুয়া, পিলাবিবি, জীর-হুল, ফুলদাওয়াই, সফেদীয়া, আরও কত শত নাম-না-জানা ফুলের বাস। জ্যোৎস্না রাতের তো কোনও তুলনাই নেই।

গাছে গাছে পাতা ঝরে গেছে। জঙ্গলের নিচটা বহুদূর অবধি দেখা যায়। এখন জন্তু-জানোয়ারের ঘাড়ে গিয়ে পড়ার আশঙ্কাও কম। রাতচরা পাখিগুলো সুনীল সুগন্ধি চাঁদমাখা আকাশের পটভূমিতে উড়ে উড়ে চিপ চিপ করে ডেকে বেড়ায়। দূর থেকে পরিচিত খাপু পাখি ডাকে, খাপু-খাপু-খাপু-খাপু। টি-টি পাখিরা সুহাগী নদীর উপরে সারারাত দখিনা হাওয়ায় সাঁতার কাটে—টিটির-টি—টিটির-টি—টিটির-টি।

এ ক'দিন রোজ সন্ধে হলেই বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। শিকারে নয়। আর শিকার নয়। যা যা শিকার করেছি, তার জন্যেই দুঃখ লাগে, অপরাধী লাগে নিজেকে। অবশ্য যশোয়ন্তের মতানুসারে এটা সত্যি যে, যে শিকারি, একমাত্র তার পক্ষেই বনের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে নিসর্গসৌন্দর্য উপভোগ করা সম্ভব। এটা একটা প্রয়োজন। প্রকৃতিকেও অন্য যে কোন সুন্দরী ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়ের মতো আগে জয় করতে হয়, তারপরই সে উজাড় করে দেয়। সংশয় নিয়ে, ভয় নিয়ে, প্রকৃতিকে দেখলে তার কিছুই জানা যায় না। দেখা হয় না।

রাতে, বনে বনে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াই। পাশের শুকনো পাতায় মচমচানি তুলে কোটরা হরিণ বেগে দৌড়ে যায়। সম্বরের দলের ভারী পায়ের শব্দ শোনা যায় পাথরের উপর। ময়ূর ও মুরগি ফুটফুটে আলোয়-ভরা রাতে বন্দুক কাঁধে আগন্তুককে দেখে, ডানা

ঝটপটিয়ে জ্যোৎস্নালোকিত পত্রশূন্য উঁচু ডালে নড়ে-চড়ে বসে। সাপের তাড়া খেয়ে মেঠো ইঁদুর শুকনো পাতায় সড়সড়ানি তুলে দৌড়ে পালায়।

কখনও কখনও সুহাগী নদীর পাশে যশোয়ন্তের প্রিয় সেই বড় পাথরে বসে থাকি। জুম্মান মানা করে, বলে, বাঘে জল খেতে আসে ওখানে। আমার আজকাল ভয় করে না। যখনই রুমান্ডির দিন হাতের আঙুলে গুনি, তখনই মনে হয় ফুরিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে। ফুরিয়ে যাবার আগে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, আমার সমস্ত সত্তার ঐকান্তিকতা দিয়ে এই ভাল-লাগায় প্রাণ ভরে নিই।

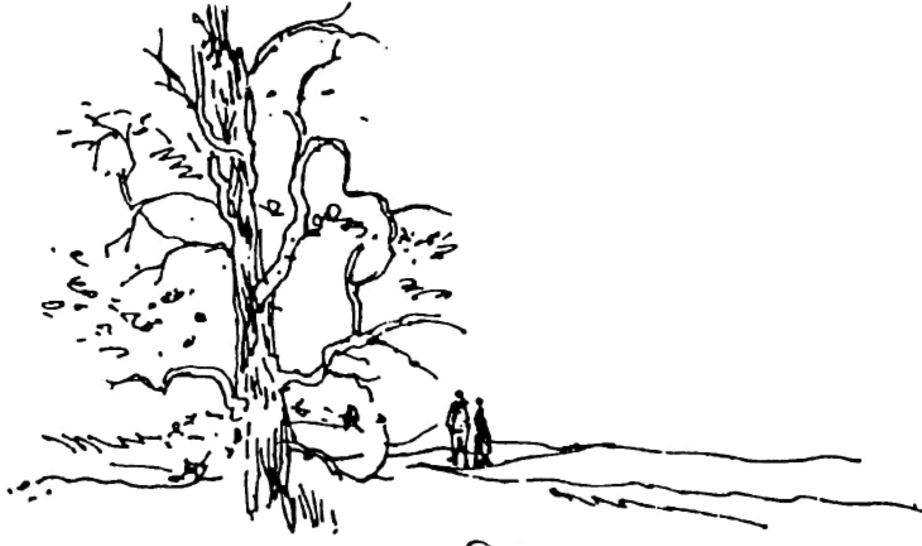
পাথরটায় বসে বসে অনেক কথাই মনে হয়। যেদিন যশোয়ন্তের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল, সেদিনকার কথা। এই পাথরের পাশে কতবার চড়ুইভাতি হয়েছে। সুমিতাবউদি 'কা' ও 'বা' দিয়ে হিন্দি বলা শিখিয়েছিলেন আমাকে এখানে। সুমিতাবউদিকেও কখনও ভোলবার নয়। তিনি যে ঘোষদার স্ত্রী, এই কথাটা ভাবলেই কষ্ট হয়। আমার বান্ধবী মারিয়ানা, মারিয়ানার বন্ধু সুগত, সকলের স্মৃতিই নিয়ে যাব। মনে ভাবি, হারাব না কিছুই। মনের কোণে দুর্মূল্য আতরের মতো এই ভাল লাগা, এই ভালবাসা; এই সুগন্ধ বয়ে বেড়াব অনুক্ষণ; আজীবন। যতদিন বাঁচি।

অথবা জানি না, রুমান্ডির সঙ্গে সব সম্পর্ক—রুমান্ডি ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে কিনা। কলকাতায় গেলেই দোতলা বাসের ঘড়ঘড়ানি—ট্রামের টুংটুং, ফেরিওয়ালার চিৎকার, আত্মম্ভরী শহুরেদের উচ্চগ্রামের কথোপকথনে এই শান্তি, এই আবেশ, এই স্মৃতি, এই পরিচয়, এই ভাল লাগা কিছুই থাকবে না। সবই হয়তো মুছে যাবে, সব মিটে যাবে হয়তো।

একদিন সন্ধের পর ওই পাথরে বসেছিলাম। কতকগুলো জানোয়ারের ভারী পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। বুনো মোষের দল। কোয়েলের পাশের ঘাসী বনে ওদের আস্তানা—বাগেচম্পার দিকে। যশোয়ন্ত একদিন নিয়ে গিয়ে দেখাবে বলেছিল। ভয় করতে লাগল একটু। চুপ করে বসে রইলাম। কী প্রকাণ্ড শরীর। ওঁরাওদের পোষা মোষের দেড়গুণ চেহারা। পুরো কালো নয়—রঙটা যেন কেমন। চাঁদের আলো বিরাট বিরাট শিং-এ পিছলে পড়ে চকচক করছে। দলপতি আমাকে একবার দেখল মাত্র। তারপরে যেমন বাঁ থেকে ডাইনে যাচ্ছিল, তেমনই পাথরে পাথরে ভারী খুরের খটাখট আওয়াজ করতে করতে দূর বনের সায়ান্ধকারে মিশে গেল।

বাগুং পাহাড়ের দিক থেকে একটা হায়েনা ডেকে উঠল—হাঃ হাঃ হাঃ। ওই পাহাড়ের বনদেওতার থান ঘিরে শঙ্খচূড় আর গহুমনেরা এখন কী করছে জানি না।

আজকাল আমাকে জব্দ করার জন্যেই যেন ঘড়ির কাঁটাগুলো অনেক দ্রুত ঘুরছে—শেষ ক'টি দিন যাতে আরও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, সেই চক্রান্ত করছে।



একত্রিশ

ছিপাদোহর স্টেশনে আমার উত্তরসূরিকে নিতে এসেছি। জিপ নিয়ে এসেছি। এক্ষুনি আসবে ট্রেন। মহুয়া-মিলন, চৈটর, হেহেগাড়া, রিচুঘুটা, কুমান্ডি হয়ে ছিপাদোহর।

দেখতে দেখতে লাল ধুলোর ঝড় উড়িয়ে চৌশন এক্সপ্রেস এসে গেল।

যিনি এলেন, তাঁর নাম বিকাশ সেন। বয়সে আমার চেয়েও দু-তিন বছরের ছোট হবেন হয়তো। কপালের উপর চুল শোয়ানো, পাশাপাশি আঁচড়ানো। চোখে মোটা ফ্রেমের কালো চশমা। পরনে পাঁচ ইঞ্চি ড্রেইন-পাইপ। তার উপর গোলাপি ভয়েলের পাঞ্জাবি। হাতে শিখদের অনুকরণে পরা স্টেনলেস স্টিলের বালা।

কেতাদুরস্ত নব্য যুবককে দেখেই বুঝলাম যে, ইনিই আমার উত্তরসূরি। ওই স্টেশনে ফার্স্টক্লাস থেকে রোজ রোজ প্যাসেঞ্জার নামেন না। এগিয়ে যেতেই ডানহাত তুলে আমাকে বললেন, 'হাই'।

অ্যাটেন্ডেন্ট কামরা থেকে উর্দি পরা কোম্পানির ড্রাইভার-কাম বেয়ারা নামল। ওকে উনি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন।

আলাপ পরিচয় হল। আমি জানালাম যে, ওঁকে কাজ বুঝিয়েই পরদিন ভোরে আমি চলে যাব। পরদিন বিকেলে ঘোষদা এসে ওঁকে আরও ভাল করে বিশদভাবে সব বোঝাবেন।

জিপে আসতে আসতে মিস্টার সেন শুধোলেন, রুমাণ্ডি থেকে নিয়ারেস্ট সিনেমা হল কত দূরে? ভাল ছবি-টবি আসে? আর্ট ফিল্ম? নিউ-ওয়েভ-এর ছবিটবি?

আমি বললাম, সিনেমা হল ডালটনগঞ্জে। এখন 'রামভক্ত হনুমান' হচ্ছে। এরপর ' যাঁহা সতী উঁহা ভগবান' আসছে।

উনি উত্তর দিলেন না।

রুমান্ডি পৌঁছে মিস্টার সেন বললেন, গুড লর্ড, আ হেল অফ আ প্লেস।

তারপর চোখ টিপে বললেন, বাট আই বিলিভ, ইউ মাস্ট বি হ্যাভিং প্লেন্টি অব রিয়েল গুড ডেমস হিয়ার।

জবাব দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার রুমান্ডির মালিকানা চলে যাচ্ছে এই শোকে আমি মুহ্যমান ছিলাম। জবাব দিলাম না।

আমার শেষ দিনটিকে, ভেবেছিলাম, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিংড়ে নিংড়ে উপভোগ করব। কিন্তু সেদিন বিকেলে যবটুলিয়া থেকে ভেসে আসা পুপপুপানি গানও আর শোনা হল

না। তার কোনও উপায় ছিল না। সূর্যদেব দিগন্তে আমার নৈবেদ্য না নিয়েই ডুবে গেলেন। কিছুতেই রাঙিয়ে রাখতে পারলাম না, বাঁচাতে পারলাম না দিনটিকে। আমার রুমান্ডির দিন।

বিকেল থেকে ব্যাটারি-ড্রিভন রেকর্ড-প্লেয়ারে স্প্যানিশ গিটারের স্টিরিও রেকর্ড চড়িয়ে, ঠোঁটের কোণে অবিরাম সিগারেট গুঁজে, মিঃ সেন পায়ের উপর পা তুলে বেতের চেয়ারে ইনটেলেকচুয়াল পোজে বসে আছেন। রেকর্ডের সেই আর্তনাদ ছাপিয়ে কোনও পাখির ডাক কি হাওয়ার মচমচানি কি কাঁচপোকার গুনগুনানি শুনি এমন সাধ্য কী!

ঠিক করেছি লাতেহার থেকে বাসে চাঁদোয়া-টোরী হয়ে রাঁচি যাব, রাঁচি থেকেই ট্রেন ধরব। কোম্পানির ড্রাইভার আমাকে লাতেহার অবধি পৌঁছে দিয়ে আসবে। ইচ্ছে করলে রাঁচি অবধিও যেতে পারতাম। কিন্তু মর্যাদায় বাধল।

ভোরবেলা জুম্মান এক কাপ কফি করে দিল। কফি খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

রুমান্ডির বাংলো থেকে বেরোবার আগে টাবড় এবং সুহাগী ও যবটুলিয়া বস্তির আরও অনেক নাম জানা ও অজানা লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বেচারি ওরা। ওদের জন্য কিছুই করতে পারিনি। সকলকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে পর্যন্ত পারিনি। একবেলা সকলকে পেট ভরে ভাত খাওয়ানোও হয়ে ওঠেনি। আমার অসামর্থ্যের ত্রুটি ব্যবহার দিয়ে মেটাতে চেয়েছিলাম। জানি না কতটুকু পেরেছি।

পথের পাশে একটা বুনো মোরগ খুঁটে খুঁটে কী খাচ্ছিল। আমাদের দেখেই কঁক-কঁক করে উড়ে জঙ্গলের ভেতর চলে গেল। সকালের রোদে গাঢ় সোনালি পাখা ঝিকমিক করে উঠল।

লাতেহার পৌঁছলাম। যে পথ দিয়ে ওঁরাও ছেলেটিকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, সে পথ দিয়ে।

লাতেহারে পণ্ডিতের দোকানে বসে চা ও শেঁওই ভাজা খাচ্ছি। বাসের অপেক্ষায় আরও অনেকে বসে আছে। এমন সময় হঠাৎ একটি ঘোড়াক হ্রেষারব কানে এল।

যশোয়ন্ত ভয়ঙ্করকে পণ্ডিতজীর দোকানের পাশের মহুয়া গাছে বেঁধে আমার কাছে এল। বলল, তোমাকে তুলে দিতে এলাম লালসাহেব। জানি না, কেন ভাল লাগছে না। আমার মন আজকাল আর আগের মতো শক্ত নেই ইয়ার। আজকাল দুঃখ হলে দুঃখ লাগে, ভয় পাবার কারণ থাকলে ভয় পাই। তুমি সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছ ভাবতে ভাল লাগছে না।

আমি কোনও কথা বললাম না।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইলাম।

তারপর নীরবতা ভেঙে বললাম, চিঠি লিখলে উত্তর দেবে তো?

যশোয়ন্ত হাসল।

বলল, আমি তো চিঠি লিখতে জানি না লালসাহেব, আমি শুধু কথা বলতে পারি। তাও জঙ্গলের জানোয়ারদের সঙ্গেই বেশি কথা আমার। আমার উত্তর আশা কোরো না। উত্তর পাবে না। তবে, তুমি চিঠি লিখো।

একটু থেমে বলল, সুহাগীতে যখন মাছ ধরা পড়বে, তোমার কথা মনে পড়বে। সুমিতাবউদির সঙ্গে যখন দেখা হবে, গরমের দিনে আবার যখন মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধ

ভাসবে হাওয়ায়, যখন জীরহুল আর ফুলদাওয়াই ফুটবে, তোমার কথা মনে হবে। তোমাকে মনে মনে অনেক চিঠি লিখব। চিঠিগুলো শুকনো শালপাতার মতো জঙ্গলে, নদীনালায়, কালো পাথরে, হাওয়ায় হাওয়ায় গড়িবে বেড়াবে। সে চিঠি তো ডাকে যাবে না!

আমি বললাম, যশোয়ন্ত, জগদীশ পাণ্ডের জন্যে আমার রুমান্ডি ছেড়ে যেতে সত্যিই মন খুঁতখুঁত করছে। খুব সাবধানে থেকো যশোয়ন্ত। খুব সাবধানে থেকো।

যশোয়ন্ত উত্তর না দিয়ে বুশ শার্টের নীচে, ডানদিকে বেল্টের সঙ্গে হোলস্টারে বেঁধে রাখা পিস্তলের বাঁটে একবার হাত ছোঁয়াল। তারপর বিড় বিড় করে বলল, মরবে একজন ঠিকই। হয় ল্যাংড়া জগদীশ, নয় এই যশোয়ন্ত। তবে কে যে মরবে, তা বাগুং পাহাড়ের দেওতাই জানেন।

পকেট থেকে একটা চুট্টা বের করে যশোয়ন্ত একগাল হাসল। যেন আমাকে ভোলাবার জন্যেই তারপর হঠাৎ আবৃত্তি করে, হাত নেড়ে নেড়ে বলল,

'মর্‌নেকে বাদ মেরি ঘর্‌সে কেয়া নিক্‌লি শামান?
চাঁদ তস্‌বীর বুতা, চন্দ্‌ হাসিনোঁকোঁ খাতুত্‌।'

বললাম, মানে?

মানে আর কী? মরার পর আমার ঘর থেকে আর কী পাওয়া যাবে? কিছু সুন্দরীর ছবি, আর কিছু সুন্দরীদের লেখা চিঠি।

বলেই, হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগল।

আমিও হাসতে লাগলাম, ওর কথা শুনে।

ডালটনগঞ্জ থেকে বাসটা এসে গেল।

আমার হাঁটুর উপরে রাখা যশোয়ন্তের চওড়া কবজিতে হাত রাখলাম। যশোয়ন্ত কিছু বলল না।

বাসে উঠে বসলাম আমি।

অনেকক্ষণ চলার পর টোরীতে এসে মোড় নিল বাস। বাঁয়ে জাবরা মোড় হয়ে—সীমারীয়া হয়ে যশোয়ন্ত-এর টুটীলাওয়ার রাস্তা। হাজারিবাগ জেলাতে। আর ডানদিকে পথ চলে গেছে কুরুতে।

আমঝারীয়ার বাংলোটির পথ দেখা গেল এক ঝিলিক। দুদিকে সারা পথ কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। পাহাড় আর পাহাড়। নিমলা বস্তির দিকে পথ বেরিয়ে গেছে এ পথ থেকে। যশোয়ন্তের সঙ্গে শিকারে এসেছিলাম একবার।

বেশ গরম গরম লাগছে এখন।

আরও একমাস পর যখন গরম আরও জোর পড়বে, তখন সন্ধ্যার পর পাহাড়ে পাহাড়ে আলোর মালা জ্বলবে। কালো পাহাড়ের পটভূমিতে প্রকৃতির নিজের হাতেই দীপান্বিতা হবে প্রকৃতি। হাওয়াটা ফিসফিসিয়ে কোনও গান্ধারী আলাপ বয়ে বেড়াবে। খরগোশ আর কোটরা হরিণগুলো পথের উপর আগুনের ভয়ে দৌড়োদৌড়ি করবে।

মনের চোখে সব দেখতে পাচ্ছি, সব দেখতে পাচ্ছি। দাবানলে পোড়া জঙ্গলের গন্ধ পাচ্ছি নাকে।

যেন হঠাৎই কুরুতে পৌঁছেই জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। এবার রাঁচির রাস্তা। সোজা।

দু' পাশে চষা জমি। মাঝে মাঝে দুটি একটি গাছ। সামনেই মান্দার। পথের পাশে হাট বসেছে। ওঁরাও ছেলে-মেয়েরা ভিড় করেছে।

বাসটা দাঁড়াল। ধানিঘাসের ঝাঁটা। ওঁরাওদের হাতে বোনা দোহর। পেতলের গয়না। মাটির বাসনপত্র, আরও কত কী।

আকাশে রোদ ঝকঝক করছে।

একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে একটি ওঁরাও মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। চুলে ফুল গুঁজেছে। একটি ছেলে মোষের পিঠে চড়ে হাটে এসেছে। কী যেন বলছে ছেলেটি মেয়েটিকে। মেয়েটির দু' চোখে মিষ্টি হাসি। ছেলেটি দুষ্টুমিভরা চোখে চেয়ে আছে।

মোষটা একবার মাথা ঝাঁকাল। কান দুটো পট পট করে নড়ে উঠল। গলার কাঠের ঘণ্টাটা ডুগুডুগিয়ে বাজল। একটা নীল মাছি উড়তে লাগল শিং দুটোর মধ্যে।

ছেলেটি কী বলছে মেয়েটিকে—কানে কানে?

'হালফিলের মেয়েরা
প্রজাপতির মতো নরম
ইস্‌স্ হাত ছুঁইয়ে দেখো
প্রজাপতির মতো নরম!'




9 788170 663751